বিশ্বসেরা চিরায়ত গ্রন্থ

বিশ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এইচ. জি. ওয়েলস্

অনুবাদ • দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

বিশ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

www.nagorikpathagar.org

A Short History of the World

H. G. Wells

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বসেরা চিরায়ত গ্রন্থ

বিশ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মূল : এইচ. জি. ওয়েল্‌স্

অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

www.nagorikpathagar.org

সন্দেশ
ISBN-978-984-8088-71-5
বিশ্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
মূল : এইচ. জি. ওয়েল্‌স্
অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন

A Short History of the World by H. G. Wells
First published : 1922
অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০১৩

সন্দেশ প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
তৃতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৭

কোড : ১০০৭

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র : সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩৯৯.০০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার গ্রন্থপ্রেমী পুত্র
শিব্‌ব্রত-কে

www.nagorikpathagar.org

দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন অনূদিত অন্যান্য বই :

মহারথীদের দুঃস্বপ্ন / বার্ট্রাণ্ড রাসেল
অনাগত শিশুর জন্য শোকগাথা / ইমরে কারতেশ্‌জ
তাস রহস্য / ইয়স্তেন গার্ডার
থ্রু আ গ্লাস ডার্কলী / ইয়স্তেন গার্ডার
কমলা সুন্দরী / ইয়স্তেন গার্ডার
ক্রিস্টমাস মিস্ট্রি / ইয়স্তেন গার্ডার
শুনছ, কোথাও আছো কি কেউ? / ইয়স্তেন গার্ডার
ভিটা ব্রেভিস / ইয়স্তেন গার্ডার
গ্রহযুদ্ধ / এইচ. জি. ওয়েলস্‌

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

১. মহাশূন্যে পৃথিবী # ১৩
২. সময়ের মানদণ্ডে বিশ # ১৪
৩. প্রাণের আবির্ভাব # ১৬
৪. মৎস্য যুগ # ১৮
৫. কয়লা জলাভূমির যুগ # ২০
৬. সরীসৃপ যুগ # ২২
৭. আদিযুগের পাখি ও স্তন্যপায়ী # ২৪
৮. স্তন্যপায়ী যুগ # ২৭
৯. বানর, এইপ (উল্লুক), অর্ধ-মানব # ২৯
১০. নিয়ান্ডার্থাল ও রোডেশীয় মানব # ৩২
১১. প্রথম সত্যিকারের মানুষ # ৩৫
১২. আদিম চিন্তাভাবনা # ৩৭
১৩. কৃষির সূচনা # ৪০
১৪. আদি আমেরিকান ৪৩
১৫. সুমেরিয়া, আদিযুগের মিশর ও লিখনশৈলী # ৪৬
১৬. আদিম যাযাবর জনগোষ্ঠী # ৪৯
১৭. প্রথম সমুদ্রগামী জাতি # ৫১
১৮. মিশর, ব্যাবিলন ও এসিরিয়া # ৫৪
১৯. আদিম আর্য জাতিগোষ্ঠী # ৫৮
২০. সর্বশেষ ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য ও প্রথম দারায়ুসের সাম্রাজ্য # ৬১
২১. ইহুদিদের আদি ইতিহাস # ৬৪
২২. জুডিয়ার পুরোহিত ও নবীগণ # ৬৯
২৩. গ্রিকদের উত্থান # ৭১
২৪. গ্রিক ও পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধ # ৭৪
২৫. গ্রিসের জাঁকজমক # ৭৭
২৬. আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্য # ৮২
২৭. আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর ও লাইব্রেরি # ৮২
২৮. গৌতম বুদ্ধের জীবনী # ৮৫
২৯. মহারাজ অশোক ৮৭
৩০. কনফুসিয়াস ও লাওৎসে # ৯০
৩১. ইতিহাসে রোমের অভ্যুদয় # ৯৩
৩২. রোম ও কার্থেজ # ৯৬
৩৩. রোম সাম্রাজ্যের বিস্তার # ১০০
৩৪. রোম ও চীন # ১০৭

www.nagorikpathagar.org

৩৫. আদি রোমান সাম্রাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা # ১০৯
৩৬. রোম সাম্রাজ্যে ধর্মের বিকাশ # ১১৩
৩৭. যিশুর শিক্ষা # ১১৭
৩৮. আদর্শিক খ্রিষ্টীয় মতবাদের বিকাশ # ১২০
৩৯. বর্বররা সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম দু'ভাগে ভাগ করে # ১২২
৪০. হূনদের অভ্যুদয় এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের সমাপ্তি # ১২৬
৪১. বাইজেন্টীয় ও সাসানীয় সাম্রাজ্য # ১২৯
৪২. চীনে তাং এবং সুই রাজবংশ # ১৩১
৪৩. মুহাম্মদ (সঃ) ও ইসলাম # ১৩৩
৪৪. আরবদের গৌরবোজ্জ্বল দিন # ১৩৫
৪৫. লাতিনীয় খ্রিষ্টবাদের অগ্রগতি # ১৩৯
৪৬. ক্রুসেড এবং পোপের প্রাধান্য # ১৪৫
৪৭. বিদ্রোহী রাজন্য এবং বিশাল বিভক্তি # ১৫১
৪৮. মোঙ্গল বিজয় # ১৫৬
৪৯. ইউরোপে জ্ঞানচর্চার পুনর্জাগরণ # ১৬০
৫০. লাতিনীয় চার্চের পুনর্গঠন (রিফর্মেশন) # ১৬৫
৫১. সম্রাট পঞ্চম চার্লস # ১৬৮
৫২. ইউরোপে রাজতন্ত্র ও পার্লামেন্টারি প্রজাতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা # ১৭২
৫৩. এশিয়া ও সমুদ্রের ওপারে নতুন ইউরোপীয় সাম্রাজ্য # ১৭৮
৫৪. আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম # ১৮২
৫৫. ফরাসি বিপ্লব ও ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা # ১৮৫
৫৬. নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপে বিরাজিত অস্বস্তিকর শান্তি # ১৯০
৫৭. বস্তুবাদী জ্ঞানের বিকাশ # ১৯৩
৫৮. শিল্পবিপ্লব # ১৯৭
৫৯. আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণার বিকাশ # ১৯৯
৬০. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণ # ২০৩
৬১. ইউরোপে জার্মানির প্রাধান্য অর্জন # ২০৯
৬২. বিদেশে বাষ্পীয় পোত ও রেলপথের সাম্রাজ্য # ২১১
৬৩. এশিয়ায় ইউরোপীয় আগ্রাসন ও জাপানের অভ্যুদয় # ২১৬
৬৪. ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য # ২১৯
৬৫. ইউরোপে অস্ত্রসজ্জা ও ১৯১৪-১৮ এর মহাসমর # ২২০
৬৬. রুশ বিপ্লব # ২২৪
৬৭. যুদ্ধোত্তর উল্লাস # ২২৮
৬৮. মোহমুক্তি # ২৩৪
৬৯. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ # ২৪৩
৭০. আবার সেই যুদ্ধোত্তর আনন্দোচ্ছ্বাস # ২৫১
৭১. বিভক্ত পৃথিবী # ২৫৬

www.nagorikpathagar.org

ম্যাপসমূহ

১. চতুর্থ তুষার যুগে (প্রায় ৫০,০০০ বছর পূর্বে) ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার সম্ভাব্য পরিলেখ # ৩৩
২. মানবজাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের সর্বাধুনিক ধারণাগত নকশাচিত্র। # ৪১
৩. ব্যাবিলনীয় সম্রাট নেবুচাদনেজারের রাজত্বকালে মেডীয় ও দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় (চালদীয়) সাম্রাজ্যের সম্পর্ক # ৬২
৪. সর্বোচ্চ সম্প্রসারণকালে দারায়ুস (তদীয় করদ রাজ্যসমূহসহ) সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি # ৬৩
৫. হিব্রুদের আবাসভূমি # ৬৬
৬. রোমান শক্তি ও তদীয় মিত্ররাজ্যসমূহের পরিলেখ (তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের প্রারম্ভে ১৫০ খ্রিষ্টপূর্ব) # ৯৯
৭. সাম্রাজ্য ও বর্বর জাতিসমূহ # ১২৩
৮. ২৫ বছরে মুসলিম সাম্রাজ্য # ১৩৬
৯. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শক্তির বিকাশ # ১৩৮
১০. চার্লস মার্টেলের আমলে ফ্র্যাংক আধিপত্য # ১৪২
১১. শার্লামেনের মৃত্যুকালে (৮১৪ খ্রিঃ) ইউরোপ # ১৪৪
১২. চেঙ্গিস খানের মৃত্যুকালে তার সাম্রাজ্য (১২২৭ খ্রিঃ) # ১৫৮
১৩. মহানুভব সুলেমানের মৃত্যুকালে অটোমান সাম্রাজ্য (১৫৬৬ খ্রিঃ) # ১৫৯
১৪. ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তিচুক্তির পরে মধ্য ইউরোপ (১৬৪৮ খ্রিঃ) # ১৭৭
১৫. আমেরিকায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেন (১৭৫০ খ্রিঃ) # ১৮১
১৬. যুক্তরাষ্ট্র : বসতিস্থাপনের পরিসীমা (১৭৯০ খ্রিঃ) # ১৮৪
১৭. ভিয়েনা কংগ্রেসের পরে ইউরোপ # ১৯১
১৮. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র # ২০৬
১৯. ইউরোপ ১৮৪৮-৭১ # ২১০
২০. ১৮১৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য # ২১৩
২১. ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সমুদ্রপারের সাম্রাজ্য ১৯১৪ # ২২২
২২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ # ২৪২

www.nagorikpathagar.org

মন্তব্য : বর্তমান সংস্করণে প্রথম থেকে ছেষট্টি অধ্যায় পর্যন্ত মদীয় ও রেমন্ড পোস্টগেটকৃত কোনো কোনো বিষয়ে সামান্য কিছু সংশোধন ব্যতিরেকে এইচ. জি. ওয়েলস্ যেমনটি রেখে গিয়েছিলেন, তেমনটিই অবিকৃত রাখা হয়েছে। পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায় রেমন্ড পোস্টগেট কর্তৃক লিখিত।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থটি উপন্যাসের মতোই সহজপাঠ্য। বিস্তারণ ও জটিলতা পরিহার করে ইতিহাসের সহজ সাধারণ জ্ঞানই এতে পরিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ পাঠ করে পাঠক ইতিহাস সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা অর্জন করতে পারবে, যা তার জন্য কোনো বিশেষ যুগ বা বিশেষ দেশের ইতিহাস পঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এটা কাজ করবে প্রাথমিক প্রস্তুতির মূল পরিক্রমা হিসেবে, যাতে পাঠ্য সহায়তা লাভ করবে লিখনের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ আউট লাইন অব হিস্ট্রি পাঠ করার। তবে এর বিশেষ উদ্দেশ্য হলো কর্মব্যস্ত সাধারণ পাঠকদের চাহিদা পূরণ, যারা এতই কর্মব্যস্ত যে আউট লাইনের ম্যাপ ও কাল নির্ঘণ্ট সবিস্তারে পাঠ করার মতো যথেষ্ট অবকাশ পায় না। যারা চায় শুধু মানবজাতির মহান অগ্রযাত্রার কাহিনী সম্পর্কে তাদের অস্পষ্ট খণ্ডিত ধারণা পুনঃসংশোধন করতে। এটা পূর্বতন গ্রন্থের বিমূর্ত সংকুচিত রূপান্তর নয়। এটা আরো ব্যাপক সাধারণীকৃত ইতিহাস, যা নতুন করে পরিকল্পিত ও লিখিত।

এইচ. জি.ওয়েলস্

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

১. মহাশূন্যে পৃথিবী

পৃথিবীর ইতিহাস, এমন একটা গল্প যার জ্ঞান এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। শ'দুয়েক বছর আগে মাত্র মানুষ ৩,০০০ বছরের সামান্য বেশি সময়ের ধারণা লাভ করেছে। এর আগের সময়টাতে কী ঘটেছে তা কল্পকাহিনী ও ধারণাপ্রসূত। সভ্য জগতের বিশাল অংশে বিশ্বাস করা হতো এবং শিক্ষা দেয়া হত যে ৪০০৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হঠাৎ করেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল; তবে সেটা কি বসন্ত না শরৎকাল-এ নিয়ে মতভেদ ছিল। এই আজগুবি ভুল ধারণাটার উৎস ছিল হিব্রু বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যা আর তার সাথে জড়িত যথেচ্ছ ধর্মতাত্ত্বিক অনুমান। অবশ্য বহু আগেই ধর্মগুরুদের দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে আর এটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত, আমরা যে মহাবিশ্বে অবস্থান করছি তা অস্তিত্বশীল রয়েছে বিপুল কালব্যাপী; এমনকি তা অনন্তকালও হতে পারে। তবে অনন্তকাল ব্যাপারটা বিভ্রান্তিপ্রসূতও হতে পারে; যেমন মুখোমুখি দুটি আয়না স্থাপন করলে তার বিস্তৃতি অসীম মনে হয়, তবে মাত্র ছয়-সাত হাজার বছর আগে মহাবিশ্বের সৃষ্টি– এটা এখন বাতিল ধারণা।

এখন সবারই জানা যে আমাদের পৃথিবী প্রায় বর্তুলাকার দুপাশে সামান্য চাপা, অনেকটা কমলালেবুর মতো, যার ব্যাস মোটামুটি ৮,০০০ মাইল। প্রায় ২,৫০০ বছর ধরে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি সম্বন্ধে অন্তত সীমিতসংখ্যক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরিজ্ঞাত ছিল। তৎপূর্বে মানুষের ধারণা সমতলিক এবং আকাশ ও তারকাসমূহের সাথে এর অবস্থানগত অনেক উদ্ভট ধারণাই জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখন আমরা জানি যে পৃথিবী তার অক্ষরেখার (এই অক্ষরেখা পৃথিবীর বিষুবীয় ব্যাসের চেয়ে ২৫ মাইল কম) ওপর ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। এটাই দিন-রাত্রির পরিবর্তনের কারণ আর পৃথিবী প্রতি এক বছরে সামান্য বিস্তৃত ও ধীর পরিবর্তনশীল ডিম্বাকার পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে। পরিক্রমণকালে সূর্য থেকে পৃথিবীর সর্বনিম্ন দূরত্ব ৯,১৫,০০০০০ এবং সর্বাধিক দূরত্ব ৯,৪৫,০০০০০ মাইল।

পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ২৩৯০০০ মাইল দূরত্বে একটা বর্তুলাকার বস্তুপিণ্ড চন্দ্র পৃথিবী পরিক্রমণ করছে। শুধুমাত্র পৃথিবী আর চন্দ্রই যে সূর্যপরিক্রমা করছে তা নয়, বুধ ও শুক্র যথাক্রমে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল ও ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরত্বে থেকে সূর্য

www.nagorikpathagar.org

পরিক্রমা করছে; আর পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ গ্রহাণুপুঞ্জ অঞ্চল ছাড়িয়ে পরিক্রমারত রয়েছে মঙ্গল। এই দূরত্ব অনুধাবন করা বেশ কঠিন। সূর্য ও গ্রহদের কক্ষপথ বোধগম্য পর্যায়ে নামিয়ে আনলে পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য হবে।

এক্ষেত্রে পৃথিবীকে যদি ১ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট গোলক কল্পনা করা যায়, তাহলে সূর্য হবে ৩২৩ গজ ব্যাসের বিশাল এক পিণ্ড আর পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব হবে মাইলের এক-পঞ্চমাংশ। আর চন্দ্র হবে ছোট্ট এক মটরদানা, যার অবস্থান পৃথিবী থেকে আড়াই ফুট। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে রয়েছে বুধ ও শুক্র সূর্য থেকে যাদের অবস্থান হবে ১২৫ গজ আর ২৩৩ গজ। এরপর বিশাল শূন্যতা অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে মঙ্গলে যার দূরত্ব সূর্য থেকে ৪৯০ গজ। বৃহস্পতি প্রায় ১ মাইল দূরে আর তার ব্যাস ১ ফুটের মতো। তার চেয়ে কিছুটা ছোট শনি রয়েছে দুই মাইল দূরে, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লোটো যথাক্রমে চার, পাঁচ ও আট মাইল। তারপর নাই নাই, কিছু নাই, আছে শুধু ক্ষুদ্র কণা আর বাষ্পপুঞ্জ হাজার হাজার মাইল যার ব্যাপ্তি। এই মানদণ্ডে পৃথিবীর নিকটতম তারকার দূরত্ব হবে ৫০,০০০ মাইল।

এই সংখ্যাগুলি হয়তো মহাশূন্যের বিশালতা সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা দেবে, যার মাঝে নিত্যকাল অভিনীত হচ্ছে জীবননাট্য।

কারণ আমরা জানি এই বিশাল শূন্যতার মাঝে একমাত্র পৃথিবীতেই রয়েছে প্রাণের অস্তিত্ব। পৃষ্ঠদেশ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র অবধি ৪০০০ মাইলের মধ্যে মাত্র ৩ মাইল পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করাই এ যাবৎ সম্ভব হয়েছে, আর ঊর্ধ্বপানে আমাদের দৌড় মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিস্তার।

সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা পাঁচ মাইল, পাখিরা আকাশে পাঁচ মাইলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, আর ছোট পাখি বা পতঙ্গ যদি বিমানে করে বহন করা যায়, তাহলে এর চেয়ে অনেক কম উচ্চতাতেই তারা অচৈতন্য হয়ে ঢলে পড়ে। তাপাতদৃষ্টিতে মহাশূন্যে সীমাহীনতা নির্জীব প্রাণহীন।

২. সময়ের মানদণ্ডে বিশ্ব

গত পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞানচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ মানুষের গবেষণায় পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় তথ্য বেরিয়ে এসেছে। পদার্থ ও ফলিত জ্যোতির্বিদ্যা এ যাবৎকাল অনগ্রসরই রয়ে গেছে, যাতে তা অনেকটাই অনুমাননির্ভর। এর ফলে সাধারণ প্রবণতা হলো ভূমণ্ডলের বয়স ক্রমান্বয়ে দীর্ঘায়িত করা। এ যাবৎ সম্ভাব্য ধারণা সূর্যের চারপাশে ঘূর্ণায়মান স্বাধীন গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর বয়স ২,০০০,০০০,০০০ বছরেরও বেশি। হয়তো তার চেয়েও অনেক বেশি। সময়ের এই বিপুল বিস্তার কল্পনাকেও পর্যুদস্ত করে।

www.nagorikpathagar.org

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভের পূর্বে সূর্য এবং তাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ অপরিমেয় কালব্যাপী মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত বস্তুপুঞ্জরূপে ঘুরে বেড়াত। আকাশের বিভিন্ন অংশে টেলিস্কোপের সাহায্যে আমরা আবর্তমান বস্তুপুঞ্জের উজ্জ্বল মেঘ, প্যাঁচানো নীহারিকাসমূহ দেখতে পাই। মনে হয় এগুলি নিজের কেন্দ্রের চারপাশেই পাক খাচ্ছে। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী অনুমান করেন আমাদের সৌরমণ্ডলও এককালে এমন এক আবর্তনশীল বস্তুপুঞ্জ ছিল, আর এই বস্তুপুঞ্জই ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। অকল্পনীয় মহাকাশব্যাপী ঘনীভবন প্রক্রিয়ান্তে অবশেষে পৃথিবী আর চাঁদের অস্তিত্ব স্পষ্ট হতে থাকে। এখনকার ঘূর্ণনের চেয়ে তখনকার ঘূর্ণনবেগ অনেক গুণ বেশি ছিল; সূর্য থেকে তাদের দূরত্ব কম ছিল, কাজেই ঘূর্ণনবেগ বেশি ছিল সম্ভবত তারা ছিল জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক ও বহির্দেশ ছিল গলিত। গগনমার্গে সূর্য ছিল বহুগুণ বেশি জ্বলন্ত।

আদিকালের পথ ধরে যদি আমরা পেছনে ফিরে যেতে পারি, তাহলে দেখতে পাব ইতিহাসের প্রাথমিক স্তরে পৃথিবী ছিল ধাতু গলানো চুল্লি ব্লাস্ট ফারনেস বা জমাট বাঁধার পূর্বে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো। পানির কোনো অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। কারণ প্রবল তাপে সালফার ও অন্যান্য ধাতুর ঝঞ্ঝা-বায়ু বিক্ষিপ্ত প্রবাহে আবহ ছিল টালমাটাল। তার নিচে ছিল গলিত প্রস্তরের ফুটন্তপ্রবাহ। আকাশে ছিল দ্রুত অপসৃয়মান জ্বলন্ত সূর্যঃ যেন অগ্নিশিখার শ্বাসপ্রবাহ চলছে।

পরবর্তী দশ লক্ষ বছরে এই জ্বলন্ত ভাস্বরতা হ্রাস পেতে থাকে। আকাশে বাষ্পরাজি ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে আর ওপরে বাষ্পের ঘনত্ব কমতে থাকে। জমতে থাকা বিশাল বিশাল প্রস্তর স্তূপ কঠিনতা প্রাপ্ত হয়ে তরলীভূত সমুদ্রবক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। সূর্য আর চন্দ্র দূরে সরে গিয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রতর কিন্তু স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। আকাশে তাদের গতিবেগ হতে থাকে শ্লথতর। আকারে ক্ষুদ্রতর হওয়ায় চাঁদ দ্রুতগতিতে শীতলতা প্রাপ্ত হতে থাকে আর পর্যায়ক্রমে গ্রহণের দ্বারা বাধাগ্রস্ত আর পূর্ণিমায় আলো ছড়াতে থাকে।

এমনি করে বিপুল ব্যাপ্ত কালান্তরে পৃথিবী আমাদের বাসভূমি আজকের পৃথিবীর রূপ নিতে থাকে। অবশেষে এমন এক যুগ এলো যখন বাতাসের তাপমাত্রা কমতে কমতে বাষ্প জমে আকাশে মেঘের সঞ্চার হলো। তারপর হিস্ হিস্ শব্দে প্রথম বৃষ্টিধারা আছড়ে পড়ল প্রথম পর্বতের গায়ে। অফুরন্ত যুগব্যাপী উত্তপ্ত পাথরের গায়ে পড়ে আর বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে যায় আবার ঝরে পড়ে। তারপর তরল পানি জমাট বাঁধা পাহাড় থেকে গড়িয়ে চলতে চলতে ক্ষয়িভূত পাহাড় থেকে বালি, কাঁকড় ঝরনা ধারায় বইয়ে গর্ত আর হ্রদে জমতে থাকে। সে সময় যদি কোনো মানব সন্তানের পৃথিবীপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকার সৌভাগ্য হত, তাহলে নিজেকে দেখতে পেত লাভাসদৃশ বস্তুপিণ্ডের মাঝে, চারপাশে উদ্ভিদ বা প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। প্রত্যক্ষ করত উষ্ণ তীব্র বাতাস, আজকের এই শান্ত পৃথিবীতে সর্বোচ্চ গতির টর্নেডো যার কাছে তুচ্ছ। আর আকাশ থেকে প্রবল

www.nagorikpathagar.org

বেগে অঝোর ধারায় যে বৃষ্টি নেমে আসত তার সাথে আজকের শান্ত পৃথিবীর কোনোই পরিচয় নেই। সেই প্রবল প্রবাহ আদি পর্বতপৃষ্ঠ দিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ার সময় তার প্রবল ঘর্ষণে পাথর ক্ষয়ে গিয়ে গিরিখাত সৃষ্টি করেছে। আর আলগা হয়ে যাওয়া বালি, কাঁকড় গভীর গিরিখাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর আদি সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়েছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশে দৃষ্টিগোচর হত সূর্য। চন্দ্রের প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটা আর নিত্যদিনের ভূমিকম্পে তখন পৃথিবীতে চলত অবিরাম উথালপাতাল। আজ যে চাঁদের মাত্র একটি পার্শ্বই দৃশ্যমান, তখন সেটাও আবর্তন করত আর তার চির অদেখা পার্শ্বও পৃথিবীকে দেখিয়ে দিত।

বয়স বাড়ছে পৃথিবীর, তার সাথে দিন হচ্ছে দীর্ঘতর, সূর্য ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে আর তার খরতাপ হ্রাস পাচ্ছে। আকাশে চাঁদের পদক্ষেপ শ্লথতর হচ্ছে। বারিপাত আর ঝড়ের গতিবেগ কমে আসছে, সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি হয়ে মহাসমুদ্রের রূপ নিয়ে আজকের সাগর-বসনা পৃথিবীকে নতুনরূপে সাজিয়ে তুলছে, তবে তখন অবধি পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়নি, সমুদ্র নিষ্প্রাণ, পর্বত বন্ধ্যা।

৩. প্রাণের আবির্ভাব

মনুষ্য জ্ঞান ও স্মৃতির পূর্বে প্রাণের যে ধারণা আমরা লাভ করি তার সবটাই এসেছে স্তরীভূত পর্বত থেকে সংগৃহীত জীবাশ্ম ও অন্যান্য নিদর্শন থেকে। শ্লেট, চুনাপাথর, বেলেপাথর ইত্যাদি মাঝে রক্ষিত রয়েছে আদি প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্থি, খোলা, আঁশ, পদচিহ্ন, আঁচড়, কাণ্ড, ফল। তার সাথে রক্ষিত আছে প্রাগৈতিহাসিক ঢেউ ও বৃষ্টিপাতের চিহ্ন। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দ্বারা পাথর ও প্রাণের সন্নিবেশ একসূত্রে গাঁথা সম্ভব হয়েছে। আজকের দিনের সাধারণ জ্ঞান এটুকুই। তবে এই পলল-শিলা সুবিন্যস্ত স্তরে সজ্জিত পাওয়া সম্ভব হয়নি। এগুলি বিকৃত, বিধ্বস্ত হয়েছে, যেন কেউ তাণ্ডব চালিয়ে একটা লাইব্রেরির বইয়ের পাতাগুলি ছিঁড়ে ফুঁড়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে। এই পাতাগুলি আবার সাজিয়ে সুবিন্যস্ত পাঠযোগ্য করতে প্রয়োজন হয়েছে বহু নিবেদিত প্রাণের আজীবন প্রয়াস। ভূ-তত্ত্ববিদরা প্রাচীন এই শিলাস্তরের নাম দিয়েছেন অ্যাজোয়িক শিলা; কারণ তাতে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। উত্তর আমেরিকার বিশাল এলাকায় এই অ্যাজোয়িক শিলাস্তর অনাবৃত পড়ে আছে। এগুলি এত পুরু যে ভূ-তত্ত্ববিদরা মনে করেন তারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ধারণ করে আছে। এই গভীর তাৎপর্যময় বিষয়টি আমি আর একবার উল্লেখ করতে চাই। ভূভাগ থেকে সমুদ্র পৃথক হওয়ার মাঝে যে বিশাল সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তার অর্ধেকটাতেই প্রাণের কোনো চিহ্ন লক্ষিত হয়নি। প্রথম দিককার জীবাশ্মের

www.nagorikpathagar.org

রেখাগুলি অস্পষ্ট এবং এখন পর্যন্ত তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে ধীরে ধীরে যতই অতীতের রেকর্ড ধরে সামনে এগোতে থাকি, অতীত প্রাণের চিহ্ন ততই স্পষ্টতর হতে থাকে এবং প্রাচুর্যও বাড়তে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসের যে যুগের স্পষ্টতম ছবি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত, ভূ-তত্ত্ববিদরা তাকে অভিহিত করেন নিম্নতর প্যালিওজোয়িক যুগ হিসেবে। এর প্রস্তরিভূত সমুদ্রতলে নানাবিধ জিনিসের চিহ্ন বহন করে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে খোলযুক্ত ছোট ছোট মাছের খোলস, উদ্ভিদাকার সামুদ্রিক প্রাণীর পুষ্পসদৃশ কাণ্ড আর রয়েছে সামুদ্রিক কীট ও চিংড়ি-কাঁকড়ার জীবাশ্ম। এসব আদি প্রাণীর মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদ, উকুনজাতীয় ট্রাইলোবাইট, যারা উত্তেজিত হলে নিজের শরীরকে বল পাকিয়ে ফেলতে পারে। এর বিশ-ত্রিশ লক্ষ বছর পর আবির্ভাব হলো সামুদ্রিক বিচ্ছুর, এর আগে এত দ্রুতগামী আর শক্তিশালী আর কোনো প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি। এসব প্রাণীর কোনোটাই তেমন বৃহদাকার ছিল না। সবচেয়ে বড়টি ছিল বিষকাঁকড়া, দৈর্ঘ্যে নয় ফুটের মতো। স্থলভাগে তখন পর্যন্ত প্রাণের কোনো চিহ্ন ছিল না; না প্রাণী না উদ্ভিদ। সময়ের এই পর্যায়ে মাছ বা অন্য কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণীর আগমন ঘটেনি। মূলত এই সময়ে যেসব প্রাণী বা উদ্ভিদ তাদের পদচিহ্ন আমাদের জন্য রেখে গেছে তা ছিল অগভীর জলের এবং জোয়ার মধ্যবর্তী সত্তা।

মনে রাখা ভালো যে আদি প্যালিওজোয়িক পাথরে আমরা প্রাণের আবির্ভাবের কোনো চিহ্ন পাই না, যদি না কোনো প্রাণীর অস্থি বা শরীরের কোনো শক্ত অংশ থাকে যেমন– খোলস বা প্রাণীটি যদি এমন বড় না হয় যে কাদায় তার পদচিহ্ন রেখে যাবে তাহলে তার জীবাশ্ম পাওয়া সম্ভব নয়। আজকের পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোমল শরীরের জীব আছে যারা ভবিষ্যৎ ভূ-বিজ্ঞানীদের জন্য কোনো নিশানা রেখে যাবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তো এমন লক্ষ কোটি জীব পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, বিকাশ লাভ করেছে আবার পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্বের কোনো নিশানা না রেখেই লোপ পেয়েছে। অ্যাজোয়িক যুগের উষ্ণ অগভীর হ্রদে বা সূর্যালোকিত অনুচ্চ পাহাড়ে যুগ যুগ ধরে ক্ষুদ্রাকৃতি খোলসহীন প্রাণী কোমল আঠালো জলজ উদ্ভিদ অস্তিত্বশীল ছিল। ব্যাংকের লেজারে যেমন এলাকার সব লোকের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে না, তেমনি পাথরেও সব প্রাণীর রেকর্ড সন্নিবেশিত নেই। একটি প্রাণী কালের খাতায় শুধু তখনই স্বাক্ষর রেখে যায় যে নিজের শরীরে শক্ত আবরণ বা খোলা নির্মাণ করে আর উদ্ভিদের কাণ্ড এমনকি কোনো নিশানা রেখে গেলেও হয়তো পরে তা নষ্ট হয়ে গেছে। যে শিলাস্তর দিয়ে আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ নির্মিত তা অবিরাম ক্ষয়ে যাচ্ছে আর চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে, মাঝে মধ্যে গলে গিয়ে নতুন আকারে নতুন রাসায়নিক সংযোগে পুনরাবির্ভূত হচ্ছে। এটা সম্ভাব্য বলেই মনে হয় যে এককালে সুন্দরভাবে রক্ষিত অনেক জীবাশ্মই হয়তো কালের আবর্তনে চূর্ণ হয়ে মুছে গিয়ে থাকবে। যে যুগে শিলাস্তরে জীবাশ্মের চিহ্ন পাওয়া গেছে তারও অনেক কাল পূর্বের শিলায় গ্রাফাইটের সন্ধান মিলেছে, যা প্রকৃতপক্ষে অসংশ্লিষ্ট

www.nagorikpathagar.org

কার্বন, বিশেষজ্ঞদের মতে তা হয়তো কোনো অজ্ঞাত প্রাণীর ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অসংশ্লিষ্ট রয়ে গেছে।

৪. মৎস্য যুগ

এক সময় বিশ্বাস করা হত পৃথিবী সৃষ্টির মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সমস্ত প্রজাতি স্বরূপে সৃষ্টি হয়েছিল। আজ আমরা তাদের যে রূপে দেখছি অনাদিকাল থেকে তারা সেই রূপেই বর্তমান ছিল। তবে শিলাস্তরে রক্ষিত নিশানা গবেষণা করে মানুষ আজ নিশ্চিত হতে পেরেছে যে যুগ যুগ ধরে ধীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণিকুল স্বস্থিতি ধারণ করেছে। মানুষের এই বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে জৈবিক ক্রমবিকাশরূপে বিকশিত হয়েছে, যার মূল কথা হলো অ্যাজোয়িক যুগে সমুদ্রে আকারহীন প্রাণের যে উদ্ভব ঘটে, তাই ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে আজকের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতির জন্ম দেয়। অতীতে পৃথিবীর বয়সের মতোই জৈবিক ক্রমবিকাশের ধারণাটাও প্রবল বিতর্কের মুখে পতিত হয়। এমন একটা সময় ছিল যে জৈবিক ক্রমবিকাশের তত্ত্বটি ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বের বিরোধী। তবে সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে আর আজ ইহুদি, খ্রিষ্টান আর মুসলমান ধর্মবিশ্বাসীরাও খোলা মনে জীবনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন। কোনো প্রাণই হঠাৎ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি। প্রাণ এসেছে, বিকশিত হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে কালের মহাসমুদ্র পেরিয়ে জোয়ার-ভাটার পললের মাঝে নড়েচড়ে বেড়ানো প্রথম প্রাণ বিকশিত, আজকের স্বাধীন সত্তার শক্তিমান সচেতন প্রাণের পদচারণায় মুখর পৃথিবী।

ব্যষ্টির মাঝে প্রাণের স্থিতি। এই ব্যষ্টি সমুদয় সুনির্দিষ্ট, সত্তাবান। এগুলি একান্তই জড়পিণ্ড নয়, সীমাহীন, গতিহীন স্ফটিকও নয়। দুটি বৈশিষ্ট্য এদের জড়বস্তু থেকে আলাদা করেছে। তারা অন্য বস্তু নিয়ে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারে, নিজের অংশ করে নেয় আর পরে নিজের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে। তারা আহার গ্রহণ করে, সন্তান জন্ম দেয়। অনেকটা নিজের মতো অন্য ব্যষ্টির সৃষ্টি করে। তবে সর্বদাই নিজের থেকে সামান্য পার্থক্য থাকে। ব্যষ্টি ও বংশধরের মাঝে সুনির্দিষ্ট পারিবারিক সাদৃশ্য থাকে, আবার জনক ও জনিতের মাঝে পার্থক্যও থাকে। জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যেই এটা লক্ষণীয়।

এ যাবৎ বিজ্ঞানীরা জনক ও জনিতের মধ্যে একাধারে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কারণ খুঁজে পাননি। তবে সাধারণ জ্ঞান দিয়ে এটা বোঝা যায় যে জীবন যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তার পরিবর্তনের সাথে প্রজন্মের পার্থক্যের যোগসূত্র আছে। কারণ যে কোনো প্রজন্মেই ব্যষ্টিক পরিবর্তন

www.nagorikpathagar.org

পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে খাপখাইয়ে নিতে সহায়তা করে, আবার কিছু ব্যষ্টিক পরিবর্তন পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে নেওয়ার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। মোটের ওপর পূর্ববর্তী পরিবর্তন তাদের জীবনকালকে দীর্ঘায়িত করে, আর প্রজননেও প্রাচুর্য আনে, কাজেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবর্তনগুলি অনুকূলেই প্রবাহিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন নামে খ্যাত এ পদ্ধতিটি পুনরুৎপাদন ও ব্যষ্টিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ততটা বিজ্ঞানসিদ্ধ নয় বলে মনে হয়। প্রজাতির মাঝে ভিন্নতা আনয়ন, বিধ্বংসন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে বিজ্ঞান এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি।

বহু বিজ্ঞানসেবী মানুষ জীবনের সূত্রপাত নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছে আর তাদের চিন্তার ফসল বেশ চিত্তাকর্ষক; তবে কীভাবে জীবন তার যাত্রা শুরু করল সেই জ্ঞান থেকে মানুষ দূরেই রয়ে গেছে। অনুমানগুলিও দৃঢ়প্রত্যয়ী নয়। তবে নির্ভরযোগ্য সকল ব্যক্তিত্বই স্বীকার করে যে প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটে বালুকাময় অগভীর সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে আর জোয়ার-ভাটার ক্রিয়ায় তা উপকূলের ডাঙ্গায় আর গভীর সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে।

আদিকালের পৃথিবী ছিল প্রবল জোয়ার-ভাটা আর স্রোতের। জোয়ারের তোড়ে উপকূলে নিক্ষিপ্ত হয়ে শুকিয়ে গিয়ে বা ঢেউয়ের বেগে গভীর সমুদ্রে বাতাস আর সূর্যালোকের বাইরে নিমজ্জিত হয়ে অসংখ্য প্রাণী ধ্বংস হয়েছে অবিরাম। আদি প্রাণীদের অবিরাম প্রয়াস ছিল শিকড় গজিয়ে মাটি আঁকড়ে থাকা নতুবা নিজের শরীরের চার পাশে শক্ত আবরণ বা চামড়া সৃষ্টি করে নিজেকে ঘাতসহ করে তোলা। প্রথম দিকে প্রাণীদের মধ্যে পরখ করার প্রবণতা থেকেই ক্ষুধার জন্ম নেয়, আর আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, সমুদ্রের গভীরতা থেকে বেরিয়ে আসার বা অতি উজ্জ্বলতার হাত থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে।

সম্ভবত শরীরের বর্মরূপী খোলসের যতটা না শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, তার চেয়েও বেশি তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য। তবে স্থলভাগের ইতিহাসের প্রথম দিকেই দাঁত আর নখরের সৃষ্টি।

সামুদ্রিক বৃশ্চিকের আকৃতির কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। বহুযুগব্যাপী এরাই ছিল জীবনের অধিশ্বর। তারপর এলো এই প্যালিওজোয়িক শিলার বিভাজন, যাকে বলা হয় সিলুরিয়ান বিভাজন, ভূতত্ত্ববিদরা যার বয়স নির্ধারণ করেছে ৪০ কোটি বছর। সেই সময় এক নতুন ধরনের জীবের আবির্ভাব হলো যাদের রয়েছে চোখ, দাঁত আর সাঁতারের প্রবল ক্ষমতা। এরাই হলো আদিযুগের মেরুদণ্ডী মাছ।

পরবর্তী শিলা বিভাজন যাকে বলা হয়েছে ডিভোনিয়ান বিভাজন, সেই যুগ পর্বে এই মৎস্য গোষ্ঠীর প্রবলসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই বিভাজন যুগকে বলা হয়েছে মৎস্য যুগ। হাঙর ও স্টার্জিয়নের সমগোত্রীয় জীব তখন সমুদ্রবক্ষ চষে বেড়িয়েছে। ওরা আকাশে উড়ে উঠেছে, সামুদ্রিক আগাছার মাঝে দাপাদাপি করেছে, পরস্পরকে ধাওয়া করে শিকার করেছে। আর সমুদ্র মাপকাঠিতে এরা তেমন বৃহৎ ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

অধিকাংশই ছিল তিন ফুটের বেশি লম্বা, আর ব্যতিক্রমী দু-একটি ছিল বিশ ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা।

ভূ-তত্ত্ব থেকে এদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, এদের পূর্ববর্তী কোনো প্রজাতির সঙ্গে এদের যোগসূত্র স্থাপন করা যায়নি। এদের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিদদের চমকপ্রদ ধারণা আছে। তবে সে ধারণা তারা অর্জন করেছে বর্তমানে জীবিত তাদের সমগোত্রীয় প্রাণীর ডিম বিশ্লেষণ করে। এবং এ ধরনের আরো কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে। দৃশ্যতই এসব মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ছিল কোমলদেহী আর তাদের দাঁত মুখের ভিতর ছিল না, ছিল স্কেট আর ডগফিশের মতো প্রলম্বিত জিহ্বা আর আঁইশের মধ্যে, যা দিয়ে তাদের শরীর ঢাকা থাকত। প্রথম দাঁতের আবির্ভাব কামড়ানোর জন্য নয়, বরং বর্মরূপে। দাঁতের আবির্ভাবের সাথে সাথে অন্ধকার সমুদ্রগর্ভ থেকে বেরিয়ে তারা আলোয় উঠে এলো, আর এভাবেই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীরূপে তাদের নথিভুক্ত করল।

৫. কয়লা জলাভূমির যুগ

মৎস্য যুগে ভূ-ভাগ ছিল দৃশ্যত নিষ্প্রাণ, বন্ধুর পর্বতময় ভূপৃষ্ঠে চলত রোদ আর বৃষ্টির খেলা। প্রকৃত মাটি বলতে তেমন কিছু ছিল না, মৃত্তিকা নির্মাণে তখনও কেঁচোর জন্ম হয়নি। পর্বত গাত্র ভেঙেচুড়ে ফেলার মতো গাছের শিকড় ছিল না। ছত্রাক বা শেওলার চিহ্নমাত্র ছিল না। সমুদ্রের মাঝেই জীবন ছিল সীমাবদ্ধ।

নগ্ন পর্বতগাত্রে জলবায়ুর ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন আসতে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়া বেশ জটিল, আর এখনও তার হিসাব-নিকাশ চলছে। পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তন, মেরুবিন্দুর অপসারণ মহাদেশের আকার পরিবর্তন; এমনকি সৌরতাপের হ্রাস-বৃদ্ধি এসবের মিলিত প্রভাবে পৃথিবীতে বরফ যুগের সূচনা হয়, বহু লক্ষ বছরের উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে আবার পৃথিবীতে অনুকূল পরিবেশ ফিরে আসে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের বহু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। বহু যুগের বহির্মুখী চাপে ঘটে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, পর্বত আর মহাদেশের আকার যায় পাল্টে, মহাসাগরের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পর্বতের উচ্চতাও বাড়তে থাকে। তারপর আবার ফিরে আসে প্রশান্ত সুস্থিরতার যুগ। বৃষ্টি, তুষার আর বহমান স্রোতোধারায় পর্বতগাত্র ক্ষয়ে গিয়ে বিপুল পরিমাণ পলল সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত হয়ে সমুদ্রের গভীরতা কমিয়ে দিয়ে ভূ-ভাগের পরিসর বাড়াতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে উচ্চতা আর গভীরতার পর্যায়ক্রমিক যুগান্তর চলতে থাকে। পাঠকের মন থেকে এ ধারণা অপসারণ করা প্রয়োজন যে ভূ-ত্বকের কঠিনতা প্রাপ্তির পর থেকে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে শীতল হয়ে আসছে। আগের চেয়ে পৃথিবী অনেক ঠাণ্ডা হয়েছে ঠিক, তবে অভ্যন্তরীণ

www.nagorikpathagar.org

তাপ আর ভূপৃষ্ঠের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। তুষার যুগের বহু স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীতে রয়ে গেছে।

মৎস্য যুগের শেষপর্যায়ে যখন সমুদ্রের গভীরতা কমে এসেছে আর লেগুন সৃষ্টি হয়েছে, তখনই সক্রিয়ভাবে সমুদ্র ছেড়ে প্রাণী উঠে এসেছে। আজ পৃথিবীতে বিচিত্র বিভিন্নতা নিয়ে যে অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করছে লক্ষ কোটি বছর ধরে তারা অলক্ষ্যে বিকাশ লাভ করেছে।

প্রাণীদের পূর্বেই পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ তাদের রাজত্ব কায়েম করেছিল। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই, তবে প্রাণীরা উদ্ভিদকে নিবিড়ভাবে অনুগমন করেছিল। উদ্ভিদের প্রধান সমস্যা ছিল নিজেদের দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হয়ে নিজেদের উর্ধ্বভাগ সূর্যের আলোর দিকে তুলে ধরা, দ্বিতীয় সমস্যা ছিল পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ লাভ করা এবং সে জন্য নিজের শরীরের টিস্যুসমূহকে জলের উৎসের দিকে প্রসারিত করা। কাষ্ঠল টিস্যু বিকশিত করে দুটি উদ্দেশ্য সাধন হয়। নিজেকে শক্ত করে মাটির সাথে ধরে রাখা আর পত্র, শাখা-প্রশাখায় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করা। শিলাস্তরে স্বাক্ষর রেখে গেছে সংখ্যাতীত বিচিত্র উদ্ভিদ সম্ভার যার কোনোটা বিশাল কাণ্ড যুক্ত আবার কোনোটা মস্ ফার্ন বা বিশালাকার অশ্বপুচ্ছ ইত্যাদি। এরই সাথে যুগ-যুগান্তরে গুঁড়ি মেরে উঠে আসে বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য প্রাণী; যার মধ্যে রয়েছে শতপদী, সহস্রপদী, আর আছে আদিযুগের পতঙ্গকুল। আরো রয়েছে বিরাটাকার কাঁকড়া আর সমুদ্র বিছা, রূপান্তর ঘটিয়ে যারা মাকড়সা আর স্থল বিছায় রূপ নেয়; আর তাদের অনুসরণ করে মেরুদণ্ডী প্রাণী।

প্রথম দিকের পতঙ্গরা ছিল বিরাটাকার, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ড্রাগনফ্লাই যার ডানার বিস্তার ছিল ২৯ ইঞ্চি। বিভিন্নভাবে বিকশিত এসব প্রজাতি বাতাসে শ্বাস নিত। এখন থেকে জলজ প্রাণীরাও পানিতে গোলা বাতাস গ্রহণ করতে শুরু করে। আর এখন পর্যন্ত সব প্রাণী তাই করে থাকে। এখন থেকে প্রাণীরা বিচিত্র উপায়ে তাদের আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে। শুকনো ফুসফুসের মানুষ নিশ্চয়ই দম আটকে মারা যেত। তার ফুসফুসের পৃষ্ঠদেশ অবশ্যই আর্দ্র হতে হবে, যাতে বাতাস রক্তের সাথে মিশতে পারে। বায়ু শ্বাস গ্রহণের জন্য জীবকে হয় ফুলকা নয়তো টিউবযুক্ত বাষ্পায়নরোধী ফুসফুস বিকশিত করতে হয়েছে। শরীর থেকেই প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ক্ষরণ হয়। আদিকালে বিকশিত জলচর প্রাণীদের ফুলকা স্থলে বাতাসে শ্বাস গ্রহণের জন্য উপযুক্ত নয়। ব্যাঙ বা গোসাপজাতীয় উভচর প্রাণী আদিতে ফুলকা দিয়ে শ্বাস নিত, পরে তাদের দেহে ফুসফুস বিকশিত হয়, ঠিক যেভাবে ভেসে বেড়ানোর জন্য মাছের দেহে বায়ুথলী বিকাশ লাভ করে। এসব প্রাণী এখন শুধু স্থলেই বাস করে আর কেবল ডিম পাড়ার জন্য জলে নামে।

এ যুগের জলাভূমির প্রায় সব মেরুদণ্ডী প্রাণীই ছিল উভচর, আজকের গোসাপ গোত্রের আর তাদের কোনো কোনোটা ছিল বড়সড়। এটা ঠিক যে, তারা ছিল স্থলচর তবে তারা থাকত আর্দ্র জলাভূমির কাছাকাছি, আর এ যুগের বৃহৎ সব বৃক্ষই

www.nagorikpathagar.org

ছিল উভচর স্বভাবের। তখন অবধি তাদের ফল বা বীজ উৎপন্ন হয়নি, যা সরস মাটিতে পড়ে অঙ্কুরোদগম করতে পারত। বরং তাদের স্পোর বা অণুবীজ পানিতে পড়ে বৃক্ষশিশুর জন্ম হত।

অ্যানাটমি বা অঙ্গসংস্থান বিদ্যার এটা একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়; জটিল চমকপ্রদ অভিযোজনের ক্রিয়ায় কিভাবে প্রাণীসত্তা বাতাসের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সকল প্রাণসত্তাই, উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের আদি জন্মস্থান জল। উদাহরণস্বরূপ, মাছের উপরিস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী, মানুষও যার অন্তর্গত, তাদের সবারই ডিমের মাঝে বা গর্ভাশয়ে ক্রমবৃদ্ধির কোনো একপর্যায়ে ফুলকার প্রয়োজন পড়ে, শিশুরূপে জন্ম নেওয়ার পূর্বক্ষণে যার বিলুপ্তি ঘটে। মাছের ক্ষেত্রে পানি বিধৌত চোখ, উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে পানি শোষক নেত্রপহলব দিয়ে আবৃত থাকে। নিচু মাত্রার শব্দতরঙ্গ ধারণ করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে কর্ণপটাহের। প্রায় সব প্রত্যঙ্গই অভিযোজন প্রক্রিয়ায় বাতসহা করে পরিবর্তিত হয়েছে।

এই কয়লা উৎপাদী উভচর যুগে সকল প্রাণীরই বাস ছিল জলাভূমি বা অগভীর সমুদ্রে। এখান থেকে পৃথিবীময় প্রাণী ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড় ও উচ্চভূমি তখন পর্যন্ত ছিল নিষ্প্রাণ। জীবন শ্বাস নিতে শিখেছে ঠিক, তবুও তার শিকড় রয়ে গেছে পানির মধ্যে, এখনও অনেক প্রাণীকে বংশরক্ষার জন্য পানির কাছে ফিরে যেতে হয়।

৬. সরীসৃপ যুগ

প্রাচুর্যময় কয়লা যুগের অবসানে শুরু হয় ব্যাপক বিস্তৃত শুষ্ক ও তিক্ত এক যুগের। চুনাপাথরের মধ্যে তার চিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে। অবশ্য জীবাশ্মের সংখ্যা এখানে অপ্রতুল। এ সময় তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ছিল ব্যাপক, তারপর ছিল দীর্ঘ তুষার যুগ। বিশাল এলাকাব্যাপী কয়লা জলাভূমির অবসান ঘটে, যার ওপর সঞ্চিত হয় নতুন এক সঞ্চিতি, যার চাপে বিনির্মাণ হয় এ যুগের প্রাপ্ত কয়লাখনি।

এ সময়ের কঠোর পরিবেশের চাপে জীবপর্যায়ে দ্রুত রূপান্তর ঘটতে থাকে, আর এই কঠোরতার মাঝেই প্রাণীরা নতুন নতুন শিক্ষা লাভ করতে থাকে। প্রকৃতি যতই উষ্ণ আর্দ্র অবস্থার দিকে মোড় নিতে থাকে, নতুন নতুন প্রজাতির প্রাণী তাদের অধিকার পোক্ত করতে শুরু করে। অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিশানা পাওয়া গেছে ব্যাঙাচির মতো ডিম ফুটে, যাদের পোনা কিছুদিন জলের মধ্যে পুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, বরং ডিম থেকে বেরিয়ে সরাসরি বাতাসের মধ্যে শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। ফুলকা একদম লোপ পেয়ে শুধু ভ্রূণ পর্যায়ে যার অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

পোনা পর্যায় অতিক্রম করে আসা এই প্রাণীগুলিই সরীসৃপ। সমসময়ে বীজ উৎপাদী বৃক্ষেরও উদ্ভব ঘটে, যাদের বীজ জলাভূমি বা হ্রদের বাইরেও বিস্তার লাভ করতে পারত। সেই সময় ছিল পামজাতীয় সাইকাস ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মোচাকৃতি ফলের গাছ; তবে তখন পর্যন্ত ফুলের গাছ বা ঘাসের অস্তিত্ব ছিল না। তবে প্রচুর ফার্ন গাছ আর নানা জাতীয় পতঙ্গের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ছিল গুবরে পোকা; মাছি আর প্রজাপতির আবির্ভাব ঘটেনি। এই প্রাকৃতিক কঠোরতার মধ্যে স্থলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রজাতি বেড়েই চলেছিল। এই স্থল জীবনের বিস্তার টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন ছিল শুধু অনুকূল পরিবেশ।

যুগ যুগ ধরে আবহাওয়ার অস্থিরতায় অভিবাসনের প্রশ্ন এসে যায়। তাপের ওঠানামা, কক্ষপথের পরিবর্তনে মেরু ও ক্রান্তিরেখার অপসারণ এবং উষ্ণমণ্ডলের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। মনে করা হয় ২০ কোটি বছর ধরে এ অবস্থা চলতে থাকে। এটাকে বলা হয়েছে মেসোজোয়িক যুগ। পূর্ববর্তী ১৪০ কোটি বছরের প্যালিওজোয়িক ও অ্যাজোয়িক যুগ আর বর্তমান জীববৈচিত্র্যের মাঝে বিশাল এই যুগকে বলে সরীসৃপ যুগ। বহু প্রজাতির সরীসৃপরাই এ সময়টাতে পৃথিবীতে আধিপত্য করেছে। এখন থেকে ৮ কোটি বছর আগে এ যুগের অবসান হয়।

আজকের পৃথিবীতে সরীসৃপ প্রজাতির সংখ্যা ও বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত। এটা ঠিক যে কয়লা যুগে যে উভচরদের প্রাধান্য ছিল আজকের পৃথিবীতে সরীসৃপদের প্রজাতি সংখ্যা তাদের চেয়ে বেশি। এখনও পৃথিবীতে সাপ, কচ্ছপ, কুমির আর গিরগিটিরা রয়েছে। সারা বছর তাদের প্রয়োজন উষ্ণ আবহাওয়া, তারা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। ধরে নেওয়া যায় মেসোজোয়িক যুগের অধিকাংশ সরীসৃপ প্রজাতি এ কারণে লুপ্ত হয়ে গেছে। এরা উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের বাসিন্দা। তুষার এদের সহ্য হয়নি।

আজ আমরা যেসব সরীসৃপ দেখি তাদের সংখ্যা এক সময় ছিল বিশাল। বিরাটাকার কচ্ছপ আর কুমির ছাড়াও আর এক জাতীয় সরীসৃপ ছিল, যারা বহু পূর্বেই ধরা পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তারা হলো বিচিত্র ধরনের ডাইনোসর। পৃথিবীর নিম্নাঞ্চলেই তখন ছিল উদ্ভিদের বিস্তার, এগুলি ছিল নলখাগড়াজাতীয় উদ্ভিদ। এসব মাড়িয়ে দিয়ে বিচরণ করত তৃণভোজী সরীসৃপ। মেসোজোয়িক যুগের শেষে এদের আকার ছিল বিশাল। এযাবৎকাল যত জীব বাস করেছে তারাই ছিল সবচেয়ে বৃহদাকার, আকারে তারা তিমির চেয়েও বিশাল। উদাহরণস্বরূপ ডিপ্লোডোকাস কার্নেজাই ছিল মুখের অগ্রভাগ থেকে লেজ পর্যন্ত ৮৪ ফিট লম্বা; জাইগান্টোসোরাস ছিল এর চেয়েও বড় প্রায় ১০০ ফিট। এসব তৃণভোজী ভক্ষণ করে বেঁচে থাকার জন্য মাংসাশী ডাইনোসরও ছিল, যাদের আকার এর চেয়েও বড়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল টিরানোসরাস। যে সময় চিরহরিৎ বনভূমিতে এসব তৃণভোজী আর মাংসাশী সরীসৃপ দাপিয়ে বেড়াত, তখন আর এক প্রকার সরীসৃপ ছিল যাদের সামনের পা দুটি বাদুড়ের মতো চামড়ার ডানায় রূপ নিয়ে আকাশে উড়ে

www.nagorikpathagar.org

উড়ে পতঙ্গ শিকার করে খেত। এরাই ছিল আদি উড্ডয়নক্ষম মেরুদণ্ডী প্রাণী। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য টেরোডাকটিল।

তাছাড়া কিছু কিছু সরীসৃপ আবার পানিতে ফিরে গিয়েছিল। সমুদ্রে বিস্তারকারী পূর্বজদের মধ্যে ছিল মেসোসোরাস, প্লেসিওসোরাস আর ইকথিওসোরাস। আকারে এরা ছিল আজকের দিনের তিমির মতোই বিপুলায়তন। ইকথিওসরাসরা মনে হয় সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রচারী প্রাণী ছিল, তবে প্লেসিওসরাসদের সমতুল্য কোনো প্রাণী বর্তমান যুগে আর আছে বলে মনে হয় না। এদের শরীর ছিল বৃহৎ আর লম্বা দাঁড়সদৃশ ডানা ছিল, যা দিয়ে পানিতে সাঁতার কাটা আর ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে গুড়ি মেরে চলার সুবিধা পেত। এমনকি তারা অগভীর পানির নিচ দিয়েও চলতে পারত। লম্বা সাপের মতো গলার অগ্রভাগে ছোট্ট মাথাটা আটকানো ছিল, যা রাজহাঁসের গলাকেও হার মানাত। হয় তারা পানির তলদেশে খাবার খুঁজত অথবা পানির ওপরে ভেসে বেড়ানো জীবজন্তু ছোঁ মেরে ধরে ফেলত।

এমনটাই ছিল মেসোজোয়িক যুগের স্থলপ্রাণী। মানব প্রজাতির মানদণ্ডে বিচার করলে এটা অবশ্যই অগ্রগতি। আকার, শক্তি, কুশলতায়, অনেক বেশি প্রাণচঞ্চল প্রাণী এ সময়ে উদ্ভব ঘটে, এর আগে যার অস্তিত্ব ছিল না। জলভাগে তেমন অগ্রগতি না থাকলেও প্রজাতি প্রাচুর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্কুইডের মতো পেঁচানো খোলসযুক্ত অ্যামোনাইট প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল অগভীর সমুদ্রে। প্যালিওজোয়িক যুগে তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল, তবে এখন তাদের গৌরবের যুগ। বর্তমানে অবশ্য তাদের কোনো বংশধর নেই। উষ্ণমণ্ডলীয় সমুদ্রে মুক্তাসদৃশ নটিলাস তাদের নিকটতম কুটুম্ব। দাঁত বা খোলসযুক্ত প্রাণীর বদলে নরম আঁশযুক্ত মাছেদেরই এখন রাজত্ব নদী ও সমুদ্রে।

৭. আদিযুগের পাখি ও স্তন্যপায়ী

পূর্ববর্তী কয়েকটা অধ্যায়ে মেসোজোয়িক যুগের সবুজ শ্যামল অরণ্য ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সরীসৃপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ডাইনোসররা যখন উষ্ণ আর সমতল জলাভূমিতে রাজত্ব করছিল, আর তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে টেরোডাকটিলরা ডানা মেলে আকাশে উড়ে উড়ে তদবধি পুষ্পহীন গুল্ম আর বৃক্ষের মাঝে কীটপতঙ্গের সন্ধানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান সূর্যালোকে জীবন সংগ্রামে তারা নতুন নতুন শিক্ষা গ্রহণ করছিল।

কিছু ক্ষুদ্রতর প্রজাতির লাফিয়ে চলা ডাইনোসর তাদের তুলনায় অধিক বলবান হিংস্র প্রকৃতির ডাইনোসরের কবল থেকে প্রাণরক্ষার তাগিদে অধিকতর শীতল আবহাওয়া বা পাহাড়ি উচ্চভূমি বা সমুদ্রে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এসব প্রজাতির

www.nagorikpathagar.org

গায়ে নতুন এক ধরনের আবরণ তৈরি হয়, যা ছিল সজারুর কাঁটা বা পাখির পালকের মতো। এটাই ছিল পালক সৃষ্টির সূত্রপাত। তারাই এ যাবৎ অনিবাসযোগ্য শীতল পরিমণ্ডলে নিজেদের খাপখাইয়ে নেয়। এসব প্রাণীর মধ্যে আর একটা বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে থাকে, যাকে বলা যায় নিজেদের ডিমের প্রতি অপত্য আকর্ষণ। অধিকাংশ সরীসৃপই তাদের ডিমের প্রতি উদাসীন ছিল, সূর্যতাপ আর প্রকৃতির আনুকূল্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভ্রূণের বিকাশ হত। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি তাদের ডিম পাহারা ও নিজ শরীরের উষ্ণতা দিতে শুরু করল। এসব অভিযোজনের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ কিছু পরিবর্তনও সংঘটিত হলো। যেমন এসব আদিযুগের পাখিদের রক্তে উষ্ণতা এলো আর তাদের রোদ পোহানোর প্রয়োজন হলো না।

প্রথম দিকে শরীরকে উষ্ণ রাখার জন্যই পালকের উৎপত্তি হলেও ধীরে ধীরে তা ডানার দিকে হালকা হয়ে বিস্তার লাভ করল। অন্তত একটা পাখির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যাতে সরীসৃপের মতো দাঁত আর পেছনে লম্বা লেজ আছে আর ডানায় পালকের চিহ্নও পাওয়া গেছে। পাখি আর সরীসৃপের মধ্যে যোগসূত্র এই আর্কিঅপ্টেরিক্সের আকার ছিল এখনকার কাকের সমান। বক্ষাস্থির নিচে চ্যাপ্টা তলের অভাব থেকে বোঝা যায়, এরা ঠিকমতো উড়তে পারত না; হয়তো এরা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ঝাপটা মেরে চলত। নতুন মেসোজোয়িক যুগের এই প্রজাতি টেরোডাকটিলদের মধ্যে তাদের প্রাধান্য সফলভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও মেসোজোয়িক যুগে পাখিদের প্রজাতি সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। যদি আজকে কোনো মানুষ মেসোজোয়িক যুগের কোনো দেশে ফিরে যেতে পারত, তাহলে পাখি খুব কমই নজরে পড়ত। যদিও ঘাস আর নলখাগড়ার মধ্যে অজস্র সরীসৃপ আর কীটপতঙ্গ দেখতে পেত।

আর একটা জিনিস কখনও তার নজরে আসত না; তা হলো স্তন্যপায়ী। হয়তো যাকে পাখি বলা হয়, তারও বহু লক্ষ বছর আগে স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল আর সংখ্যায় তারা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

আদিযুগের পাখিদের মতো আদি স্তন্যপায়ীদেরকেও তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল আর শৈত্যের সাথে খাপখাইয়ে নিতে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাদের শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য আঁইশের মতো কাঁটা উৎপন্ন হয়েছিল। আর এসব উপচার বহুবিধ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল। অবশেষে তারা উষ্ণরক্তের অধিকারী হতে পেরেছিল। পালকের বদলে তাদের শরীরে লোম গজাতে শুরু করে আর ডিমে তা দেওয়ার বদলে তারা ওগুলোকে নিজের শরীরের ভেতরেই রেখে দিত; যতক্ষণ সেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয়। ওদের অধিকাংশই প্রাণবন্ত হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হত। এমনকি জন্মের পরও মা তাদের সন্তানের নিরাপত্তা ও পুষ্টি-প্রদায়ী সঙ্গ প্রদান করত। আজকাল বেশির ভাগ স্তন্যপায়ীই স্ত ন্যদুগ্ধ প্রদান করে। তবে দুটি প্রাণী আছে যারা সন্তান প্রসব করলেও স্তন্য দান করে না, বরং চামড়ার নিচের এক ধরনের ক্ষরণ তাদের সন্তানদের পুষ্টি সরবরাহ করে।

www.nagorikpathagar.org

এরা হলো হংসচঞ্চু প্লাটিপাস ও একিন্ডা। একিন্ডারা লোমশ ডিম পাড়ে তারপর সেটা পেটের নিচের থলিতে রেখে দেয়, এই নিরাপদ আশ্রয়ের উষ্ণতায় অবশেষে বাচ্চা জন্ম নেয়।

মেসোজোয়িক যুগে কোনো পর্যটক গেলে যেমন তাকে একটা পাখির সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন খুঁজে বেড়াতে হত, তেমনি সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে স্তন্যপায়ীর দেখা পেতেও ব্যর্থ মনোরথ হতে হত। আসলে মেসোজোয়িক যুগে পাখী ও স্তন্যপায়ী উভয়েই ছিল গৌণ অস্থিতিশীল প্রাণী।

সরীসৃপ যুগ স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ২ কোটি বছর। অর্ধমানবিক বুদ্ধিসম্পন্ন কোনো প্রাণীর যদি সৌভাগ্য হত সেই যুগ প্রত্যক্ষ করার, তাহলে তারা অবাক হয়ে দেখত কী বিশাল অচিন্ত্যনীয় কালব্যাপী কত নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে অজস্র ডাইনোসর আর আকাশে পাখা ঝাপটে মাতিয়ে বেড়াচ্ছে ডানাযুক্ত গিরগিটি। তার রহস্যময় বৈশ্বিক ছন্দ আর ক্রমসঞ্চিত শক্তি এই গর্বিত অনন্ত জীবনপ্রত্যাশী প্রাণীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। প্রাণ ধারণের সৌভাগ্য ক্ষয়ে যেতে থাকে। লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনে নিসর্গ তাদের প্রাণ ধারণের বিপরীত অবস্থানে চলে যায়। সমুদ্র আর পর্বতের অবস্থানের হেরফের হতে থাকে। মেসোজোয়িক যুগের প্রাণের রমরমার অবক্ষয়ের চিহ্ন পাথরের গায়ে আঁকা হয়ে গেছে। যুগের বিবর্তনে আবহের পরিবর্তনে অদ্ভূত বিলুপ্তির মুখে পুরনো প্রজাতিগুলি অভিযোজনের মাধ্যমে টিকে থাকার দারুণ দক্ষতা প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ মেসোজোয়িক অধ্যায়ের শেষপর্বে যেমন এমোনাইটরা (প্রাগৈতিহাসিক শামুক বিশেষ) বহু বিচিত্র আকার ধারণ করেছিল। সুস্থিত পরিস্থিতিতে নতুনত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা থাকে না, তৎকাল পরিস্থিতির সর্বোত্তম আকৃতিতেই তারা স্থিত থাকতে চায়। পরিবেশের অবস্থান্তরে সাধারণরাই বেশি বিপর্যস্ত হয়। আর নবত্বের আভাসযুক্তরাই কালান্তরে টিকে থাকার উপযুক্ত।

পাথরের গায়ে প্রাণের যে স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে মাঝখানে তার কয়েক লক্ষ বছরের ফারাক। জীবনের ইতিহাসে এখানে এক পর্দা টানা রয়েছে। পর্দা যখন উঠল, তত দিনে সরীসৃপ যুগের অবসান হয়ে গেছে: ডাইসোরাস, প্লেসিওসোরাস, ইকথিওসোরাস, টেরোড্যাকটিল আর অসংখ্য প্রজাতির শামুক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অগণিত বিচিত্র প্রাণীকুল কোনো বংশধর না রেখেই পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেল। শৈত্য ওদের বিনাশ করেছে। তাদের শেষ বংশধররা ধীরে ধীরে কমে এসেছে, আর বেঁচে থাকার কৌশল তারা খুঁজে পায়নি। এ সময় পৃথিবী এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল, যা তাদের টিকে থাকার সামর্থ্যের বাইরে। ধীর তবে চূড়ান্ত পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে গেল মেসোজোয়িক জীবনচক্র। দেখা দিলো অধিকতর সহনশীল এক উদ্ভিদ ও প্রাণীচক্রের।

প্রাণের যে নতুন পর্যায় শুরু হলো প্রথম দিকে তা ছিল নিতান্তই ক্ষীণ ও ভঙ্গুর। পত্রহীন নরম কাণ্ডবিশিষ্ট মোচাকৃতি বৃক্ষের পরিবর্তে জন্ম নিলো পত্রপুষ্প শাখা

www.nagorikpathagar.org

বিশিষ্ট বৃক্ষরাজি এবং তার সাথে পত্র পুষ্পবহুল গুল্ম। সরীসৃপের জায়গা দখল করল অসংখ্য প্রজাতির পাখি ও স্তন্যপায়ী।

৮. স্তন্যপায়ী যুগ

পৃথিবীতে প্রাণের যে নতুন যুগের সূচনা হলো সেটা ছিল মেসোজোয়িক যুগ আর সেটা ছিল ক্রিয়াশীল আগ্নেয়গিরির উথালপাতাল যুগ। এ সময়টাতেই জেগে উঠল বিশাল হিমালয়, রকি, আন্দিজ পর্বতমালা আর তৈরি হলো মহাসাগর আর মহাদেশসমূহের রূপরেখা। আজকের পৃথিবীর যে মানচিত্র তার অস্পষ্ট রূপ তখনই ধরা দিলো। হিসাব করে দেখা গেছে মেসোজোয়িক যুগের শুরু থেকে আজ অবধি ৪ থেকে ৮ কোটি বছর পার হয়ে গেছে।

মেসোজোয়িক যুগের শুরুতে পৃথিবীর আবহ ছিল রুক্ষ কঠোর। আবহাওয়া ধীরে ধীরে উষ্ণ হতে হতে আবার এক সময় তাপমাত্রা কমতে থাকে, এমনি করে পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে কয়েকটা তুষার যুগের অবসানে পৃথিবী বর্তমানে সর্বশেষ তুষার যুগ কাটিয়ে উঠছে।

তবে জলবায়ু পরিবর্তনের পর্যাপ্ত কারণ এখনও আমাদের জানা নেই, আর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ভাগ্যে কী লেখা আছে তাও অজানা। হয়তো ক্রমবর্ধমান রৌদ্রতাপ অথবা আর একটা তুষার যুগের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা; হয়তো আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ আতিশয্যে পর্বতের আকার ও উচ্চতা বেড়ে যাবে, হয়তো সব কিছু ভেঙে পড়বে। বিজ্ঞান এখনও নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।

এই যুগের শুরুতে মাটির বুকে ঘাস গজাতে শুরু করল; প্রথমবারের মতো ধরা পৃষ্ঠে তৃণভূমি দৃষ্টিগোচর হলো। এই অনুকূল পরিবেশ অস্পষ্ট স্তন্যপায়ীদের থেকে বিকাশ লাভ করল বহুবিধ তৃণভোজী চতুষ্পদ ও তাদের আহার্যরূপে গ্রহণকারী মাংসাশী প্রাণীকুল। আদিতে এসব স্তন্যপায়ীদের সাথে তৎপূর্ববর্তী তৃণভোজী ও মাংসাশী সরীসৃপদের পার্থক্য ছিল অতি সামান্য। একজন অসতর্ক পর্যবেক্ষক যদি এসব স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপদের পাশাপাশি দেখে তাহলে তাদের পক্ষে এদের পার্থক্য নিরূপণ কঠিন হবে। তবে এ সাদৃশ্য দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। বৈশ্বিক বৈচিত্র্য অসীম ও নিরন্তর। এটা এগিয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে। ইতিহাসের কখনও পূর্ণাঙ্গ পুনরাবৃত্তি হয় না। মেসোজোয়িক ও সেনোজোয়িক যুগের প্রাণীদের বৈসাদৃশ্য সাদৃশ্যের চেয়ে অনেক বেশি প্রকট।

এই দুই যুগের প্রাণীদের সবচেয়ে মৌলিক পার্থক্য হলো এর মানসিক গঠনে। এর মূল উৎস হলো স্তন্যপায়ীদের তথা কিয়ৎপরিমাণে পাখিদের মধ্যেও মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সরীসৃপ যুগে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। দু-একটা

www.nagorikpathagar.org

ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সরীসৃপ তাদের ডিম প্রসব করে ছেড়ে চলে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার জন্য। বাচ্চা সরীসৃপের তাদের মা বাবা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না; তাদের মানসিক জীবন তাদের নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। এরা তাদের নিকটজনদের মানিয়ে নেয় ঠিকই, তবে কখনও তাদের অনুকরণ করে না, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, সমন্বিত কোনো কাজ করতে তারা অক্ষম। এদের জীবন বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিক জীবন। স্তন্যদান ও অপত্যস্নেহ স্তন্যপায়ী ও পক্ষীকুলের মধ্যে অনুকরণ, যোগাযোগ ও বিপদসংকেত আওয়াজ; নানারকম সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে শিক্ষালাভের ধারা গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে সূচনা হলো শিক্ষা আদান-প্রদানের জীবন ধারা। মস্তিষ্কের আকারের দিক থেকে মেসোজোয়িক যুগের স্তন্যপায়ীরা করিৎকর্মী মাংসাশী ডাইনোসরদের তুলনায় খুব বেশি এগিয়ে ছিল তা নয়, তবে মেসোজোয়িক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল অব্ধি বিভিন্ন রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রত্যেক স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে নিরন্তর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণ্ডারজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব বেশ আগের দিকে। এ যুগের একেবারে প্রথম দিকের একটা প্রাণীর নাম টাইটানোথেরিয়াম। স্বভাবের দিক দিয়ে এটা আধুনিক গণ্ডারের খুব কাছাকাছি। তবে এর মস্তিষ্কের ক্ষমতা তার উত্তরসূরির এক দশমাংশও নয়।

প্রথম দিককার স্তন্যপায়ীরা স্তন্যদান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে যেত; ধীরে ধীরে তারা একত্রে থাকার ও পারস্পরিক সাহচর্যের গুরুত্ব বুঝতে শিখল; শিগগিরই দেখা গেল কোনো কোনো স্তন্যপায়ী প্রজাতি দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করেছে। তারা পরস্পরকে অবলোকন, অনুকরণ ও একে অন্যের সাবধানতাসূচক আওয়াজ অনুসরণ করতে শিখছে। পূর্ববর্তী যুগের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এটা দেখা যায়নি। কোনো কোনো সরীসৃপ ও মাছদের ঝাঁক বাঁধা অবস্থায় দেখা যায় ঠিকই। একত্রে ডিম ফুটে বের হওয়া বা বাহ্যিক পর্যাবরণের কারণে তারা একত্রে থাকে, তবে তাদের মধ্যে কোনো আন্তরিক আকর্ষণ থাকে না; অপরপক্ষে স্তন্যপায়ীদের যুথবদ্ধ জীবন অন্তরের তাড়নাসঞ্জাত। তারা একে অন্যের মতো বলেই এক সাথে থাকে তা নয়, বরং তারা একে অন্যকে পছন্দ করে।

সরীসৃপ মন আর আমাদের মানব মনের পার্থক্য হলো আমাদের সহানুভূতি শেষ হয়ে যায় না। সরীসৃপদের দ্রুত, সরল তাড়না, সহজাত বৃত্তি, ক্ষুধা, ভয় ও বিদ্বেষ আমরা অনুধাবন করতে পারি না। তাদের সরলতা আমরা বুঝতে পারি না। কারণ তাদের প্রেরণা জটিল, আমাদের আছে ভারসাম্য ও ফলশ্রুতি, শুধু তাড়না নয়। তবে স্তন্যপায়ী ও পাখিদের নিচু স্তরের হলেও আমাদের মতো আত্মসংযম, অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা, সামাজিক আবেদন, আত্মনিয়ন্ত্রণ আছে। তাই তাদের প্রায় সবার সাথেই আমরা সমঝোতা স্থাপন করতে পারি। ব্যথা পেলে তারা চিৎকার করে, দেহভঙ্গি

www.nagorikpathagar.org

করে যা আমাদের মনে সহানুভূতি জাগায়। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে তারা পোষ মানে।

সেনোজোয়িক যুগের এই অসাধারণ মস্তিষ্ক বিকাশের ফলেই সৃষ্টির মধ্যে সহমর্মিতা ও পরস্পর নির্ভরতা তৈরি হয়। এর মধ্যেই আমরা মানব সমাজের ছায়াপাত দেখতে পাই, যার কথাই আমরা এখন বলব।

সেনোজোয়িক যুগের বিকাশের সাথে সাথে আজকের পৃথিবীতে যে ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বর্তমান, তেমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশাল বিদঘুটে উইন্টাথেরেস ও টাইটানোথেরেসের মতো প্রাণীরা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এসব বিদঘুটে পূর্বসূরিদের বংশধর রূপেই ধীরে ধীরে রূপ নিলো জিরাফ, উট, ঘোড়া, হাতি, হরিণ, কুকুর, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি যারা বর্তমান পৃথিবীর বাসিন্দা। ভূ-তাত্ত্বিক চিহ্ন থেকে ঘোড়ার ক্রমবিকাশ ধারা আমাদের হাতে এসেছে। সেনোজোয়িক যুগের তাপিরসদৃশ প্রাণীর রূপান্তর শৃঙ্খলে বর্তমান ঘোড়ার আবির্ভাব। আর একটি প্রাণী যার বিকাশ শৃঙ্খল পূর্ণতা দেওয়া গেছে তা হলো লামা আর উট।

৯. বানর, এইপ (উল্লুক) ও অর্ধ-মানব

প্রকৃতিবিদরা স্তন্যপায়ী শ্রেণীকে বেশ কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করেছেন। সর্বোচ্চ শিখরে তারা রেখেছেন প্রাইমেটদের, যার মধ্যে রয়েছে লেমুর, বানর, উল্লুক আর মানুষ। তাদের শ্রেণিবিন্যাসের মূল ভিত্তি শারীরতাত্ত্বিক সদৃশ; মানসিক গুণাগুণ ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না।

ভূ-তাত্ত্বিক পৃথিবীতে প্রাইমেটদের ইতিহাস পাঠ করা খুব কঠিন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা লেমুর বা বানরের মতো জঙ্গলে অথবা বেবুনের মতো নগ্ন পাহাড়ে বাস করে। তারা যেহেতু খুব কমই কাদার নিচে চাপা পড়ত, আর তাদের প্রাচুর্যও এমন বেশি নয়, সেহেতু ঘোড়া ও উটের মতো তাদের ফসিল তত সুলভ নয়। তবে আমরা জানতে পেরেছি, আদি বানর বা লেমুরের পূর্বপুরুষের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল প্রায় ৪ কোটি বছর আগে সেনোজোয়িক যুগের একেবারে প্রথম দিকে তবে তাদের মস্তিষ্ক উত্তরপুরুষদের মতো তত পরিণত ছিল না।

মধ্য সেনোজোয়িক যুগের বৈশ্বিক গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে আসছে। প্রাণের ইতিহাসে আরো দুটি মহান গ্রীষ্মকাল এসেছিল, কয়লা জলাভূমি যুগ আর বিশাল সরীসৃপ গ্রীষ্ম। আরো একবার পৃথিবী এগিয়ে চলল বরফ যুগের দিকে। পৃথিবী হিমশীতল হলো, মৃদুতর হলো, আবারো হিমশীতল হলো। উষ্ণ অতীতে উদ্ভিজ্জ আবৃত জলাভূমিতে গড়াগড়ি দিত জলহস্তি, আর বিশালকায় তলোয়ারের মতো

www.nagorikpathagar.org

দাঁতযুক্ত স্যাবারটুথ টাইগার শিকার ধরে বেড়াত সেই জায়গায় আজ যেখানে ফ্লিটস্ট্রিটে সাংবাদিক ছোটাছুটি করছে। আবার ফিরে এলো নিষ্পাদপ হিমশীতল যুগ। উদ্ভিদ-প্রাণী সব কিছু লুপ্ত হয়ে গেল। ঠাণ্ডা আবহের সাথে খাপখাইয়ে লোমশ গণ্ডার, হাতির জ্ঞাতিভাই ম্যামথ, মেরুষণ্ড আর বলগা হরিণ। এই দৃশ্যপট অতিক্রম করে এগিয়ে চলল। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বরফযুগের হিমেল উত্তর-মেরুর বরফটুপি দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে। ইংল্যান্ডে এটা এগিয়ে এলো প্রায় টেমস্ নদীর কাছাকাছি, আমেরিকায় ওহাইও পর্যন্ত। কয়েক হাজার বছরের উষ্ণতার আমেজ কাটিয়ে পৃথিবী আবার শৈত্যের কবলে পড়ছে।

ভূ-তত্ত্ববিদরা এর নাম দিয়েছিল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বরফযুগ আর তার মধ্যবর্তী সময়ের নাম আন্তঃবরফযুগীয় কাল (interglacial period)। আমরা আজ যে পৃথিবীতে বাস করছি তা এখনও সেই ভয়াবহ শৈত্যের আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে। প্রথম বরফ যুগ এসেছিল ১০ লক্ষ বছর আগে; আর চতুর্থ বরফ যুগ তার সবচেয়ে খারাপ সময় কাটায় প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে। উত্তর যখন বরফের নিচে, আফ্রিকায় তখন প্রবল বৃষ্টিপাত। আর ঠিক সেই সময়েই আফ্রিকায় মানবসদৃশ জীবের আবির্ভাব।

সেনোজোয়িক যুগের মধ্যবর্তী সময়ে বানরসদৃশ গুণাবলি নিয়ে নানা শ্রেণীর লেজহীন বানরের আবির্ভাব ঘটে, যাদের চোয়াল ও পায়ের হাড় মানুষের মতোই। তবে কেবলমাত্র তথাকথিত প্লিস্টোসিন যুগেই অর্থাৎ ইউরোপ যখন বরফের নিচে আর আফ্রিকায় চলছে প্রবল বৃষ্টি, তখনই প্রায় মানবাকার জীবের আগমন। প্রথম যে নিশানা পাওয়া যায় তা হাড় নয়, পাথরের হাতিয়ার। অবশ্য তুষারপাত বা পাহাড় ধসের কারণে পাথরে চিড় ধরতে পারে বা ফালি ফালি হয়ে নানা আকার ধারণ করতে পারে। কাজেই যাকে পাথরের হাতিয়ার তা কি সত্যিই কারো সুচিন্তিত শৈলীর ফসল, নাকি প্রাকৃতিক কারণে দৈবাৎ সৃষ্ট। তবে প্লিস্টোসিন যুগের স্বাক্ষর টাংগানাইকার ওল্ডোয়ান গিরিখাতে প্রাপ্ত প্রথম পাথরের উপচার যে সুচিন্তিত শৈলীর ফসল তাতে সন্দেহ নেই। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া খাঁজকাটা প্রান্তযুক্ত ফালি করা পাথরের উপচারের বৈশিষ্ট্য ছিল অভিন্ন।

আফ্রিকা থেকে একই যুগের আদি মানবের হাড়ও পাওয়া গেছে। ট্রান্সভাল ও টাংগানাইকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত, খুলি, দাঁত ও হাড়ের বিপুল সঞ্চয় মানুষের হাতে এসেছে। এসব অবশেষ আলাদাভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রজাতির, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন, যেমন অস্ট্রালোপিথেকাস, প্যারানথ্রোপাস, জিঞ্জানথ্রোপাস। আর অন্যরা তাদের অস্ট্রালোপিথেকাসের বিভিন্ন রূপান্তর বলে মনে করেন। অস্ট্রালোপিথেরিকাসের অর্থ দক্ষিণের বানর।

দৈহিক গড়নে এসব প্রাণী বানরও ছিল না আবার মানুষও ছিল না। উচ্চতায় চার ফুট, বানরের মতো মাথা, বানরের মস্তিষ্ক, নিচু কপাল, পুরু ভ্রু, মোটা চোয়াল– তবে পা ছিল অনেকটাই মানুষের পায়ের মতো। হাড়ের গড়ন থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,

www.nagorikpathagar.org

তারা দুই পায়ে চলাফেরা করত। পুরোপুরি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত, যা অন্য বানর প্রজাতির কেউই পারত না। তাদের কারো কারো ছিল সুগঠিত বড় বড় পেষণদন্ত। অতি সম্প্রতি ১৯৬৪ সালে হ্যাবিলিস বা এবল নামে এক প্রজাতির সন্ধান মিলেছে, যাদের সোজা হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা ছিল। এদের দাঁত আর মগজের আকৃতিতে (যা অবশ্য আধুনিক গরিলার চেয়ে বেশি বড় ছিল না) অনেকটাই মানুষের কাছাকাছি ছিল। এসব অর্ধমানব সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে তাদের হাতের সদ্ব্যবহার করতে পারত। যদিও তাদের হাত আমাদের চেয়ে কম নমনীয় ছিল, তাদের মস্তিষ্ক অনেকটাই ক্ষুদ্রতর ছিল, সন্দেহ নেই ওল্ডোয়ান সংস্কৃতির মতো তারা পাথরের উপচার বানানোর কাজে তাদের হাত ব্যবহার করত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মিস্টার ও মিসেস লেকি ও তাদের সহচররা টাংগানাইকায় তাদের আদি বাসস্থানে এসব আদি মানবের হাড়গোড়ের মাঝে তাদের তৈরি পাথরের উপচারই শুধু নয়, এসব তৈরির সময় ঝরে পড়া পাথরের কুচিও আবিষ্কার করেন, আর সেই সাথে খুঁজে পান অস্ত্রের আঘাতে নিহত প্রাণীদের খণ্ড-বিখণ্ড হাড়গোড়।

বানর ও উল্লুকরাও হাতিয়ার ব্যবহার করে। লাঠি ও পাথর দিয়ে আঘাত করতে পারে, বেবুনরা পাথর উল্টে কীটপতঙ্গ বের করার জন্য কাঠি ব্যবহার করে; তবে এখানে আমরা এমন এক প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলাম যারা সুচিন্তিতভাবে পাথরকে হাতিয়ারে রূপ দিতে পারত। এ বিষয়টা আর সেই সাথে সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা তাদেরকে আধুনিক মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

পরবর্তী কাহিনী আমাদের আরো একটু লম্বা, আর একটু বেশি মস্তিষ্কের প্রাণীদের নিয়ে, যাদেরকে বলা হয়েছে "পিথেক্যানথ্রোপাস" অর্থাৎ নর-বানর। তাদের হাড়ের সন্ধান মিলেছে জাভা আর চীন থেকে। আর তারা যে সময়ে বেঁচে ছিল তখন ইউরোপে চলছে দ্বিতীয় বরফ যুগ। যদিও পিথেকানথ্রোপাসরা ছিল মুখমণ্ডল ও মস্তিষ্কের দিক দিয়ে অর্ধমানব, তবুও চকমকি ও হাড় দিয়ে তারা হাতিয়ার বানাত এবং শিকার করা হরিণ তারা আগুনে সেঁকে খেত, যার প্রমাণ মিলেছে এসব জন্তুর অঙ্গার হয়ে যাওয়া হাড় দেখে। তারা আমাদের মতোই সোজা হয়ে দাঁড়াতে ও দৌড়াতে পারত। কারণ তাদের পায়ের হাড় ও কটিবেষ্টনী আধুনিক মানুষের সাথে অভিন্ন।

আরো অনেক অর্ধমানবের চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে গল্পের মধ্যে তাদের স্থান সন্দেহাতীত নয়। এভাবেই হাইডেলবার্গের বালিয়ারীর গর্তে একটিমাত্র অর্ধমানবের কিম্ভূত চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে, যাতে থুতনি প্রায় ছিলই না। আর খুলিটা ছিল এত ভারী আর সংকীর্ণ যে তার মধ্যে অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণের জন্য জিহ্বা সঞ্চালনের জায়গাই ছিল না। নৃতাত্ত্বিকরা এই বিশালবপুলোমশ নরদানবটির নাম দিয়েছে হাইডেলবার্গ মানব। এদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও ছিল বৃহৎ আর তাদের ব্যবহৃত ভারী পাথরের হাতিয়ার থেকে তাদের দেহাবয়ব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

এই চোয়ালের হাড়টি আমার মতে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক বস্তু। এটা যেন ত্রুটিপূর্ণ আয়নার মধ্য দিয়ে দূরের কোনো বস্তু দেখা, ঝাপসা,

www.nagorikpathagar.org

বিভ্রান্তকারী এক বস্তু যে স্যাবারটুথ বাঘ আর লোমশ গণ্ডারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তড়বড় করে গাছে উঠছে। তারপর ভালো করে পরখ করার আগেই ওই দৈত্য মিশে যাচ্ছে। শুধু মাটির বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে পাথর কেটে বানানো তাদের হাতিয়ার।

১০. নিয়ান্ডার্থাল ও রোডেশীয় মানব

প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার বছর আগে, চতুর্থ বরফ যুগ সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার আগেই পৃথিবীতে এক প্রজাতির প্রাণী বাস করত, মাত্র কয়েক বছর আগেও তাদের স্মৃতিচিহ্নগুলিকে প্রায় মানবীয় বলে ধারণা করা হত। তাদের খুলি ও হাড় আমরা পেয়েছি, আর পেয়েছি তাদের ব্যবহৃত বড় বড় হাতিয়ারের বিশাল সঞ্চয়। এরা আগুন জ্বালাতে পারত। ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে এরা গুহায় আশ্রয় নিত। সম্ভবত তারা অমার্জিত চামড়ার পোশাক পরিধান করত। মানুষের মতোই এদের ডান হাত সক্রিয় ছিল।

তবুও আজকের পুরাতত্ত্ববিদরা বলেন, এরাও সত্যিকারের মানুষ ছিল না। তাদের একই গণের বিভিন্ন প্রজাতি ছিল। তাদের ছিল সামনের দিকে ঠেলে বের হওয়া ভারী চোয়াল, নিচু কপাল, চোখের ওপরে উঁচু ভ্রু অস্থি তাদের ঘাড় এত দৃঢ় সন্নিবিষ্ট ছিল যে তারা ঘাড় ঘোরাতে বা আকাশের দিকে তাকাতে পারত না, তারা চলত মাথা নিচু করে জবুথবুভাবে। তাদের থুতনিবিহীন চোয়াল, হাইডেলবার্গীয়দের সদৃশ আর আধুনিক মানুষের সাথে সবচেয়ে বড় পার্থক্য তাদের দাঁতের গড়ন। তাদের মাড়ির দাঁতের গড়নেও জটিলতা ছিল। তাদের দাঁতে আধুনিক মানুষের শ্বদন্তের তীক্ষ্ণতা ছিল না। তাদের খুলির আকার মানুষের খুলির সমানই ছিল বটে, তবে তাদের মাথার পিছন দিককার মগজ সামনের মগজের চেয়ে বড়। ঠিক আধুনিক মানুষের বিপরীত। তাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতা ভিন্নভাবে সজ্জিত ছিল। মানসিক ও শারীরিকভাবে তারা ছিল ভিন্ন রেখায়।

নিয়ান্ডারর্থাল এবং আরো কিছু স্থানে মানবাকার এসব প্রজাতির মাথার খুলি ও হাড় পাওয়া গেছে বলে এদের নামকরণ হয়েছে নিয়ান্ডার্থাল মানব হিসেবে। ইউরোপে নিশ্চয়ই তারা কয়েক শ' বা কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে ছিল।

সেই সময়কার জলবায়ু ও ভূসংস্থান বর্তমানের চেয়ে অনেকটাই পৃথক ছিল। উদাহরণস্বরূপ টেমস্ নদী এমনকি মধ্য জার্মানি ও রাশিয়া তখন বরফের নিচে ঢাকা ছিল। ব্রিটেন থেকে ফ্রান্সকে পৃথককারী কোনো চ্যানেলের অস্তিত্ব তখন ছিল না। ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগর এলাকা তখন ছিল বিশাল এক উপত্যকা, যেখানকার নিচু জায়গাগুলিতে ছিল বড় বড় হ্রদ। আর কৃষ্ণসাগর থেকে শুরু করে রাশিয়া ও

www.nagorikpathagar.org

মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিশাল ভূবেষ্টিত সাগর ছিল। স্পেন তথা ইউরোপের বেশির ভাগ এলাকা বরফের নিচে না থাকলেও সেখানে তীব্র হিমেল আবহাওয়া বিরাজমান ছিল, আর আফ্রিকা পৌঁছানোর আগে কেউ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কল্পনাও করতে পারত না। দক্ষিণ ইউরোপের হিমেল স্তেপভূমির ক্ষীণ উদ্ভিজ্জ মাড়িয়ে চষে বেড়াত লোমে ঢাকা বিশাল ম্যামথ, গণ্ডার, বিরাটবপু ষাঁড় আর বলগা হরিণ। বসন্তের সাথে সাথে তারা উত্তরে হাঁটা দিত আর শরতে চলত দক্ষিণ দিকে। এমনই দৃশ্যপটে ঘুরে বেড়াত নিয়ান্ডার্থাল মানুষেরা। যে সামান্য জীবিকার উপকরণ, যেমন শিকার অথবা ফলমূল তার ওপরে নির্ভর করে। সম্ভবত তারা ছিল শাকাহারী, শাখা পহলব ও ফলমূল চিবিয়ে খেত। তাদের সমতল মসৃণ দাঁত দেখে শাকাহারী বলেই প্রতীয়মান হয়। তাদের গুহায় বড় বড় প্রাণীর সরু লম্বা হাড়ও দেখা গেছে, যেগুলি চিবিয়ে মজ্জা বের করে খাওয়া হয়েছে। তবে তাদের অস্ত্রশস্ত্র বড় বড় জন্তুর মোকাবেলা করার উপযোগী ছিল না। মনে করা হয় যে নদী পার হওয়ার সময় তারা বর্শা নিয়ে জন্তুদের আক্রমণ করত, আর মাটিতে চোরা গর্ত খুঁড়ে রাখত; তারা পশুর বড় দলকে অনুসরণ করত, নিজেদের মধ্যে লড়াইতে আহত কোনো জন্তুকে শিকার করার জন্য। আর স্যাবারটুথ বাঘেদের পেছনে শেয়ালের মতো ঘুরত তাদের ফেলে যাওয়া মৃত পশুর আহারের প্রত্যাশায়। হয়তো দীর্ঘ নিরামিষ যুগের শেষে বরফ যুগের প্রারম্ভে উদ্ভিজ্জের পরিমাণ কমে এলে বাধ্য হয়েই শিকারের পেছনে ছুটত।

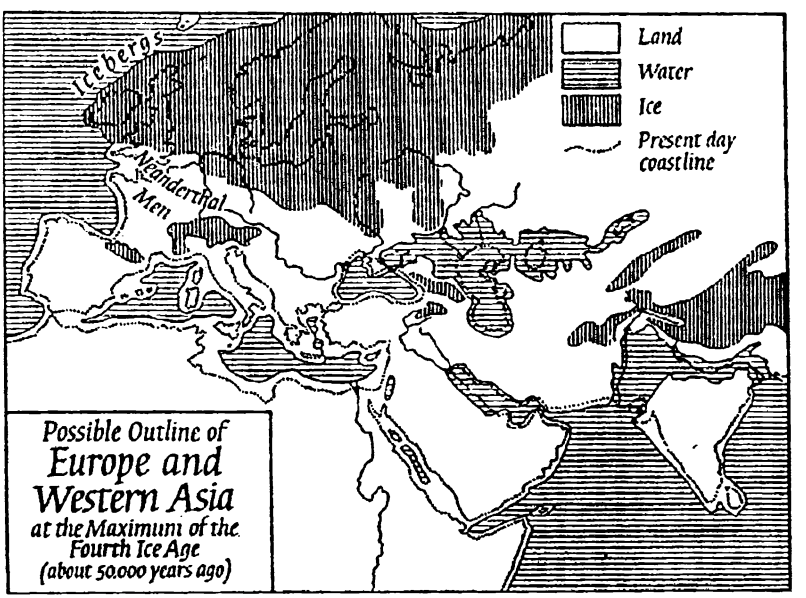

১. চতুর্থ তুষার যুগে (প্রায় ৫০,০০০ বছর পূর্বে) ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার সম্ভাব্য পরিলেখ

www.nagorikpathagar.org

যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে যে নিয়ান্ডার্থাল যুগের শেষ দিকে এরা তাদের মৃতদেহ আচার অনুষ্ঠান করে শ্রদ্ধার সাথে সমাহিত করত। নিয়ান্ডার্থাল যুগের কিছু কংকাল পাওয়া গেছে সযত্নে খোদাই করা গর্তের মধ্যে, যেখানে কংকালের সাথে, কিছু খাবার ও পাথরের অস্ত্রেরও দেখা মিলেছে। সচরাচর তাদের মৃতদেহ রাখা হত পার্শ্বশায়িত অবস্থায়, মাথার নিচে বালিশের মতো করে বাহু রেখে। মাঝে মধ্যে কবরের পাশে ষাঁড়ের পোড়া হাড় থেকে প্রতীয়মান হয় শেষকৃত্য অন্তে তারা ভোজের ব্যবস্থা করত।

হাজার হাজার বছর ধরে এই নিয়ান্ডার্থাল ইউরোপ এলাকার সর্বোন্নত জাতি ছিল। তারপর এখন থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে যখন আবহাওয়া ধীরে ধীরে উষ্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে এলো অধিক বুদ্ধিমান, বেশি জানাশোনা, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষার ব্যবহারকারী আর এক প্রজাতি, যারা নিয়ান্ডার্থালদের এলাকায় চড়াও হলো। তারা এসে নিয়ান্ডার্থালদের গুহা ও লুকিয়ে থাকার জায়গা থেকে তাদের বিতাড়ন করল; হয়তো তারা তাদের বিদঘুটে পূর্বজদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মেরে শেষ করে দিয়েছিল; অবশ্য প্যালেস্টাইনের কারমেল পাহাড়ের শখুল গুহার দৃশ্যপটে দুই প্রজাতির কংকাল পাশাপাশি আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় তাদের মধ্যে সহাবস্থান ও আন্তঃপ্রজনন হয়েছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব থেকে আগত এই প্রজাতির যদিও তাদের সঠিক উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে নিশ্চিত জানা যায়নি– তারা নিয়ান্ডার্থালদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। তাদের সাথে ছিল আমাদের রক্তের সম্পর্ক, সত্যিকারের মানুষ। তাদের মগজ-প্রকোষ্ঠ, তাদের চিবুক, ঘাড়, দাঁত আর অঙ্গসংস্থান অবিকল আমাদের মতোই ছিল।

পাথরের বুকে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাওয়া প্রথম প্রজাতি, শুরু হলো মানুষের ইতিহাস। পৃথিবীর অবস্থাও আজকের মতো হয়ে উঠছে যদিও আবহাওয়া বেশ কঠোর। ইউরোপে বরফ যুগের হিমবাহ সরে যাচ্ছিল। ফ্রান্স ও স্পেনের বলগা হরিণরা ক্রমবর্ধমান স্তেপভূমির ঘাসের রাজ্যে ঘোড়ার পালকে ছেড়ে দিলো আর ম্যামথরা উত্তরে যেতে যেতে হারিয়ে গেল।

আমরা জানি না সত্যিকারের মানুষের উৎপত্তিস্থল কোথায়? তবে ১৯২১ সালের গ্রীষ্মে আফ্রিকার ভঙ্গিল পর্বত এলাকায় অনন্য কৌতূহলোদ্দীপক এক মাথার খুলি আর তার সাথে কয়েক টুকরা হাড়ের অবশেষ পাওয়া গিয়েছিল; মনে হয় এরা নিয়ান্ডার্থাল আর বর্তমান মানুষের মাঝামাঝি তৃতীয় পর্যায়ের প্রজাতি। মস্তিষ্ক প্রকোষ্ঠ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মগজের সামনের অংশ পেছনের চেয়ে অনেক বড় ছিল, আর মাথার খুলি আধুনিক মানুষের মতো সোজা মেরুদণ্ডের ওপর সংস্থাপিত। দাঁত ও হাড় পুরোপুরি মানবিক। তবে সুউচ্চ উত্তল ভ্রু-রেখা ও খুলির মাঝ বরাবর উত্তল রেখার কারণে তাদের মুখমণ্ডল বানরসদৃশই ছিল। নিয়ান্ডার্থালদের মতো বানর মুখাকৃতি বাদ দিলে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা

www.nagorikpathagar.org

সত্যিকার মানুষই ছিল। নিয়ান্ডার্থালদের তুলনায় রোডেশীয় মানবরা আধুনিক মানুষের বেশি কাছাকাছি ছিল।

বরফ যুগের শুরু এবং আধুনিক মানুষের পদার্পণের মাঝামাঝি বিশাল কাল পর্যায়ে যত অধস্তন মানব প্রজাতি পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে, রোডেশীয় মানবরা তাদের সর্বশেষ যোগসূত্র আর তাদের উচ্ছেদ করে তাদেরই উত্তরপুরুষরূপী আধুনিক মানুষ পৃথিবীতে দখল নিয়েছে। রোডেশীয় মানব হয়তো তত বেশি প্রাচীন নয়, তবে এই গ্রন্থ প্রকাশকাল পর্যন্ত তাদের কাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৩ সালে কেপটাউনে অনুরূপ এক মাথার খুলি পাওয়া গেছে। হয়তো এই মানুষটি ইউরোপে সর্বশেষ বরফ যুগের সামান্য পূর্বে বর্তমান ছিল।

১১. প্রথম সত্যিকারের মানুষ

বিজ্ঞানের কাছে পরিচিত আমাদের সমগোত্রীয় মানুষের আদি নিদর্শন পাওয়া গেছে ইউরোপে, বিশেষ করে স্পেন ও ফ্রান্সে। এই দুই দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে এখন থেকে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগের মানুষের হাড়, হাতিয়ার, হাড়ের ওপর আঁচড়। হাড় ও গুহার মধ্যে পাথরের বুকে আঁকিবুকি।

আমাদের বর্তমান সংগ্রহ হয়তো সম্ভাব্য আবিষ্কারের ন্যূনতম নমুনা। এ যাবৎ পুরাতত্ত্ববিদদের অগম্য স্থানসমূহে সন্ধানে হয়তো আরো বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এখন অবধি আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল এলাকা প্রশিক্ষিত পর্যবেক্ষকদের অনুসন্ধানের বাইরেই রয়ে গেছে। তাই নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে প্রকৃত মানব প্রজাতির বিচরণক্ষেত্র দক্ষিণ ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল বা ওখানেই তাদের উৎপত্তিস্থল।

এশিয়া-আফ্রিকা বা আজ যেসব এলাকা সাগরের নিচে চলে গেছে, সেখানে হয়তো আরো বেশি পুরনো কালের প্রকৃত মানুষের অবশেষ লুকিয়ে আছে। এ যাবৎ যা আবিষ্কার হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পুরনো। আমি শুধু এশিয়া আর আফ্রিকার কথা বললাম, আমেরিকার কথা বলতে পারলাম না, কারণ অদ্যাবধি একটা মাত্র দাঁত ছাড়া এমন কোনো নিশানা পাওয়া যায়নি, যাকে বলা যায় উন্নতর প্রাইমেট তথা, অর্ধমানব, এপ, নিয়ান্ডার্থাল বা সত্যিকারের মানব। প্রাণের বিকাশকে বলা যায় সম্পূর্ণ পুরনো পৃথিবীর (ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা) বিকাশ, আর প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ দিকেই কেবল বর্তমানের বেরিং প্রণালীর তৎকালীন ভূসংযোগ দিয়ে মানব প্রজাতি আমেরিকা মহাদেশে পদার্পণ করেছিল।

ইউরোপে আমরা যাদের প্রকৃত মানব বলে জেনেছি, তারা সুনির্দিষ্ট দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীর কংকালের খুলি আধুনিক মানুষকেও অতিক্রম করে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

এক পুরুষ কংকালের উচ্চতা ছিল ছয় ফুটের বেশি। দেহ বৈশিষ্ট্যে সে ছিল উত্তর আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মতো। যে ক্রোম্যাগন গুহা থেকে এসব কংকাল পাওয়া গেছে, তার নাম অনুসারে এদের বলা হয়েছে ক্রোম্যাগন : দ্বিতীয় গোষ্ঠী, গ্রিম্যাল্ডি গুহায় প্রাপ্ত অবশেষ দৃষ্টে তাদের নিগ্রোইড বলে শনাক্ত করা হয়েছে। যদিও কোনো কোনো পণ্ডিত এর সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেন। এর জীবন সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যান ও হটেন টদের মধ্যে। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো মানব জাতি ইতিহাসের আদিকাল থেকেই দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অসমর্থিত অনুমাননির্ভর সূত্রে বলা হয়, পূর্ব বা উত্তর থেকে আগত তামাটে আর নিরক্ষীয় দক্ষিণের কালচে।

প্রায় ৪০ হাজার বছর আগের এই অসভ্যরা এতটাই মানবিক ছিল যে তারা ফলের শক্ত খোসার মালা পরত। নিজেদের শরীরে উল্কি আঁকত। হাড় ও পাথরের মূর্তি বানাত, গুহার মসৃণ গায়ে অমার্জিত তবে সুস্পষ্ট পশু, পাখির চিত্র আঁকত। তারা অনেক রকমের হাতিয়ার বানাত যা নিয়ান্ডার্থালদের চেয়ে অনেক ছোট ও মসৃণ ছিল। এখন আমাদের জাদুঘরে তাদের অনেক সংগ্রহ যেমন হাতিয়ার, মূর্তি, পাথরে অংকন ইত্যাদি রয়েছে।

এদের সবচেয়ে প্রাচীনরা ছিল শিকারি। তাদের শিকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছোট ছোট লোমশ ঘোড়া। শিকার করার জন্য এরা চারণভূমিতে চলে আসত। তাছাড়া তারা বাইসনদেরও অনুসরণ করত। ম্যামথের সাথেও তাদের পরিচয় ছিল। কারণ তাদের আঁকা এই প্রাণীটির সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া গেছে। একটা ছবিতে ম্যামথকে ফাঁদে ফেলে মারার দৃশ্যও আছে।

তারা বর্শা ও পাথর ছুড়ে শিকার করত। তখনও তারা ধনুকের ব্যবহার শিখেনি, আর জন্তু পোষ মানাতে জানত কি না তা নিয়েও সন্দেহ আছে। তাদের কুকুর ছিল না। দু-একটা খোদাইতে দেখা গেছে ঘোড়ার মুখে চামড়া বা জন্তুর রগের লাগাম। তবে সে সময়কার এত ছোট ঘোড়া মানুষ বহন করতে পারত বলে মনে হয় না। এসব প্রাণীর দুধ খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের ভাবনাটা প্রায় অবাস্তব বলেই মনে হয়।

খুব বিরল ক্ষেত্রে তারা নিজেদের জন্য কুড়েঘর বানিয়েছিল, হয়তো পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবু বানিয়ে থাকতে পারে। যদিও তারা কাদামাটির মূর্তি বানাত; তবে মাটির পাত্র বানাতে পারত না। যেহেতু রান্নার তৈজস ছিল না, তাই তারা রান্নার চেষ্টাও করেনি। তারা চাষাবাদের ধারে কাছেও ছিল না; ঝুড়ি বা কাপড় বুনতে শেখেনি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চামড়া বা লোমের গাত্রাবরণ থাকলেও, তারা মোটামুটি নগ্ন অসভ্যই ছিল। হয়তো এসব আদি মানব শত শত বছর ধরে ইউরোপের উন্মুক্ত তৃণাঞ্চলে শিকার করে বেড়িয়েছে। তারপর আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপের জলবায়ু মৃদু ও আর্দ্র হয়ে এসেছে। বলগা হরিণেরা উত্তর আর পূর্ব দিকে সরে যেতে থাকে, বাইসন আর ঘোড়াও তাদের অনুসরণ করে। স্তেপভূমি জঙ্গলকে জায়গা ছেড়ে দেয় আর ঘোড়া ও বাইসনের জায়গা দখল করে লাল হরিণ। ব্যবহারের পার্থক্যের কারণে হাতিয়ারেরও পরিবর্তন আসে। নদী ও

www.nagorikpathagar.org

হ্রদে মাছ শিকার মানুষের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সেই সাথে হাড়ের সূচগ্র অস্ত্রের প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়। মার্টিলেটের মতে সেকালের হাড়ের সুঁচাগ্র অস্ত্র পরবর্তী সময় এমনকি ঐতিহাসিক কালের তথা রেনেসাঁকালীন যন্ত্রের চেয়েও উন্নত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, রোমান আমলের সূচ এতটা সূক্ষ্ম ছিল না।

প্রায় পনেরো বা বারো হাজার বছর আগে একটি মানব প্রজাতি স্পেনের দিকে এগিয়ে আসে, যারা পাহাড়ের গায়ে উল্লেখযোগ্য অংকন রেখে গেছে। এদেরকে বলা হয়েছে এজিলিয়ান (ম্যাস দ্য এজিল গুহার নামানুসারে)। তাদের হাতে ছিল ধনুক; সম্ভবত তাদের মাথায় পালকের মস্তকাবরণ ছিল; তারা স্পষ্ট ছবি আঁকতে পারত; তবে তারা তাদের অংকনকে একটা প্রতীকী তাৎপর্য দিতে পেরেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষ বোঝাতে তারা একটা মাত্র উল্লম্ব তুলির আঁচড়ে দু-তিনটে আনুভূমিক তুলির আঁচড় দিত। একে বলা যায় লিখনশৈলীর উষালগ্ন। শিকারের চিত্রের সাথে প্রায়ই ট্যালিমার্ক দেখা গেছে। একটা ছবিতে দুটি মানুষ ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়াচ্ছে। এরাই ছিল প্যালিওলিথিক (পুরাতন প্রস্তর) যুগের সর্বশেষ নমুনা, কারণ তারা শুধু পাথর ভেঙেই অস্ত্র বানাতে পারত।

দশ হাজার থেকে বারো হাজার বছর আগে ইউরোপে আর এক জাতির উদ্ভব ঘটল। তারা শুধু পাথর টুকরো করেই ক্ষান্ত হলো না, ঘষে মসৃণ করতে শিখল। আর সভ্যতারও সূত্রপাত হলো।

বেশ মজার ব্যাপার যে একশ বছরেরও কম সময় পূর্বে সুদূর তাসমানিয়ায় এক মানব প্রজাতির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। শারীরিক গঠন ও বুদ্ধিবৃত্তিতে যারা প্রাচীন ইউরোপীয় নৃগোষ্ঠীর চেয়েও নিম্নমানের ছিল। এই তাসমানীয় নৃগোষ্ঠী বহুকাল পূর্বে ভূ-বিপর্যয়ের কারণে মূল মানবগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাদের বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়। বিকাশের বদলে তারা অবক্ষয়ের ধারায় চলে যায়। যে সময় ইউরোপীয়রা তাদের আবিষ্কার করে সে সময় শামুক আর ছোটখাটো শিকারের ওপর জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের বাসস্থান ছিল না, শুধু লুকিয়ে থাকার জায়গা ছিল। তারা আমাদের প্রকৃত মানব প্রজাতির অংশ ছিল তবে তাদের সত্যিকারের মানুষের মতো না ছিল হস্তনৈপুণ্য না ছিল শৈল্পিক বোধ।

১২. আদিম চিন্তাভাবনা

এবার আমরা কিছু মনোজ্ঞ কল্পনাবিলাসে মনোনিবেশ করব; মানব অভ্যুত্থানের প্রথম দিকটাতে আদি মানবরা নিজেদের কতটা মানব ভাবত? বীজ বপন ও ফসল ফলানোর ৪০০ শতাব্দী পূর্বে মানুষ কীভাবে ভাবত আর কী-ই বা ভাবত? এ সময়টা

www.nagorikpathagar.org

লিখনশৈলী আবিষ্কারের বহু পূর্বের কথা, আর আমাদের নির্ভর করতে হবে পুরোপুরি অনুমান ও কল্পনার ওপর।

বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা যেসব উৎসের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন মানসিকতা পুনর্নির্মাণ করেছে, তা বহুমাত্রিক। সাম্প্রতিককালে মনোবিশ্লেষণে। শিশুরা যেভাবে তাদের আত্মকেন্দ্রিক আবেগময় তাড়নাসমূহ নিয়ন্ত্রিত অবদমিত, সংশোধিত ও উপরিপ্রলেপ প্রদান করে এবং সামাজিক জীবনের সাথে যেভাবে খাপখাইয়ে নেয়, প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস বিনির্মাণে তা অনেকটাই সহায়তা করেছে। আর একটা ফলপ্রসূ উৎস হলো এখনও যেসব অসভ্য জাতি টিকে আছে তাদের চালচলন পর্যবেক্ষণ করা, আর একটা উৎসকে বলা যায় মানবিক প্রস্তরিভবন, যার উদাহরণ আধুনিক সভ্য মানুষের মধ্যে বর্তমান কিছু রূপকথা প্রথা ও কুসংস্কাররূপে। আর চূড়ান্তপর্যায়ে ক্রমবর্ধমান হারে আমরা অসংখ্য চিত্র, মূর্তি খোদাই, প্রতীক ইত্যাদি নির্মাণ করে চলেছি আমাদের বর্তমান সময়ে, যা মানুষ আবহমান কাল ধরে আকর্ষক ও সংরক্ষণযোগ্য মনে করে এসেছে।

আজকের শিশুরা যেভাবে চিন্তা করে আদি মানবরা অনেকটা সেভাবেই চিন্তা করত, অর্থাৎ এক প্রস্থ কাল্পনিক চিত্র। সে কল্পনায় চিত্র গড়ে তুলত বা যেসব প্রতিচ্ছবি তার মনের ওপর আপতিত হত, সেগুলি তার মধ্যে যে আবেগের সঞ্চার করত, সে সেভাবেই কাজ করত। সে কারণেই একটি শিশু ও একজন অশিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে যেমনটা আমরা লক্ষ করি। ধারাবাহিক চিন্তা স্পষ্টতই মানুষের বিকাশধারার পরবর্তী অর্জন। গত ৩,০০০ বছরের আগে মানুষের জীবনচর্চায় এর তেমন ভূমিকা ছিল না এমনকি আজকের দিনেও যারা তাদের চিন্তা সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই চলে কল্পনা ও আবেগ দিয়ে।

মানুষের সমাজজীবনের যাত্রা শুরু হয় অল্প কয়েকটি পরিবারের একত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে। ঠিক যেমন আদি স্তন্যপায়ীরা দলবদ্ধ হয়ে চরে বেড়াত আর সংখ্যা বৃদ্ধি করত। তবে এটা ঘটার আগে কিছু মানবিক আত্মপরতা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে পিতার প্রতি ভয় ও মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করা হয়। তাছাড়া উঠতি যুবকদের প্রতি বয়োঃবৃদ্ধদের স্বাভাবিক ঈর্ষা অবদমন। অপরপক্ষে মাতা পরিবারের স্বাভাবিক পরামর্শক ও কম বয়সীদের রক্ষক, মানুষের দুটি তাড়নার অভিঘাতে সৃষ্ট, একদিকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিজে নিজে সঙ্গী বেছে নিয়ে স্বতন্ত্র জীবনের বাসনা, অন্য দিকে গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ভয়। একজন প্রথিতযশা নৃবিজ্ঞানী জে জে অ্যাটকিনসন তাঁর "প্রাইমাল ল" গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে অসভ্যদের "ট্যাবু" (প্রথাগতভাবে নিষিদ্ধ) আদিম সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছে। আর পরবর্তী মনোবিশ্লেষকরা তাঁর ব্যাখ্যাকে সমর্থন দিয়েছেন।

কিছু কল্পনানির্ভর লেখক আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন বয়স্কদের প্রতি ভয় ও সম্মান আর রক্ষাদায়ী বয়স্ক নারীদের প্রতি আবেগময় প্রতিক্রিয়াই আদিম মানবদের

www.nagorikpathagar.org

ধর্ম আর দেব দেবীর জন্ম দিয়েছে। আর এসব ব্যক্তিত্বের প্রতি নির্ভরতা ও ভয় তাদের মৃত্যুর পর স্বপ্নে তাদের আবির্ভাব ঘটে। এটা বিশ্বাস করা সহজ হয়ে উঠে যে তাদের মৃত্যু ঘটে না; বরং অন্য কোনো উচ্চতর স্থানে অধিকতর ক্ষমতায় তাদের অধিষ্ঠান ঘটে।

স্বপ্ন, কল্পনা ও ভীতি আধুনিক বয়স্কদের চেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি স্পষ্ট ও বাস্তব আর আদিম মানবরা অনেকটা শিশুদের মতোই। তারা পশুদেরও নিকটবর্তী ছিল, আর ভাবত তাদের নিজেদের মতো পশুদেরও মতলব ও প্রতিক্রিয়া আছে। তারা ভাবত পশু-সাহায্যদাতা, পশু-শত্রু আর পশু-দেবতা। এ কথা বোঝার জন্য শিশুর মতো কল্পনাপ্রবণ হতে হবে। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের কাছে একটা অদ্ভুত আকার প্রাপ্ত পাথর বা একটা গাছ বা কাঠের গুঁড়ি কীভাবে গুরুত্ববহ, তাৎপর্যপূর্ণ অশুভ সূচক বা বন্ধুসুলভ হয়ে উঠতে পারে, এ ধরনের গল্প বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। এসব গল্পের কোনো কোনোটা পুনর্বার বলার মতো যথেষ্ট সুশ্রাব্য হতে পারে। নারীরা এসব গল্প বাচ্চাদের শোনাত আর এভাবেই তা ঐতিহ্যে পরিণত হত। পুতুল, প্রাণী বা অদ্ভুত কোনো অর্ধমানবসত্তা তাদের হিরো বানিয়ে গল্প ফেঁদে বসে আর আদিম মানবরাও এমনটাই করত, তবে এদের হিরোকে বিশ্বাস করার মতো সব চেয়ে প্রাচীন মানবজাতি ছিল খুব বেশি বাচাল। এ দিক দিয়ে নিয়ান্ডার্থালদের থেকে আলাদা আর উচ্চস্তরের। নিয়ান্ডার্থালরা ছিল মূলত বাকহীন প্রাণী। অবশ্য প্রাচীন মানবদের ভাষা ছিল কিছু নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর তা প্রকাশ করা হত অঙ্গভঙ্গি আর ইশারা দিয়ে।

অবশ্য এমন কোনো আদিম মানবগোষ্ঠী ছিল না, কার্যকারণ ব্যাপারটা যাদের বোধগম্য ছিল না, তবে কার্যকারণ নিয়ে তাদের মধ্যে খুব কমই প্রশ্ন জাগত। কোনো একটি ঘটনাকে তারা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একটা কারণের সাথে যুক্ত করে দেখত। তারা বলত, "তুমি এটা বা ওটা করলে, সেই জন্য এটা বা ওটা ঘটল। তুমি একটা বাচ্চাকে ফল খাওয়ালে সেই জন্য সে মারা গেল। তুমি একজন শত্রুর হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করলে তাই তুমি মহাশক্তিধর হলে।" এখানে আমরা দুই প্রস্থ কার্যকারণ উল্লেখ করলাম, যার একটা সত্য আর অন্যটা মিথ্যা। আদিম মানব মনের এই কার্যকারণ সূত্রকে বলা হয় 'ফেটিশ' (অন্ধবিশ্বাস); অর্থাৎ এই "ফেটিশই" ছিল আদিম মানবের বিজ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞান থেকে এর মূল পার্থক্য, এটা সুশৃঙ্খল ও প্রশ্নসিদ্ধ ছিল না, যার ফলে প্রায়ই ছিল ভ্রান্ত।

কার্যের সাথে কারণ যুক্ত করা অনেক ক্ষেত্রেই তেমন কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণা অভিজ্ঞতার দ্বারা সংশোধিত হত। তবে আদিম মানবের সামনে অসংখ্য ব্যাপার উঠে আসত, যার কারণ নির্ণয়ে তারা মরিয়া হয়ে উঠত আর এমন সব ব্যাখ্যা দাঁড় করাত, যা ছিল ভ্রান্ত; তবে সে ভ্রান্তির দৃশ্যমানতা তাদের কাছে প্রকট হত না। তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিকারের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা আছে কি না অথবা প্রচুর মাছ সহজে ধরা যাচ্ছে কি

www.nagorikpathagar.org

না; আর এই সুফল অর্জনে সে অজস্র তন্ত্রমন্ত্র জাদুটোনা বিশ্বাস করত আর প্রয়োগ করত। তাদের আর একটা বড় উদ্বেগের বিষয় ছিল রোগব্যাধি আর মৃত্যু। তাদের শরীরে সহজেই রোগ সংক্রমণ ঘটত আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিত। প্রায়ই মানুষ দৃশ্যমান কারণ ছাড়াই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ত। এসব ব্যাপার নিশ্চয়ই আদিম মানবের বেপরোয়া আবেগাশ্রয়ী প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করত। প্রায়ই সংক্রমণ ঘাপটি মেরে থাকত আর মানুষের প্রাণ হরণ করত। এতে মানুষ ব্যাধিতে জরাগ্রস্ত আর দুর্বল হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হত; যার কারণ তাদের জানা ছিল না। এর ফলে বেপরোয়া আবেগাশ্রয়ী আদিম মানুষ নানান উদ্ভট ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নিত। স্বপ্ন ও উদ্ভট অনুমান তারা এটা ওটার ওপর দোষারোপ করত, আর মানুষ বা পশু বা কোনো নিষ্প্রাণ বস্তুর ওপর নির্ভর করতে চাইত। শিশুদের মতোই ছিল তাদের ভীতি আর আশংকা।

আদিযুগের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ, দৃঢ়চেতা যাদের অন্যের ভয় বা কল্পনার সমভাগী হওয়ার সাহস ছিল তারাই অন্যদের পরামর্শ, আদেশ, নির্দেশ দিত। কোনো ব্যাপারকে তারা অমঙ্গলসূচক বা অন্য করণীয় বা দুষ্ট আত্মার ক্রিয়া বলে ঘোষণা করত। যারা ছিল প্রেতাত্মা বশীকরণ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, সতর্কসংকেত প্রচার, নানান ভেল্কিবাজি প্রদর্শনের মাধ্যমে অমঙ্গল দূর করে সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনা দুর্ভোগ মোকাবেলা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করত। আমরা বর্তমানে যে ধরনের ধর্ম পালন করি বা চর্চা করি আদিম ধর্ম তেমনটা ছিল না, আদিম পুরোহিতদের নির্দেশনাকে বলা যায় আদিম, যথেচ্ছ প্রায়োগিক বিজ্ঞান।

১৩. কৃষির সূচনা

প্রায় ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর ভৌগোলিক চেহারা প্রায় আজকের মতোই ছিল। সম্ভবত এ সময়ে জিব্রালটার প্রণালীর ওপর যে স্থলবাধা ছিল তত দিনে ভেঙে পড়েছে আর ভূমধ্যসাগরের তটরেখা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো কাস্পিয়ান সাগর তখন আজকের চেয়ে প্রশস্ততর ছিল, আর হয়তো ককেশাস পর্বতমালার উত্তরে কৃষ্ণসাগরের সাথে সংযুক্ত ছিল। এই সুবিশাল এশীয় সাগরের চারপাশের আজকের স্তেপভূমি আর মরুভূমি সেকালে উর্বর ও বাসযোগ্য ছিল। মোটামুটিভাবে এ অঞ্চলটা তুলনামূলকভাবে আর্দ্র ও উর্বর। ইউরোপীয় রাশিয়া অঞ্চর ছিল আজকের চেয়ে অনেক বেশি হ্রদ ও জলাভূমিময়। আর বেরিং ভূসংযোগ ছিল।

আজ আমরা পৃথিবীর মানুষের যে নৃতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস করি, সে সময়েও সেটা লক্ষ্যগোচর হত। ইতিহাসের গোড়ার দিকে, হয়তো বহু সহস্র বছর পূর্বে উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকার বনভূমি ছিল নিগ্রো গোষ্ঠীর বিচরণস্থল, আর ককেশীয় সাদা চামড়ার লোকেরা

www.nagorikpathagar.org

উত্তর আফ্রিকা ইউরোপ হয়ে পশ্চিম এশিয়া, ভারত, শ্রীলংকা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিল, আর ককেশীয়দের পূর্বে এশিয়ার বিশাল এলাকা ছিল পীতবর্ণের মঙ্গোলীয়দের দখলে। তবে এই তিন বৃহৎ গোষ্ঠীর বাইরেও অনেক ছোট ছোট নৃগোষ্ঠী ছিল, যাদের এই তিন গোষ্ঠীর সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা কখনই একমত হতে পারেন না। [ককেশীয় গোত্রের দুটি প্রধান শাখা নর্ডিক বা আর্য এবং বাদামি হেলিওলিথিক শ্রেণী।]

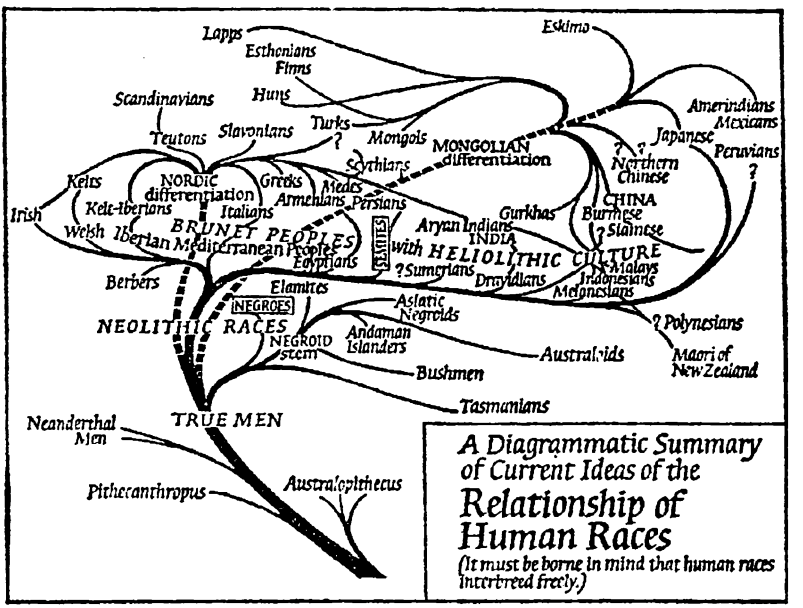

২. মানবজাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের সর্বাধুনিক ধারণাগত নকশাচিত্র।

আমাদের মনে রাখতে হবে মানবজাতি সহজেই পরস্পরের সাথে মিশতে পারে এবং আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে সংমিশ্রণ, বিভাজন ও পুনর্মিলন প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যেমন চলে মেঘেদের মধ্যে। মানবজাতির বিভাজন, বৃক্ষের শাখা বিস্তারের মতো নয় যারা পুনর্মিলিত হতে পারে না। একথাটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, কোনো সুযোগে জাতিসমূহের পুনর্মিলনের প্রবণতাই প্রবল। এটা মনে রাখলে আমরা অনেক বিভ্রান্তি আর কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারব। নৃগোষ্ঠী কথাটাকে মানুষ আলগা অর্থে ব্যবহার করবে এবং কপট সাধারণীকরণের ওপর একে স্থাপিত করবে। তারা বলবে ব্রিটিশ জাতি বা ইউরোপীয় জাতি, তবে গোটা ইউরোপীয় জাতি আসলে অসংখ্য নৃগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত।

এটা প্রায় নিশ্চিত যে ক্রমবিকাশের ধারায় বানর থেকে অর্ধমানব, মানব, আমাদের সত্তা কখনও সরল সমসত্ব ছিল না। স্থানীয় জাতিসমূহের মধ্যে বিভক্ত

www.nagorikpathagar.org

হওয়ার একটা প্রবণতা বিদ্যমান ছিল, তাদের ছিল নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আর নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থান, আবার তাদের পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে একটা মিশ্রজাতির জন্ম দেওয়ারও প্রবণতা ছিল। সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কয়েকটি নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতি সত্যিকারের মানুষ ছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগে যখন মানুষ সবে পাথর টুকরা করে ভোঁতা অস্ত্র বানাতে শিখল, তারপর ক্রোম্যাগনার্ড, গ্রিম্যাল্ডি যুগে উত্তরণ, সে শুধু জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে ঘটেনি, বরং অনুকরণ সংমার্জন, ও নতুন কৌশল অর্জনের মাধ্যমেই ঘটেছিল।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের পার্থক্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে চিহ্নিত করা যায়; ভক্ষ্য উদ্ভিদ চাষ ও ভক্ষ্য পশুপালন। তাছাড়া পূর্বসূরিদের এবড়োথেবড়ো পাথরের অস্ত্রের স্থলে মসৃণ পাথরের ব্যবহার হতে থাকে। তারা ঝুড়ি বানাবার কৌশল, উদ্ভিদের আঁশ দিয়ে পরিধেয় তৈরি ও মাটির পাত্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। কৃষির প্রসারের সাথে সাথে সুনির্দিষ্ট গ্রামাঞ্চল গড়ে উঠে এবং নগরের গোড়াপত্তন ঘটে।

মাটি খোঁড়া, বীজ বপন, ফসল কাটা, মাড়াই করা, পেষাই করা, যা বর্তমান সভ্য সমাজে প্রচলিত, ইতিমধ্যে তা শুরু হয়ে গেছে। আর কী করা যেতে পারে? মানুষের মনে সব সময় প্রশ্ন জাগে। অন্য আর কীভাবে এটা হতে পারত? এসব প্রশ্নের উত্তর আজ যেমন সহজেই আমাদের চিন্তার মধ্যে ধরা দেয়, ১০,০০০ বছর আগের মানুষের কাছে এসব তত সহজ ছিল না। প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতিতে চর্চায় এগিয়ে যেতে হয়েছিল, যাতে প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল কিম্ভূত অপ্রয়োজনীয় অতিরঞ্জন ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। পশ্চিম এশিয়ায় গম ও অন্যান্য দানাজাতীয় শস্য অকর্ষিত অবস্থায় জন্মাত, মানুষ হয়তো সেগুলি আবাদ করার বহু পূর্ব থেকেই সংগ্রহ করে খাদ্যরূপে ব্যবহার করত। তার অর্থ আবাদের আগেই কর্তন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো পৃথিবীব্যাপী বপন ও কর্তনের সাথে পশুবলি তথা নরবলির প্রথা জড়িত ছিল, যা কোনো কোনো অঞ্চলে পরিবর্তিতরূপে এখনও প্রচলিত আছে। এ ব্যাপারটি কৌতূহলী মনের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। উৎসাহী পাঠক স্যার জে. জি. ফ্রেজারের বিশালগ্রন্থ "*দ্য গোল্ডেন বাওয়ে*" বিস্তারিত পাঠ করতে পারেন। আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যাপারটা স্বপ্নিল শিশুসুলভ কল্পকথা নির্মাতা আদিম মানসিকতার সাথে জড়িত। কোনো যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে এর ব্যাখ্যা নেই। মাত্র কয়েক হাজার বছর পূর্বে নব্যপ্রস্তর যুগে বীজ বপনের সময় এলেই নরবলি হত। আর সে যেনতেন সমাজচ্যুত ভবঘুরে হলে চলবে না, সুনির্বাচিত, সুদর্শন যুবক বা যুবতী হতে হবে, যে যুবক-যুবতীকে বলিদানের পূর্বে শ্রদ্ধার সাথে দেখা হত, এমনকি পূজা করা হত। আর সে বলিদান হত যথারীতি আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

ঋতু সম্পর্কে অপ্রতুল ধারণা থাকায় প্রথম দিকে বীজ বপন ও নরবলির কঠিন সময় নিরুপণ বেশ শক্ত ছিল। এটা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে আদিম মানবের

www.nagorikpathagar.org

বছর জ্ঞান ছিল না। আদিকাল নিরুপণ শুরু হয় চান্দ্র মাস দিয়ে। বাইবেলের প্যাট্রিয়ার্করা চাঁদের হিসেবেই বছর গণনা করত। ব্যাবিলনীয় ক্যালেন্ডার থেকে স্পষ্ট ধারণা হয় তেরো মাস পরে তাদের পরবর্তী বীজ বপনের সময় ফিরে আসত। সাল গণনার এই চান্দ্র প্রাধান্য আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। প্রথা যদি আমাদের বোধকে আচ্ছন্ন না করে তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব এ পদ্ধতিতে সময় গণনায় খ্রিষ্টের ক্রুসারোহণ ও পুনরুত্থানের সময় চন্দ্রকলার সাথে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

সন্দেহ করা যেতে পারে তারকা পর্যবেক্ষণের সাথে প্রথম দিককার কৃষিকর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল কি না? পরিযায়ী পশুপালকরাই সর্বপ্রথম তারকা পর্যবেক্ষণ শুরু করে বলে ধারণা করা যায়। যাতে তাদের দিকনির্দেশনার সুবিধা হয়েছিল। তবে কৃষিক্ষেত্রে ঋতু নির্ণয়ের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। বীজবপন ও তদুদ্দেশ্যে নরবলির ক্ষণ নিরুপণ হত কোনো বিশিষ্ট তারকার উত্তরা বা দক্ষিণায়ন নিরীক্ষণ করে। সেই তারকার কল্পকথা এবং তার প্রভাব আদিম মানবের কাছে ছিল অখণ্ডনীয়।

নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের কাছে জ্ঞানী অভিজ্ঞ মানুষের কদর কতটা বেশি ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়, যারা তারকা তত্ত্বের সাথে রক্তোৎসর্গের সম্পর্ক নিরুপণ করতে পারত।

অপরিচ্ছন্নতা ও দূষণ এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধেও এসব বিজ্ঞ নরনারীর ধারণা ছিল। কারণ চার দিকে ঘিরে ছিল ভূতপ্রেত, দৈত্যদানবের বিভীষিকা। প্রাচীন পুরোহিতরা যতটা না ছিল ধর্মতাত্ত্বিক তার চেয়ে বেশি ছিল প্রায়োগিক বিজ্ঞানী। তার বিজ্ঞান ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ আর প্রায়ই দোষদুষ্ট। সে তার জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে কঠোরভাবে গোপন রাখত। তবে তার প্রথম দায় জ্ঞানার্জন আর বাস্তবে প্রয়োগের কোনো ব্যত্যয় ছিল না। কোথায় ও কখন শুরু হয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগের বিপ্লব? তবে এই বিপ্লব চলেছিল ধীর গতিতে, যখন গত বরফ যুগের বরফ পিণ্ড ধীরে ধীরে উত্তর মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে, আর উঁচু পর্বত শীর্ষ মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। উত্তর আফ্রিকা, মেসোপটেমিয়া আর আরব অঞ্চল আজ যেখানে মরুভূমি এককালে সেখানে ছিল সবুজ শ্যামল উদ্ভিদরাজি আর প্রাণের প্রাচুর্য। হয়তো এখানেই প্রথম কৃষিকাজের সূত্রপাত হয়েছিল। হয়তো এক জায়গায় নয়, স্থানীয় বৈচিত্র্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। শুধু নিকট প্রাচ্যে, প্লিস্টোসিন যুগের শেষ দিকে বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী যেমন গম, যব, ভেড়া, ছাগল, গবাদি, শূকর ইত্যাদি পোষ মানাতে শুরু করে। নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে ইউরোপে আর পূর্ব দিকে ভারত হয়ে পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ ঘটে।

প্রথম নব্যপ্রস্তর যুগের বসতি স্থাপন হয়েছিল প্রায় ৭,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। তবে ইউরোপ ও চীন পর্যন্ত প্রসার লাভ করতে হাজার হাজার বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে আদি বসতিতে নতুন পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। কাজেই আমরা যদি এখন থেকে চার হাজার বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তাহলে মানব জাতির বৈষয়িক

www.nagorikpathagar.org

উন্নতির বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ করতে পারব। পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ আর নীল উপত্যকায় সাক্ষাৎগোচর হবে সুন্দর অট্টালিকা, ধাতব উপচারের ব্যবহারসমৃদ্ধ বিশাল বিশাল শহর আর নগরসভ্যতা। তাদের বেষ্টন করে আছে নব্যপ্রস্তর যুগীয় চাষাবাদসমৃদ্ধ বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল। এর বাইরে উত্তর ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহৎ অঞ্চলে তখনও প্রাচীন প্রস্তর যুগের শিকারি মানুষদের দেখা যাবে।

নব্যপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতি কখনই সমসত্ব ছিল না। একে স্থানীয় পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে নিতে হয়েছে। আর প্রথম দিকের গ্রাম্য সমাজ গড়ে উঠেছিল সেখানকার পালিত পশু ও উদ্ভিজ্জের ওপর এবং সেভাবে গৃহ পরিকল্পনা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও পাত্রের নকশা করতে হয়েছিল। মেসোপটেমিয়া ও এশীয় সভ্যতা বিকাশের বহু পূর্বেই জেরিকোতে নব্যপ্রস্তর যুগের গোড়াতেই কাদামাটির প্রাচীর বেষ্টিত একটা শহর গড়ে উঠেছিল। এ শহরটা গড়ে উঠেছিল এক অফুরন্ত ঝরনাকে ঘিরে; যা আশপাশের এলাকাকে উর্বরতা দিয়েছিল। কয়েক হাজার বছর পরে বিভিন্ন সংস্কৃতি পরিবর্তনের মধ্য দিকে এক সময় শহরটা পরিত্যক্ত হয়েছিল, কারণ চারপাশ থেকে মরুকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে এসে এর প্রধান জীবিকা কৃষিকে অসম্ভব করে তুলছিল।

১৪. আদি আমেরিকান

নতুন পৃথিবীতে নানা জাতের বানরের আবির্ভাব ঘটেছিল, তবে আমেরিকায় কখনোই মানবসদৃশ নরবানরের আবির্ভাব ঘটেনি। বানর থেকে নরবানর, অর্ধমানবের যে ক্রমবিকাশ তা কেবলমাত্র আফ্রিকা আর এশিয়াতেই ঘটেছিল। প্লিস্টোসিন যুগের শেষ দিয়ে যখন জলবায়ু উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সেকালে পুরনো প্রস্তর যুগের মঙ্গোলীয় গোত্রের একশ্রেণীর মানুষ, আজকের সাইবেরীয় বেরিং প্রণালী এলাকা সেকালে ভূ-সংযুক্ত থাকায় আমেরিকায় চলে যায়। এ যাবৎকাল ঐ ভূ-ভাগটি মানবশূন্যই ছিল।

ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে তারা উত্তরাঞ্চলে দেখতে পায় আমেরিকান বলগা হরিণ ক্যারিবো, আর দক্ষিণে বিশাল বিশাল ব্যাইসনের পাল। দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে তাদের নজরে আসে বিশালকায় আর্মাডিলো গ্লিপ্টোডন আর হাতির সমান উঁচু শ্লথজাতীয় মেগাথেরিয়াস। বৃহদাকার হলেও এ অসহায় প্রাণীকুল তাদের হাতে লোপ পায়। এসব অধিকাংশ আমেরিকান নৃগোষ্ঠী নব্যপ্রস্তর যুগের যাযাবর পশুশিকারির উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তারা কখনই লোহার ব্যবহার শেখেনি। ধাতব উপচার বলতে সোনা আর তামার মধ্যেই সীমিত ছিল। তবে মেক্সিকো, ইউকাটান ও পেরুর অবস্থা ছিল স্থায়ী কৃষিকাজের অনুকূল আর প্রায় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে চিত্তাকর্ষক এক সভ্যতার উত্থান ঘটেছিল, যা পুরনো পৃথিবীর সভ্যতার সমান্তরাল

www.nagorikpathagar.org

হলেও স্বতন্ত্র ছিল। প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতার মতো এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফসল বোনা ও ফসল কর্তন উপলক্ষে নরবলি প্রথার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। তবে প্রাচীন পৃথিবীতে এটা যেমন ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছিল আর রূপান্তর ঘটছিল নতুন পৃথিবীতে এর মাত্রা ও ব্যাপকতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল। এসব আমেরিকান সভ্যতার দেশগুলি ছিল পুরোহিত শাসিত ধর্মীয় রাষ্ট্র। সেখানকার সেনাপ্রধান ও শাসকদের কড়াকড়িভাবে ধর্মীয় অনুশাসন ও শুভাশুভ লক্ষণ অনুসরণ করতে হত।

এসব পুরোহিত জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নির্ভুল উচ্চতায় উন্নীত করতে পেরেছিল। তারা ব্যাবিলনীয়দের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভুলভাবে বছর গণনা করতে পারত। ইউকাটানের মায়ারা সুনির্দিষ্ট বর্ণমালার লিখনশৈলী আবিষ্কার করতে পেরেছিল, যা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এ পর্যন্ত যতটা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাতে দেখা গেছে পুরোহিতরা সঠিক দিনপঞ্জির ওপর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। মায়া সভ্যতার শিল্পকর্ম চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল ৭০০ বা ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে। আধুনিক পর্যবেক্ষকদের চমকিত করে এদের ভাস্কর্য কর্মের সুকুমার নমনীয়তা আর তাদের চিন্তার উদ্ভট চমৎকারিত্ব, সূক্ষ্ম কারুকাজ আর চিন্তার জটিলতায়। প্রাচীন পৃথিবীতে এর সমকক্ষ কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এর কাছাকাছি নজির একমাত্র দেখা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন খোদাই কাজে। সর্বত্রই চোখে পড়ে বুনট করা পালক, পেঁচানো সাপ। মায়াদের উৎকীর্ণ অনেক লিপির সাদৃশ্য চোখে পড়ে ইউরোপের পাগলা গারদে পাগলদের আঁকিবুকির সাথে। মনে হয় মায়াদের মানসিকতার অগ্রগতি ঘটেছে প্রাচীন পৃথিবীর মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে। প্রাচীন পৃথিবীর মাপকাঠিতে যাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা যায় না। এসব উন্মার্গগামী আমেরিকান সভ্যতা তাদের মানসিক বিকারের শান্তি খুঁজে পেয়েছিল নরবলির মধ্যে। বিশেষ করে মেক্সিকান সভ্যতায় রক্তের বন্যা বইয়ে দিত। প্রতি বছর তারা হাজার হাজার নরবলি দিত। জীবন্ত মানুষের বুক ফেঁড়ে স্পন্দনরত হৃৎপিণ্ড টেনে ছিঁড়ে ফেলা এসব পুরোহিতের মহান কর্তব্য ছিল। সাধারণ জনগণ এই ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে উল্লাসে ফেটে পড়ত।

এই সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল যে কোনো আদিম কৃষিজীবী মানুষদের মতোই। তাদের মৃৎশিল্প, বয়ন শিল্প, বেশ উন্নত ছিল। মায়ালিপি যে শুধু পাথরে খোদাই ছিল তাই নয়, চামড়া বা অনুরূপ বস্তুতেও উৎকীর্ণ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার জাদুঘরে সেসব মায়া লিখনের নমুনা সংগৃহীত আছে, শুধু কাল নিরূপণ ছাড়া তাদের মোটেই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পেরুতেও এ ধরনের লেখা দেখা যায়। তবে রশিতে গেরো দিয়ে রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। হাজার হাজার বছর আগে চীনেও গেরো দিয়ে হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন পৃথিবীতে একপর্যায়ে বিশেষ সভ্যতার উৎকর্ষ ঘটেছিল, যা ছিল পরবর্তী আমেরিকান সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র যে সভ্যতার কেন্দ্রে থাকত মন্দির আর জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী পুরোহিতরা যাদের কর্তৃত্বে প্রচুর নরবলি দেওয়া হত।

www.nagorikpathagar.org

যেখানে প্রাচীন পৃথিবীর আদিম সভ্যতাগুলি পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে আমেরিকার এই আদিম সভ্যতাগুলি কখনই তাদের আদিমতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রতিটি সভ্যতাই ছিল তাদের স্বতন্ত্র পৃথিবীতে। মেক্সিকানরা পেরু সম্বন্ধে কিছুই জানত না। ইউরোপিয়ানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে আলু ছিল পেরুবাসীর প্রধান খাদ্য, তা ছিল মেক্সিকানদের অজানা।

যুগের পর যুগ এসব জাতি তাদের দেবতাদের মহত্ব গুণগান করে নিজেদের লোকদের কোরবানি দিত আর মরে যেত। মায়া শিল্প অলংকরণ ও সেচকর্মে চরমোৎকর্ষ অর্জন করেছিল। ব্যক্তি করত ভালোবাসা আর গোষ্ঠী করত যুদ্ধ। খরা আর প্রাচুর্য, রোগবালাই আর স্বাস্থ্য একে অন্যের অনুসরণ করত। শতাব্দীর পর শতাব্দী পুরোহিতরা তাদের পঞ্জিকা ও নরবলির বিস্তারণ ঘটাত, তবে জীবনের আর কোনো দিকে অগ্রগতি ছিল না।

১৫. সুমেরিয়া, আদিযুগের মিশর ও লিখনশৈলী

প্রাচীন পৃথিবী ছিল নতুন পৃথিবীর চেয়ে ব্যাপক ও বহুমুখী রঙ্গমঞ্চ। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে এশিয়া ও নীলনদ উপত্যকার উর্বর অঞ্চলে বেশ কিছু সভ্য সমাজের আবির্ভাব সূচিত হয়েছিল। সে সময় উত্তর পারস্য পশ্চিম তুর্কিস্তান ও দক্ষিণ আরব, এখনকার চেয়ে অনেক বেশি উর্বর ছিল। এসব এলাকায় অনেক প্রাচীন গোষ্ঠীর নিশানা পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি এযাবৎ জ্ঞাত শহরের মধ্যে জেরিকো ছিল সবচেয়ে প্রাচীন। এটা ছিল নিম্ন মেসোপটেমিয়ায়। তবে মিশরেই লক্ষ করা যায় নগর, মন্দির, প্রথাগত সেচ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী, যা তাদের অসভ্য গ্রাম্য-শহুরে সমাজের ঊর্ধ্বে টেনে তুলেছিল। সে সময় ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদী স্বতন্ত্র জলধারায় পারস্য উপসাগরে পতিত হত। আর এই দুই নদীর মাঝখানেই গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় নগর সভ্যতা। ঐ একই সময়ে, যদিও কাল নিরূপণ কিছুটা অস্পষ্ট, গড়ে উঠেছিল মহান মিশরীয় সভ্যতা।

মনে হয় এই সুমেরীয়রা ছিল একটি মিশ্র জাতিগোষ্ঠী। তারা এক ধরনের লিপি ব্যবহার করত যার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে, এবং তাদের ভাষা এখন পরিচিত। তারা ব্রঞ্জের ব্যবহার শিখেছিল। আর রোদে শুকানো ইট দিয়ে তারা টাওয়ারের মতো মন্দির নির্মাণ করত। দেশের মাটি ছিল উপযোগী, এর ওপরে তারা লিখতে পারত। আর সে কারণেই তাদের উৎকীর্ণ লিপি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাদের ছিল গবাদিপশু। ভেড়া, ছাগল আর গাধা, তবে তাদের ঘোড়া ছিল না। তারা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে বর্শা ও চামড়ার ঢাল নিয়ে যুদ্ধ করত। তারা রেশমি বস্ত্র পরিধান করত আর মস্তক মুণ্ডন করত। প্রতিটি সুমেরীয় নগরই ছিল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র,

www.nagorikpathagar.org

যার ছিল স্বতন্ত্র দেবতা ও স্বতন্ত্র পুরোহিত। তবে মাঝে মধ্যে একটি নগর অন্য নগরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত আর নাগরিকদের কাছে থেকে কর আদায় করত। প্রাচীন নগরী নিপ্পুরের আবিষ্কৃত একটা উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় প্রাচীন সুমেরীয় সাম্রাজ্য "এরেখ"এর বিবরণ। এটাই পৃথিবীর প্রথম রেকর্ডভুক্ত সাম্রাজ্য। এর দেবতা ও এর পুরোহিত রাজা পারস্য উপসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত কর্তৃত্ব দাবি করত।

প্রথম দিকে লিখন বলতে বোঝাত সংক্ষেপিত চিত্রিত দলিল। এমনকি নব্যপ্রস্তর যুগের পূর্বেও মানুষ লিখতে শুরু করেছিল। পাহাড়ের গায়ে অ্যাজিলীয়দের চিত্র, যার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা ছিল লিখন বিদ্যার সূত্রপাত। এসব চিত্রের অধিকাংশের বিষয়বস্তু ছিল শিকার অথবা যুদ্ধাভিযান, যেখানে মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে সরলভাবে। তবে কোন ছবিতেই চিত্রকর মানুষের মাথা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে মোটেই ভাবিত ছিল না মানুষ বলতে একটা উল্লম্ব রেখা আর একটা বা দুইটা ছেদ রেখা।

এ থেকে প্রথাসিদ্ধ চিত্রলিপিতে উত্তরণ মোটেই কঠিন ছিল না। সুমেরিয়া, যেখানে লিখনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হত মাটির ফলকে কাঠির সাহায্যে আঁচড় কেটে, সেখানে ছবিগুলি তাদের বিষয়বস্তু বলে চেনা বেশ মুশকিল ছিল। তবে মিশর, যেখানে লিখনচর্চা হত দেয়াল বা প্যাপিরাসের ওপর (প্যাপিরাসকে প্রথম কাগজ বলা হয়) সেখানে চিত্রের সাথে উদ্দিষ্ট বস্তুর সাদৃশ্য স্পষ্ট। সুমেরীয়রা যেহেতু কাঠের ফলকে লিখত, তাই তাদের অক্ষরগুলি ছিল কিলকাকার, আর সে জন্যই তাদের লিপিকে বলা হত কিউনিফর্ম লিপি।

লিখনপদ্ধতির একটা বড় অগ্রগতি সূচিত হয় যখন অংকিত চিত্রটি ঈপ্সিত বস্তুটি নয়, বরং অনুরূপ কোনো বস্তুর সদৃশ হত। রীবাস (এক ধরনের ধাঁধা যাতে ছবি থেকে বস্তুর অনুমান করতে হয়) ধাঁধাটি এখনও নির্দিষ্ট বয়সের নিকট প্রিয় খেলা। যেমন একটা ক্যাম্প (তাঁবু) আর একটা বেল (ঘণ্টা) আঁকা হলো, এর থেকে ক্যাম্পবেল নামের কোনো ব্যক্তি অনুমান করতে হবে। সুমেরীয় ভাষা সমসাময়িক কোনো আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মতো কয়েকটি শব্দাংশের সন্নিবেশ, আর এখান থেকেই শব্দাংশ সন্নিবেশে ভাষা গঠনপদ্ধতির ধারণা এসেছে, চিত্রলিপি প্রত্যক্ষভাবে যা সম্পন্ন করতে পারে না। মিশরীয় লিখন এই ধারা অনুসরণ করে এগিয়েছে। পরবর্তীকালে যখন অন্য কোনো জগৎ এই ভাষাচর্চা করেছে, তখন তারা শব্দাংশ সংযোজনপদ্ধতির আরো সরলীকরণ করে বর্ণমালা লিখনপদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরবর্তী সব বর্ণমালাই সুমেরীয় কিউনিফর্ম ও মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। পরবর্তীকালে চীনে এক ধরনের গতানুগতিক চিত্রলিপির উদ্ভব ঘটেছে, যা কখনই বর্ণমালায় রূপান্তরিত হয়নি।

মানব সমাজের অগ্রগতিতে লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। চুক্তি, আইন, নির্দেশনামা ইত্যাদির সংরক্ষণে এর ভূমিকা অপরিহার্য। এই লিখন

www.nagorikpathagar.org

প্রক্রিয়াই নগররাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যে পরিণত করতে সহায়তা করেছে। ধারাবাহিক ঐতিহাসিক চেতনা এরই অবদান। পুরোহিত বা রাজার আদেশ এবং সীলমোহর তার কণ্ঠস্বরের আওতার বাইরে কার্যকর হয়েছে এবং তার মৃত্যুর পরও বহাল থেকেছে। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো প্রাচীন সুমেরীয়তে সীলমোহরের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রাজা বা অভিজাত বা ব্যবসায়ীর সীলমোহরের শৈল্পিক উৎকর্ষ লক্ষণীয়, মাটির তৈরি দলিলে যে কোনো ক্ষমতা প্রদানকে প্রামাণ্যতা দেওয়া হত। ছয় হাজার বছর আগে সভ্যতা মুদ্রণের কত কাছাকাছি পৌঁছেছিল। এরপর মাটি রোদে শুকিয়ে স্থায়িত্ব দেওয়া হত। পাঠকরা নিশ্চয়ই স্মরণ রেখেছেন অপরিমেয় সময় ধরে মেসোপটেমিয়ায় পত্র, দলিল, হিসাব ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে অক্ষয় মৃৎফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে। এ তথ্যের মধ্যেই অতীতের বহু জ্ঞান আমরা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। বেশ প্রথম দিকেই সুমেরীয় ও মিশরীয়দের ব্রোঞ্জ, তামা, সোনা, রুপা ও কিছু কিছু দুর্লভ ক্ষেত্রে উল্কাপিণ্ড থেকে প্রাপ্ত লোহা সম্পর্কে জানা ছিল।

প্রাচীন পৃথিবীর মিশর ও সুমেরীয় নগর জীবনের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অনেকটা সদৃশ ছিল। গাধা বা গবাদির কথা বাদ দিলে প্রায় তিন চার হাজার বছর পরের আমেরিকার মায়া সভ্যতার কাছাকাছি ছিল। শান্তিকালীন সময়ে লোকেরা সেচ ও কৃষিকাজেই ব্যস্ত থাকত– ব্যতিক্রম ছিল শুধু ধর্মীয় উৎসবকাল। তাদের কোনো মুদ্রা ছিল না, আর তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না। ছোটখাটো বাণিজ্যিক কাজকারবার বিনিময়ের মাধ্যমেই সম্পন্ন হত। জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রক ছিল মন্দির; সুমেরিয়ার মন্দির ছিল সুউচ্চ টাওয়ার সদৃশ; যার ছাদ থেকে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করা হত। মিশরের মন্দির ছিল বিশাল একতলা সৌধ। সুমেরীয়তে পুরোহিত মহান, বিস্ময়কর এক মানুষ। মিশরে পুরোহিতদের ঊর্ধ্বে ছিল দেশের প্রধান দেবতার অবতার ফারাও, মিশরের ঈশ্বর-রাজা। সেসব দিনে পৃথিবীতে পরিবর্তন হত খুবই সামান্য; পুরুষের দিনগুলি ছিল রৌদ্রকরোজ্বল, শ্রমসাধ্য আর প্রথাবদ্ধ। আগন্তুকের আগমন ঘটত কালেভদ্রে এবং যারা আসত তারা পেত শীতল অভ্যর্থনা। পুরোহিতরা জীবন নির্দেশনা দিত অখণ্ডনীয় নিয়ম অনুসারে, আর তারকার গতিপ্রকৃতি থেকে ফসল বোনার কাল নির্ণয় করত, প্রাণবলির শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় এবং স্বপ্নের সতর্কবাণীর ব্যাখ্যা প্রদান করত। মানুষ কাজ করত, ভালোবাসত, মরে যেত, নিতান্ত অসুখী নয়, বর্বর অতীতকে ভুলে আর ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে। মাঝে মধ্যে কোনো রাজা হতেন হৃদয়বান. যেমন দ্বিতীয় পেপি, যিনি মিশরে রাজত্ব করেছিলেন নব্বই বছর। মাঝে মধ্যে তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিত আর মানুষের বাচ্চাদের সৈন্য বানিয়ে প্রতিবেশী কোনো নগররাজ্য জয় করে লুট করতে পাঠাতেন, অথবা তিনি বিশাল অট্টালিকা বানাতে তাদের শ্রমে লাগিয়ে দিতেন, যেমনটা ছিলেন চিওপস আর শেফ্রেন আর মাইসেরিনাস যারা বিশাল সমাধি স্তূপ গিজের পিরামিড তৈরিতে অজস্র মানুষের ঘাম ঝরিয়েছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উঁচুটি ছিল ৪৫০ ফিট আর এতে পাথর লেগেছিল ৪৮,৮৩,০০০ টন। এর সবটাই নীল নদ দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

নৌকায় করে আনা হয়েছিল আর মানুষের পেশিশক্তি দিয়ে ওঠানামা করা হয়েছিল। এটা নির্মাণ করতে যে পরিমাণ শ্রমশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল, তা দিয়ে হয়তো একটা মহাযুদ্ধ জয় করা যেত।

১৬. আদিম যাযাবর জনগোষ্ঠী

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে যে শুধু মেসোপটেমিয়া বা নীল উপত্যকায় মানুষ কৃষিকাজে থিতু হয়েছিল বা নগররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা নয়। যেখানেই মানুষ সেচের এবং সারা বছরের খাদ্য সরবরাহের সম্ভাবনা দেখেছে, সেখানেই শিকারের পেছনে ছুটে বেড়ানোর বদলে স্থায়ী বসতি গড়তে চেয়েছে। তাইগ্রিস নদীর উজানে এসিরীয় নামের এক জাতিগোষ্ঠী নগরপত্তন শুরু করে। এশিয়া মাইনরের উপত্যকায় এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল ও দ্বীপসমূহে ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। সম্ভবত ভারত ও চীনের অনুকূল এলাকাসমূহে মানবজীবনের অনুরূপ উন্নতি ঘটে চলেছিল। ইউরোপের অনেক অঞ্চল যেখানে হ্রদের মধ্যে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত, সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী খুঁটি গেঁড়ে পানির ওপর ঘর তৈরি করে বসবাস করতে থাকে এবং কৃষি বাদ দিয়ে মাছ শিকারকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেয়। তবে প্রাচীন পৃথিবীর খুব বেশি জায়গায় এ ধরনের বসত গড়ার সম্ভাবনা ছিল না। ভূমি ছিল অতিশয় রুক্ষ, ঘন বনাচ্ছাদিত বা অত্যধিক অনুর্বর, অথবা আবহাওয়া এত অনিশ্চিত ছিল যে তৎকালীন জ্ঞানের ভিত্তিতে স্থায়ী বসত করা সম্ভব ছিল না।

আদিম সভ্যতায় বসতি স্থাপনের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা হলো অবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ ও উষ্ণ রৌদ্রজ্জ্বল আবহ, যেখানে এসব শর্ত পূরণ হত না, সেখানকার মানুষ ছিল স্বল্পস্থায়ী স্থানান্তরগামী। তারা হয় শিকারি অথবা পশুর পাল নিয়ে মৌসুমি ঘাসের সন্ধানে যাযাবর। তাদের পক্ষে স্থায়ী বসতি করা সম্ভব ছিল না। শিকারি থেকে পশুপালকে রূপান্তর ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বন্য গবাদির পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে তারা সেগুলিকে সম্পদরূপে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল এবং উপত্যকার মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করত আর নেকড়ে বা বন্য কুকুর বা অন্য শিকারি প্রাণীদের থেকে রক্ষার চেষ্টা করত।

কাজেই যে সময়ে কৃষিনির্ভর আদিম সভ্যতা গড়ে উঠছিল, বিশেষ করে বিস্তৃত নদী উপত্যকাগুলিতে; সে সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবনযাত্রা, যাযাবর জীবনধারা তৈরি হচ্ছিল অবিরাম চলমান জীবন শীতকালীন তৃণভূমি থেকে গ্রীষ্মকালীন তৃণভূমিতে, যাযাবর জাতিসমূহ কৃষিজীবীদের চেয়ে শক্ত সমর্থ ছিল। সংখ্যায় তারা ছিল অল্প, তাদের না ছিল স্থায়ী মন্দির না ছিল স্থায়ী পুরোহিত। তাদের গতি ছিল

www.nagorikpathagar.org

মন্থর। তবে পাঠকদের এটা ভাবা ভুল হবে যে তাদের জীবনধারা স্বল্পোন্নত ছিল। অনেক দিক দিয়ে এই মুক্ত জীবনের মানুষ জমিতে চাষবাসরত মানুষের চেয়ে উন্নত ছিল। ব্যষ্টি ছিল অধিকতর স্বনির্ভর, জনতার খণ্ডাংশমাত্র ছিল না সে; নেতা ছিল ওষুধ প্রয়োগকারীর চেয়ে অধিক গুরুত্ববাহী।

বিস্তৃত অঞ্চলে ভ্রমণ করতে করতে যাযাবররা জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করত। তারা কখনও এ স্থায়ী বসতির সীমান্ত স্পর্শ করত কখনও বা ঐ। সে অজানা মানুষের মুখ দর্শনে অভ্যস্ত ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি গোষ্ঠীর হাত থেকে চারণভূমি রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হত। ভূমি কর্ষণরত মানুষের চেয়ে ধাতু সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বেশি ছিল, কারণ তারা গিরিপথ অতিক্রম করে পাহাড়ি এলাকায় বিচরণ করত। তারা হয়ে উঠেছিল উন্নত ধাতুতত্ত্ববিদ; সম্ভবত হয়তো লোহা গলানোও আয়ত্ত করেছিল। এসবই ছিল যাযাবরদের আবিষ্কার। আকর লোহা গলিয়ে তৈরি কিছু আদিম উপচার মধ্য ইউরোপে পাওয়া গেছে যা আদি সভ্যতা থেকে অনেক দূরে।

অপরপক্ষে স্থায়ী বাসিন্দারা কাপড় বুনত, মৃৎপাত্র তৈরি করত এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস বানাতে পারত। যেহেতু কৃষিনির্ভর ও যাযাবর জীবন ধারা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ছিল, তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে এক ধরনের লুটপাট ও বাণিজ্য চলত পরস্পরের মধ্যে। বিশেষ করে সুমেরিয়া, যেটা ছিল মরুময় ও ঋতুপর্যায়ের দেশ, তাই যাযাবররা প্রায়ই কৃষি বসতির কাছাকাছি তাদের তাঁবু ফেলত। ব্যবসা ছাড়াও চুরিচামারিও নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল, আজকাল যেমনটা ঘটে জিপসিদের ক্ষেত্রে (তবে মুরগি, চুরির ঘটনা ছিল না, কারণ হাঁস-মুরগি পালন খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ সালের আগে শুরু হয়নি)। তারা নিয়ে আসত মূল্যবান পাথর, ধাতু ও চামড়ার তৈরি তৈজস। তারা শিকারি হলে নিয়ে আসত চামড়া। তার বদলে তারা পেত মাটির পাত্র, পুঁতি, কাচ, কাপড় এ ধরনের তৈরি জিনিস।

সুমেরিয়া ও মিশরের তিনটি প্রধান ভূ-খণ্ডে তিনটি পৃথক পরিয়ায়ী ও তিনটি অসম্পূর্ণ স্থায়ী নৃগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল সভ্যতার উষালগ্নে। দূরে ইউরোপের জঙ্গলে উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের নর্ডিক জাতিগোষ্ঠীর শিকারি ও পশুপালক নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস ছিল। প্রাচীন সভ্যতায় ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগে এদের দেখা যায়নি। অপরপ্রান্তে পূর্ব এশিয়ার স্তেপভূমিতে বিভিন্ন মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠী, বিশেষ করে হুণরা অশ্ব পোষ মানিয়ে বিস্তৃত অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাঁবু ফেলে বাস করত। সম্ভবত নর্ডিক ও হুণরা বিভক্ত ছিল রাশিয়ার জলাভূমি ও কাস্পিয়ান হ্রদের দ্বারা। কারণ সে সময়কার রাশিয়ার অধিকাংশ এলাকাতেই ছিল জলাভূমি আর হ্রদ। সিরিয়া ও আরবের মরু অঞ্চলে, যা ক্রমান্বয়ে উষর হচ্ছিল, শ্যামলা বা বাদামি রঙের সেমিটিক গোষ্ঠীর লোক তাদের ভেড়া, ছাগল আর গাধার পাল নিয়ে এক চারণ ক্ষেত্র থেকে আর এক চারণ ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াত। এই সেমিটিক মেষপালক ও পারস্যের কিছু কালো চামড়ার লোক এলামাইটরা আদি

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতার কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। তারা বাসগৃহ নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বাস করা শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সাহসী উদ্ভাবনী সম্পন্ন নেতার আবির্ভাব ঘটে যারা বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০০ অব্দের দিকে এক মহান সেমিটিক নেতা সার্গন সমগ্র সুমেরীয় রাজ্য জয় করে নেয়। উজানের নদীতীরবর্তী ছোট এক শহরকে তারা রাজধানী বানিয়ে এর নাম দেয় ব্যাবিলন, আর তাদের সাম্রাজ্যের নাম হয় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যকে যিনি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, তার নাম সম্রাট হামুরাবি (আনুমানিক ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্ব) যিনি প্রথম কয়েকটি আইনের ধারা প্রবর্তন করেন যা আজও ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে আছে।

১৭. প্রথম সমুদ্রগামী জাতি

নৌকা ও জাহাজের ব্যবহার শুরু হয় এমন এক সময় মানুষ তখনও পাথরের উপচার বানিয়ে চলেছে। নব্যপ্রস্তর যুগ শুরুর বেশ কিছু আগে থেকেই মানুষ কাঠের টুকরা বা চামড়ার বৈঠা দিয়ে নৌকা বাওয়ার অভ্যাস করে। মিশর ও সুমের সম্বন্ধে আমাদের জানাশোনা হওয়ার অনেক আগে থেকেই বাস্কেটের সাথে চামড়া সেঁটে দিয়ে নৌকা বানিয়ে সেখানকার নদীতে চলাচল করত। উত্তর-পশ্চিম আয়ারল্যান্ডে এ ধরনের নৌকা এখনও প্রচলিত আছে। আলাস্কায় সীল মাছের চামড়ার নৌকায় করে লোকে বেরিং প্রণালী পাড়ি দিত। যন্ত্রপাতির উন্নতির সাথে সাথে ফাঁপা কাষ্ঠদণ্ডের ব্যবহার শুরু হলো বৈঠা হিসেবে। নৌকার উন্নতিবিধান করেই জাহাজ তৈরি শুরু হলো।

সম্ভবত নুহের নৌকার কাহিনীর মাঝে প্রাথমিক জাহাজ তৈরির ইতিহাস বিধৃত আছে, হয়তো সে সময় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মাঝে মধ্যে ভয়াবহ বন্যা হত।

পিরামিড তৈরির অনেক আগেই লোহিত সাগরে জাহাজ ভাসত, আর ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরে জাহাজ চলাচল করত খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের দিকে। সম্ভবত এসব জাহাজ ছিল মৎস্যজীবীদের, তবে এর মধ্যেই কোনো কোনোটা ছিল বণিক আর কোনটা জলদস্যুদের– কারণ মানব জাতি সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তা হলো জাহাজে করে তারা ব্যবসা করত আর সুযোগ পেলেই লুটপাট চালাত।

যেসব সাগরে প্রথম দিকের জাহাজ চলাচল করত সেসব সাগর ছিল ভূবেষ্টিত, আর সেখানে বায়ু চলাচল ছিল অনিয়মিত আর মাঝে মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে একদম ছিল শান্ত স্থির, কাজেই বৈঠা বাওয়ার চেয়ে উন্নত কোনো জাহাজের প্রচলন

www.nagorikpathagar.org

হয়নি। গত চারশ বছর আগেই কেবল উন্নত পাল তোলা জাহাজের প্রচলন হয়। প্রাচীন পৃথিবীর জাহাজগুলি ছিল মূলত পাল তোলা জাহাজ। এগুলি সাগরের কূল ঘেঁষে চলত আর ঝড়ের আভাস পাওয়ামাত্র পোতাশ্রয়ে ভিড়ত। জাহাজগুলি আয়তন বাড়ার সাথে সাথে এগুলির দাঁড় টানার জন্য ক্রীদাসের প্রয়োজন হত।

আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি সিরিয়া ও আরবের সেমিটিক গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল যাযাবর, আর কীভাবে তারা সুমের জয় করে আক্কাদীয় ও পরবর্তী কালে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমে এই সেমিটিকরাই সমুদ্রে নেমে যায়। তারা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলব্যাপী একসারি সমুদ্রবন্দর স্থাপন করে, যার প্রধান ছিল টায়ার ও সিডন, প্রথমে তারা কারবার করত মিশরের সাথে, তারপর ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী আর উপনিবেশকারী হিসেবে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এই সেমিটিক জাতিকে বলা হত ফিনিশীয়। তারা মূলত বসতি স্থাপন করেছিল স্পেনে আর সেখান থেকে আইবেরীয় বাস্ক অধিবাসীদের বিতাড়িত করে, জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করল। ফিনিশীয় শহর কার্থেজ সম্বন্ধে পরে আমাদের আরো কিছু বলতে হবে।

তবে ফিনিশীয়রাই প্রথম জাতি নয় যারা ভূমধ্যসাগরে জাহাজ ভাসিয়েছিল। এর অনেক আগেই ভূমধ্যসাগরের উপকূল ও দ্বীপসমূহে ইজিয়ানরা অনেকগুলি শহর ও নগরের পত্তন করেছিল। এই জাতি গোষ্ঠীকে গ্রিকদের সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না, যারা এসেছিল অনেক পরে। তারা ছিল গ্রিক-পূর্ব। তবে গ্রিস ও এশিয়া মাইনরে তাদের প্রতিষ্ঠিত নগর ছিল; যেমন মাইসীন ও ট্রয়। ক্রিটের নসমে তাদের বিশাল স্থাপনা ছিল। ক্রিটের অধিবাসীরা ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণ, যাদের মধ্যে ছিল এশিয়া মাইনর ও মিশরের অভিবাসী।

মাত্র অর্ধ শতাব্দী আগে পুরাতত্ত্ববিদরা খননকাজের সহায়তায় ইজিয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। পুরোপুরিভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে একটা বিস্মৃত সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের জানা হয়েছে।

নসসের ইতিহাস মিশরের অতীত ইতিহাসের সাথে মিলে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে এই দুই দেশের মধ্যে সমুদ্রগামী জাহাজে করে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল, সে ছিল প্রথম সার্গন ও হামুরাবির সময়ে যখন ক্রিটের সভ্যতা শীর্ষে পৌঁছেছিল।

নসস যতটা না ছিল নগর তার চেয়ে বেশি ছিল এক বিশাল প্রাসাদ, যেখানে রাজা তার জনগণকে নিয়ে বসবাস করত। এমনকি এর সুরক্ষা প্রাচীরও ছিল না। নগরের সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়, যখন প্রতিবেশী ফিনিশিয়রা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর তার চেয়েও বেশি যখন উত্তর, থেকে গ্রিক নৌদস্যুদের উৎপাত হয়।

রাজার উপাধি ছিল মিনোস, যেমন মিশরীয় রাজার উপাধি ছিল ফারাও; তার রাজ্য সীমিত ছিল তার প্রাসাদের মধ্যে যার মধ্যে ছিল চলমান পানির প্রবাহ আর

www.nagorikpathagar.org

স্নানাগার, অন্য কোনো প্রাচীন অবশেষে যেমনটা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেখানে অনুষ্ঠিত হত বড় বড় উৎসব আর প্রদর্শনী। ষাঁড়ের লড়াই অনুষ্ঠিত হত; অধুনা যেমনটা শুধু স্পেনেই অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি বুল ফাইটারদের পোশাকের সাদৃশ্যও লক্ষণীয়; জিমন্যাস্টিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। মহিলাদের পোশাকে ছিল আধুনিকতার ছাপ। তারা পরত আঁটসাঁট অন্তর্বাস ও সুদৃশ্য পাড়যুক্ত স্কার্ট। এই ক্রিটবাসীদের মৃৎপাত্র, বস্ত্রশিল্প, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, অলংকার, গজদণ্ডের কাজ, ধাতু ও অলংকরণ ছিল আশ্চর্যজনক সুন্দর। তাদের একপ্রকার লিখনপদ্ধতি ছিল, যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি।

এই সুখী উচ্ছল সভ্য জীবন টিকে ছিল এক কুড়ি শতাব্দীব্যাপী। প্রায় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নোসাস নগরে বাস করত উন্নত মার্জিত সভ্য এক জাতি, যারা আনন্দময় জীবনযাপন করত। তাদের ছিল প্রদর্শনী আর ধর্মীয় উৎসব, ছিল গৃহকর্মের কৃতদাস ও শিল্পকর্মের কৃতদাস; যারা লাভজনক কর্ম সম্পাদন করত। এই জাতির জীবন ছিল নিরাপদ, রৌদ্রোজ্জ্বল আর নীল সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত। সে সময় অবশ্য মিশর তার অর্ধবর্বর মেষপালক রাজাদের শাসনাধীন অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর যদি কারো রাজনীতির প্রতি আগ্রহ থাকে, তাহলে অবশ্যই দেখা যাবে কীভাবে সেমিটিকরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল। তারা শাসন করতে শুরু করে মিশর, ব্যাবিলন, তাইগ্রিসের উজানে নিনেভ শহরের পত্তন করে, অবশ্য তখনও তাদের নৌপথে হারকিউলেসের স্তম্ভ (জিব্রাল্টার প্রণালী) পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, আর তারা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সুদূর স্প্যানিশ ও আফ্রিকান উপকূলে।

নসসদের জীবনধারার সাথে আজকের জীবনের যেমন কিছু পার্থক্য দেখা যায়, তেমনি কিছু কিছু সাদৃশ্যও দেখা যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে আকাশ থেকে লৌহপিণ্ড পতিত হতে দেখে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কৌতূহল প্রকাশ করেছিল, অবশ্য তখন পর্যন্ত খনি থেকে লোহা উত্তোলনের ব্যাপার ছিল না। বর্তমানে যখন লোহা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে, তখন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক বটে। তেমনি ঘোড়া নামক প্রাণীটিও তাদের কাছে ছিল এক কল্পকথার জন্তু। তাদের হিসেবে সভ্যতা বিরাজমান ছিল বিশেষ করে ঈজিয়ান গ্রিস ও এশিয়া মাইনরে, যেখানে লিডিয়ান, ক্যারিয়ান ও ট্রোজানরা বাস করত এবং তাদের মতো উন্নত ভাষা ব্যবহার করত। ফিনিশীয় ও ঈজিয়ানরা স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করেছিল, তবে তাদের কল্পনায় এগুলি ছিল বহু দূরের দেশ। ইতালি ছিল তখনও এক জনহীন ভূখণ্ড, যা ছিল গহিন অরণ্যাচ্ছাদিত। বাদামি চামড়ার এট্রুস্কানরা তখনও সেখানে যায়নি। হয়তো ক্রিটের এক ভদ্রলোক সেখানকার পোতাশ্রয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন এক বন্দি যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কারণ সে ছিল সাদা চামড়া আর নীল চোখের মানুষ। হয়তো ক্রিটের সেই ভদ্রলোক তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করল। আর সে উত্তর দিলো দুর্বোধ্য এক ভাষায়। হয়তো এই প্রাণীটি এসেছে কৃষ্ণসাগরের ওপার থেকে আর তাকে মনে হলো ভদ্র নম্র এক

www.nagorikpathagar.org

বর্বর। তবে সে ছিল আর্য জাতির কোনো গোত্রের এক লোক, যাদের সম্বন্ধে শিগগিরই আমাদের অনেক কথা বলতে হবে। আর যে দুর্বোধ্য ভাষায় সে কথা বলল তা ছিল সংস্কৃত, পারস্য, গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, ইংরেজি ইত্যাদি আর্য ভাষার পূর্বসূরি, পরবর্তী কালে যা সারা পৃথিবীর প্রধান ভাষায় পরিণত হয়।

এমনই ছিল নসোসরা তাদের সর্বোচ্চ বিন্দুতে; বুদ্ধিমান, উদ্যোগী, উজ্জ্বল ও সুখী। তবে প্রায় ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে হঠাৎ করেই দুর্যোগ নেমে এলো তাদের সমৃদ্ধির ওপর। মিনোস প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে গেল হয়তো গ্রিক ভাষাভাষী আক্রামকদের দ্বারা। তখন থেকে আর কোনো দিন তা বাসযোগ্য করে পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। খননকারীরা সেখানে লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ডের নিশানা দেখতে পেয়েছেন। তবে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া গেছে। হয়তো প্রকৃতি একাই অথবা প্রকৃতির সাথে গ্রিকরা মিলে ধ্বংসের কাজ সমাপ্ত করেছে।

১৮. মিশর, ব্যাবিলন আর এসিরিয়া

মিশরীয়রা কখনই স্বেচ্ছায় তাদের সেমিটিক রাখাল রাজাদের কাছে নতিস্বীকার করেনি, আর প্রায় ১৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে একটা প্রবল দেশপ্রেমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই বিদেশীদের বিতাড়িত করে। এরপর শুরু মিশরীয় পুনর্জাগরণের, মিশরতত্ত্ববিদরা যার নাম দিয়েছেন নতুন সাম্রাজ্য; যা হিকসস আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত পুরোপুরি সংগঠিত হতে পারেনি, এখন তা দমনের মধ্য দিয়ে দেশটি এক সামরিক শক্তিতে পরিণত হলো। ফারাওরা এবার আক্রমণাত্মক বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। এবার এদের হাতে এলো যুদ্ধের ঘোড়া আর যুদ্ধের রথ, হিকসসরা যা তাদের কাছে নিয়ে এসেছিল। তৃতীয় থুথমেস ও তৃতীয় এমেনোফিসের অধীনে মিশর রাজ্য এশিয়ার ইউফ্রেতিস পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।

এবার আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুটি সভ্যতা মেসোপটেমিয়া ও নীলের মধ্যে হাজার বছরের যুদ্ধের অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম। প্রথম দিকে মিশরের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মহান সপ্তদশ রাজবংশ যার মধ্যে ছিল তৃতীয় থুথমেস, তৃতীয় ও চতুর্থ এমেনোফিস আর মহান রানী হাতাসু, নবম এমেনোফিস। তারপর দ্বিতীয় রামেমেস, যাকে মনে করা হয় মুসার সময়কার ফারাও, ৬৭ বছর ধরে রাজত্ব করেন, যারা মিশরকে চরম সমৃদ্ধির শিখরে উন্নীত করেন। এর মধ্যে কিছু দুঃসময়ও গেছে। সিরীয়দের বিজয় এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ থেকে ইথিওপীয়দের বিজয় অভিযান। মেসোপটেমিয়ায় রাজত্ব চলছিল ব্যাবিলনীয়দের। তারপর সাময়িক প্রাধান্য লক্ষ করা যায় হিট্টাইট ও দামেস্কের সিরীয়দের। এক সময় সিরীয়রা মিশর জয় করে

www.nagorikpathagar.org

বসে। নিনেভের এসিরীয় ভাগ্যে জোয়ারভাটা চলতে থাকে, কোনো সময় নিনেভ একটা বিজিত শহর আবার কখনও দেখা গেল এসিরীয়রাই বেবিলনে রাজত্ব করছে আর মিশরীয়দের পরাস্ত করছে। মিশরীয়দের উত্থান-পতন সেই সাথে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের বিস্তারিত কাহিনী আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, যুদ্ধে অশ্ব ও রথের ব্যবহার মধ্য এশিয়া থেকে প্রাচীন সভ্যতার দিকে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

দূর অতীতের আবছা আলোতে অনেক মহান বিজেতার আবির্ভাব ঘটে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, যেমন মিত্তানিক রাজা তুশারাত্তা, যিনি নিনেভ দখল করেছিলেন, এসিরিয়ার প্রথম তিগলাথ পিলেসার জয় করেছিলেন ব্যাবিলন। অবশেষে এসিরিয়া সে সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। তৃতীয় তিগলাথ পিলেসার খ্রিষ্টপূর্ব ৭৪৫ অব্দে, ঐতিহাসিকরা যাকে নব্য আসিসীয় সাম্রাজ্য বলে, প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে সভ্যতার মধ্যে লোহা ঢুকে পড়ে। উত্তর থেকে, হিট্টাইটরা যাদের বলা হয় আর্মেনীয়দের পূর্বসূরি, প্রথমে লোহার ব্যবহার শুরু করে আর তারাই সিরীয়দের কাছে এটা পৌঁছে দেয়; এসিরীয় দখলদার দ্বিতীয় সার্গন লোহা দিয়ে তার বাহিনীকে সজ্জিত করেন। এসিরীয়রাই প্রথম জাতি যারা রক্ত আর লোহার নীতি প্রথম প্রয়োগ করে। সার্গনের পুত্র সেনাসেরিব মিশর সীমান্তে চড়াও হয়ে সামরিক শক্তি নয়, বরং প্লেগের দ্বারা পরাজিত হন। সেনাসেরিবের নাতি অসুরবানিপাল (গ্রিক ঐতিহাসিকরা যাকে সার্দানপেলাস নামে অভিহিত করেন, ৬৭০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশর জয় করেন। তবে মিশর ইতিমধ্যে ইথিওপীয়দের দ্বারা বিজিত এক দেশ। সার্দানপেলাস শুধু বিজয়ীর স্থলাভিষিক্ত হন।

কোনো ব্যক্তি যদি এ সময়ের একগুচ্ছ রাজনৈতিক মানচিত্র হস্তগত করতে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন বিগত দশ শতাব্দীতে কিভাবে মিশরের সংকোচন প্রসারণ ঘটেছে, যেমনটা সংকোচন প্রসারণ ঘটে মাইক্রোস্কোপের নিচে অ্যামিবার। আর দেখতে পাবে কীভাবে বিভিন্ন সেমিটিক গোষ্ঠী ব্যাবিলনিয়ান, এসিরিয়ান, হিট্টাইট আর সিরিয়রা পর্যায়ক্রমে এসেছে আর চলে গেছে, একে অন্যকে গ্রাস করেছে আর উগরে দিয়েছে। এশিয়া মাইনরের পশ্চিম প্রান্তে ছিল ছোট নিডিয়ার মতো ঈজিয়ান রাজ্য যার রাজধানী ছিল সাদিস ও কারিয়া। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দ বা তারও আগে একপ্রস্থ নতুন নাম উত্তর-পূর্ব আর উত্তর-পশ্চিম থেকে এসে প্রাচীন পৃথিবীর ম্যাপের বুকে জেকে বসেছিল। এরা ছিল কিছু বর্বর জাতি যাদের ছিল লৌহ নির্মিত অস্ত্র আর ঘোড়ায় টানা রথ। ঈজিয়ান ও সেমিটিক সভ্যতার ওপর এরা ছিল এক ভয়ঙ্কর উৎপাত। তারা একই আর্য ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলত।

কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর দিক থেকে এগিয়ে এলো মেডিস আর পারসিকরা। এদের সাথে সিথীয় ও সার্মেটীয়রা গুলিয়ে যায়। উত্তর-পূর্ব বা উত্তর পশ্চিম থেকে এলো আর্মেনীয়রা, বলকান উপদ্বীপের ওপার থেকে এলো সীমেরীয়, ফ্রিজীয় হেলেনিক উপজাতীয়রা: যাদের এখন বলা হয় গ্রিক। তারা এসিরীয় শহর

www.nagorikpathagar.org

আক্রমণ করে লুটপাট চালাত। তারা সবাই ছিল একই গোত্রের; শক্ত সমর্থ পশুপালক লুটপাট যাদের ছিল প্রিয় পেশা। পূর্ব সীমায় তারা ছিল কেবল অনুপ্রবেশকারী লুটেরা, তবে পশ্চিম প্রান্তে নগরসমূহ দখল করে সেখানকার সুসভ্য ঈজিয়ানদের বিতাড়িত করে। ঈজিয়ানরা এতটাই চাপে পড়ে যে আর্যদের আওতার বাইরে তারা নতুন আবাসভূমি খুঁজতে থাকে। তাদের মধ্যে কোনো কোনো জাতি নীল উপত্যকায় বসত করে আবার কেউ কেউ সেখান থেকে মিশরীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এশিয়া মাইনর থেকে সমুদ্রপথে মধ্য ইতালির অরণ্য অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে। এরাই ছিল এট্রুস্কান। আবার কোনো সম্প্রদায় ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে নিজেদের নগর গড়ে তোলে। ইতিহাসে এরাই ফিলিস্তিন নামে পরিচিত।

যেসব আর্য গোষ্ঠী প্রাচীন সভ্যতার দৃশ্যপটে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তাদের সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে আমরা শুধু প্রাচীন সভ্যতার দেশান্তর ও অভিবাসনের কথাই বলব, যা সংঘটিত হয়েছিল উত্তর থেকে আগত বর্বর আর্যদের অবিরাম চড়াও হওয়ায়। এটা ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ৬০০ অব্দব্যাপী।

আর পরবর্তী একটা অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করব ছোট এক সেমিটিক জাতি হিব্রুদের কথা, যারা ফিনিশীয় ও ফিলিস্তিন উপকূলের পেছনের পাহাড়ে এ যুগের শেষ দিকে প্রাধান্য বিস্তার করে। তারা যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছে ইতিহাসে তার গুরুত্ব অসীম; কিছু বইয়ের সংকলন, ইতিহাস, কবিতা জ্ঞানের গ্রন্থ, দৈববাণী সব কিছু একত্রে মিলে হিব্রু বাইবেল।

মেসোপটেমিয়া ও মিশরে আর্যদের আগমন ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। গ্রিকদের দ্বারা ঈজিয়ানদের বিতাড়ন এমনকি নসস নগরের ধ্বংস সাধন মিশর ও ব্যাবিলনের নাগরিকদের কাছে ছিল নিতান্তই দূরবর্তী উৎপাত। সভ্যতার উষালগ্নে এসব নগরে রাজবংশ এসেছে, চলে গেছে, তবে মানুষের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। ধীর গতিতে হলেও যুগের পর যুগ ধরে সভ্যতা যেমন শীলিত, মার্জিত হয়েছে জটিলতাও বেড়েছে। ইতোমধ্যেই মিশরের স্মৃতিস্তম্ভ সহস্রাব্দে পৌঁছেও তার নির্মাণ অব্যাহত থাকে, আর আজকের মতো সেকালেও ছিল দর্শনার্থীর ভিড়। এর সাথে যোগ হয় সপ্তদশ ও ঊনবিংশ রাজবংশের নির্মিত জমকালো অট্টালিকা কার্নাক ও লুক্সরের মন্দিরও এই সময়কার। নিনেভের সব প্রধান স্মৃতিস্তম্ভ, মহান মন্দির, মানুষের মাথাযুক্ত ডানাওয়ালা ষাঁড়, রাজা, রথ আর সিংহ শিকারের রিলিফ চিত্র– এসবই হয়েছে ১৬০০ থেকে ৬০০ এই কয়েক খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীর মধ্যে। ব্যাবিলনের সব জাঁকজমকই এই সময়কার।

মেসোপটেমিয়া ও মিশরের প্রচুর সরকারি দলিলপত্র, ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ, গল্প, কবিতা আর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র আমাদের হাতে এসেছে। আমরা জানি ব্যাবিলন আর মিশরীয় থিবিসের প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আজকের প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিদের মতোই বিলাসী জীবনযাপন করত। তাদের জীবন ছিল সুশৃংখল ও উৎসবমুখর। তারা বাস করত সুন্দর ও সুসজ্জিত বাড়িতে, বহু মূল্য সুদৃশ্য পরিধেয় ও অলংকার ছিল তাদের। তারা ভোজ ও উৎসবের আয়োজন করে পরস্পরকে আপ্যায়ন করত, নাচগানের ব্যবস্থা থাকত আর তাদের পরিচর্যার জন্য থাকত প্রশিক্ষিত ভৃত্য, থাকত চিকিৎসক। তারা তেমন ভ্রমণ করত না বা বেশি দূরে যেত না; তবে নীল ও ইউফ্রেতিস নদীতে নৌকা ভ্রমণ ছিল মনোরঞ্জনের অপরিহার্য বিষয়। গাধা ছিল ভারবাহী জন্তু, ঘোড়া তখন পর্যন্ত শুধু যুদ্ধ, রথ ও রাজকীয় কাজেই ব্যবহৃত হত। মেসোপটেমিয়ায় থাকলেও মিশরে তার চল শুরু হয়নি। আর লোহার তৈজস ছিল নিতান্তই হাতে গোনা; তামা আর ব্রোঞ্জই ছিল প্রচলিত ধাতু। সূক্ষ্ম লিনেন আর কার্পাস বস্ত্র যেমন পরিচিত ছিল, তেমনি ছিল পশমি বস্ত্র। তবে তখন পর্যন্ত রেশমি বস্ত্রের প্রচলন হয়নি। কাচের সাথে তাদের পরিচয় ছিল; তারা সুন্দরভাবে কাচ চিত্রিত করত, তবে কাচের তৈজস ছিল সীমিত। কাচে তেমন স্বচ্ছতা আসেনি আর অপটিক্যাল ব্যবহার শুরু হয়নি। লোকের মুখে সোনার দাঁত ছিল তবে চোখে চশমার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন থিবিস বা বেবিলনের জীবনযাত্রার সাথে আধুনিক জীবনের একটা লক্ষণীয় বৈসাদৃশ্য হলো ধাতব মুদ্রার ব্যবহার। তখন পর্যন্ত অধিকাংশ ব্যবসা বাণিজ্য চলেছে বিনিময়ের মাধ্যমে। আর্থিক দিক থেকে ব্যাবিলন মিশরের চেয়ে এগিয়ে ছিল। বিনিময়ের মাধ্যম ছিল সোনা ও রুপা আর সম্পদের সঞ্চয় বলতে এসব ধাতব পিণ্ডের সংরক্ষণ। আর মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হওয়ার বহু পূর্বেই ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু ছিল; ব্যাংকাররা এসব মূল্যবান ধাতব পিণ্ডে তাদের নাম ও ওজনের সীলমোহর লাগিয়ে দিত। একজন বণিক তার চাহিদাসামগ্রী কেনার জন্য মূল্যবান পাথর বহন করত। অধিকাংশ ভৃত্য বা শ্রমিকই ছিল কৃতদাস, যাদের শ্রমের মূল্য চুকানো হত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। কারণ অর্থের আগমনের সাথে সাথে দাসপ্রথা স্তিমিত হতে থাকে।

একজন আধুনিক দর্শক প্রাচীনকালের কোনো সমৃদ্ধ নগরে গিয়ে দুটি জিনিসের অভাব বোধ করবে। খাদ্য তালিকায় তারা মুরগি আর ডিম দেখতে পাবে না। একজন ফরাসি বাবুর্চি ব্যাবিলনে গিয়ে মোটেই খুশি হবে না। এসব জিনিস প্রাচ্য থেকে আমদানি হয় সর্বশেষ এসিরীয় সাম্রাজ্যের আমলে।

অন্য সব কিছুর মতো ধর্মও ইতিহাসে অনেক মার্জিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরবলি অনেক আগেই তিরোহিত হয়েছে; প্রতীক হিসেবে প্রাণী বা রুটির ডামির প্রচলন হয়েছে (তবে ফিনিশীয়রা বিশেষ করে কার্থেজীয়রা মানব উৎসর্গের জন্য অভিযুক্ত হয়)। প্রাচীনকালে যখন কোনো মহান দলপতি মারা যেত, তখন প্রথাগতভাবে তার দাস ও স্ত্রীদের হত্যা করে কবর দিয়ে দেওয়া হত, আর সেই সাথে তার বর্শা ও ধনুকও থাকত, যাতে পেতাত্মার রাজ্যে তাকে অরক্ষিত থাকতে না হয়। ক্রীতদাস, বাড়িঘর বিভিন্ন উপচার কবরে রাখার প্রাণবন্ত প্রথা ৩০০০ বছর আগে পর্যন্ত চালু ছিল।

www.nagorikpathagar.org

উত্তরের অরণ্য ও মরুভূমি থেকে আর্যদের আগমন পর্যন্ত প্রাচীন জগতের এই ছিল জীবনধারা। ভারত ও চীনেও ছিল সমান্তরাল ধারা।

উভয় অঞ্চলের বিশাল উপত্যকার বাদামি রঙের জনজাতির কৃষিভিত্তিক নগর সভ্যতা গড়ে উঠছিল। তবে ভারতের নগর সভ্যতা মেসোপটেমিয়া বা মিশরীয়দের সাথে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারেনি, তারা ছিল প্রাচীন সুমেরীয় বা আমেরিকার মায়া সভ্যতার সমপর্যায়ে। চীনা পণ্ডিতরা এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন পৌরাণিক কল্পকথা থেকে প্রকৃত তথ্য টেনে বের করার। মনে হয় সে সময়কার চীন ভারতের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিল। মিশরের সপ্তদশ রাজবংশের সমসময়ে চীনে ছিল শ্যাঙ বংশ, অধীনস্থ রাজন্যবর্গকে নিয়ে একটা আলগা বাঁধনের পুরোহিত সম্রাটের প্রথম দিকে এসব সম্রাটের প্রধান কর্তব্য ছিল মৌসুমি বলি চড়ানো। শ্যাঙ রাজবংশের সুন্দর সুন্দর ব্রোঞ্জের পাত্র এখনও বর্তমান আছে, আর সেগুলি সৌন্দর্য আর শিল্পনৈপুণ্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়; এই সভ্যতা বহু দিন ধরে চলে আসছিল।

১৯. আদিম আর্য জাতিগোষ্ঠী

চার হাজার বছর আগে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া নিশ্চয় এখনকার চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ, আর্দ্র আর ঘন অরণ্যসংকুল ছিল। এ অঞ্চলেই ঘুরে বেড়াত কিছু জাতিসত্তার লোক, যার অন্তর্গত ছিল সাদা চামড়া আর নীল চোখের নর্ডিকরা, যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আর রাইন থেকে ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত একই ভাষার বিভিন্ন অপভ্রংশে কথা বলত। এরা সবাই ছিল আদিম আর্য। সে সময় তারা হয়তো সংখ্যায় তেমন বেশি ছিল না। তখন হয়তো ব্যাবিলনের হামুরাবি যিনি আইন প্রণয়নে ব্যস্ত আর মিশরীয় যারা বহিরাক্রমণের স্বাদ পেতে শুরু করেছে, তারা এদের তেমন সন্দেহের চোখে দেখে নি।

এই নর্ডিক জাতিসমূহ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা তৃণভূমি ও অরণ্য পরিষ্কার করে বসবাস করছিল; প্রথম দিকে তাদের অশ্ব ছিল না, শুধু ছিল গবাদি। স্থানান্তর গমনের সময় তাদের তাঁবু ও অন্যান্য উপকরণ ষাঁড়ে টানা শকটে বহন করত; অবস্থানকালে তারা কাদামাটির কুটিরে বৃক্ষ শাখার আচ্ছাদন ববহার করত। তারা মৃতদেহ সমাহিত না করে দাহ করত, অনেক জাতি যেমনটা এখনও করে। তাদের খ্যাতিমান নেতাদের দেহভস্ম ভস্মাধারে ভরে একটা বৃহৎ গোলাকার স্তূপের নিচে রেখে দিত। এ ধরনের স্তূপ উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন এলাকায় এখনও চোখে পড়ে। দাহকারীদের পূর্বজরা অবশ্য তাদের মৃতদেহ কবর দিত বসিয়ে রেখে।

আর্যরা ষাঁড় দিয়ে জমি চাষ করে গমের আবাদ করত। তবে তারা এখনও কৃষিভূমিকেন্দ্রিক স্থায়ী বসতি নির্মাণ করেনি; ফসল কাটা শেষ করে তারা আবার

www.nagorikpathagar.org

রওনা দিত। তারা ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত, আর পরবর্তীকালে তারা লোহার ব্যবহার শিখেছিল তবে তার সুনির্দিষ্ট সময় জানা যায়নি। হয়তো তারা লোহা গলানোর কৌশলও শিখেছিল। আর এ সময়ের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে তারা ঘোড়া পোষ মানিয়ে ছিল। প্রথম দিকে গাড়ি টানার জন্যই এগুলি ব্যবহৃত হত। তাদের সমাজ জীবন মন্দিরকেন্দ্রিক ছিল না, যেমনটা ছিল ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী স্থায়ী বাসিন্দাদের। আর তাদের প্রধান ব্যক্তি ছিল নেতা, পুরোহিত নয়। তাদের সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল অভিজাততান্ত্রিক, রাজকীয় ধর্মভিত্তিক নয়।

তারা ছিল বেশ হইচইপূর্ণ জাতি। তাদের ভ্রমণপথ আনন্দমুখর করে রাখত ভোজের আয়োজন করে, যেখানে থাকত প্রচুর মদপান, আর নির্বাচিত কিছু ব্যক্তির সঙ্গীত ও আবৃত্তি। সভ্যতার সংস্পর্শে আসার আগ পর্যন্ত তাদের লিখনপদ্ধতি ছিল না, আর এসব কবির স্মৃতিশক্তিই ছিল তাদের জীবন্ত সাহিত্য। এই আবৃত্তির ভাষা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে চমৎকার এক ভাব প্রকাশের দৃষ্টান্ত। আর পরবর্তীকালে আর্যভাষীর প্রাধান্য এর পরেই অনেকটা নির্ভরশীল। প্রতিটি আর্য গোষ্ঠীর নিজেদের পুরাণ, ইতিহাস গড়ে ওঠে মহাকাব্য, বীরত্ব গাথা আর বেদের কাব্যিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে।

এসব জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের প্রকাশ ঘটে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গৃহস্থালিকে কেন্দ্র করে। গোষ্ঠী প্রধানের হল ঘর, যেখানে তারা সাময়িকভাবে বাস করত, ছিল গুঁড়ির তৈরি প্রশস্ত ঘর। সন্দেহ নেই সেখানে পশুদের জন্য পশুশালা ও খামারবাড়িও ছিল, তবে হল ঘরটিই ছিল অধিকাংশ আর্য জনগোষ্ঠীর সর্বসাধারণের মিলনকেন্দ্র। সকলেই সেখানে গিয়ে ভোজে যোগ দিত বা কবিদের আবৃত্তি শুনত নতুবা খেলাধুলায় অংশ নিত। একে মাঝখানে রেখে চারদিকে তৈরি হত গোশালা আর অশ্বশালা। প্রধান এবং তার স্ত্রী ও পুত্ররা শয়ন করত এক মঞ্চে বা উঁচু স্থানে; সাধারণরা যত্রতত্র মাটিতেই শয়ন করত যেমনটা এখনও ভারতে সাধারণরা করে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার আর হাতিয়ারের কথা বাদ দিলে তাদের মধ্যে ছিল এক ধরনের পুরুষতান্ত্রিক সাম্যবাদ। গবাদি ও চারণক্ষেত্র ছিল প্রধানের মালিকানায়, তবে তা ব্যবহৃত হত সাধারণের প্রয়োজনে; বন আর নদী ছিল বেওয়ারিশ।

মেসোপটেমিয়া আর নীল উপত্যকায় যে সময় মহান সভ্যতা গড়ে উঠছিল, তখন মধ্য ইউরোপ আর মধ্য এশিয়ায় এই জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে চলেছিল, আর খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এরা প্রাচীন সভ্যতায় চাপ সৃষ্টি করেছিল। তারা ফ্রান্স, ব্রিটেন আর স্পেনের ওপর চড়াও হয়েছিল। তারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছিল দুটি তরঙ্গরেখায়। যে জাতিগোষ্ঠী ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডে পৌঁছে ছিল তাদের ছিল ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র। ইংল্যান্ডে তারা বিশাল স্টোনহেঞ্জ ও অ্যাভেবেরি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিল। আর সেখানে বসবাসকারী জাতিসমূহকে উচ্ছেদ করেছিল বা পদানত করেছিল। তারা আয়ারল্যান্ডে পৌঁছেছিল। সেখানে তাদের বলা হয় গৈডেলিক কেল্ট। তাদেরই ঘনিষ্ঠ আর এক গোষ্ঠী, যাদের হয়তো অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে

www.nagorikpathagar.org

সংমিশ্রণ ঘটেছিল, গ্রেট ব্রিটেনে লোহার আমদানি ঘটিয়েছিল এরাই। তাদেরকে বলা হয় ব্রিথোনিক কেল্ট। ওয়েলসের ভাষা এদের থেকেই উদগত।

সমগোত্রীয় কেল্টিক জাতি দক্ষিণে স্পেনের দিকে অগ্রসর হয়ে শুধু যে হেলিওলিথিক বাস্ক জাতির সংস্পর্শে এসেছিল, তাই নয়। তারা সমুদ্র তীরবর্তী সেমিটিক ফিনিশীয়দের সাথেও মিলিত হয়েছিল। এদেরই ঘনিষ্ঠ আর এক জাতি ইতালীয়রা উপদ্বীপের অরণ্যসংকুল দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা যেসব সময় জয় করেছিল, তা নয়। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে ইতিহাসে রোমের অভ্যুদয় ঘটে। প্রথমে যা ছিল টাইবারের তীরের একটা বাণিজ্যিক শহর, যেখানে এট্রুস্কান অভিজাত রাজন্যদের অধীনে বাস করত আর্য ল্যাতিনরা।

আর্য আওতার দক্ষিণ প্রান্তে একই জনগোষ্ঠীর অপর এক শাখা বিস্তার লাভ করেছিল। সংস্কৃত ভাষাভাষী আর্যরা পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে উত্তর ভারতে প্রবেশ করে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দেরও পূর্বে। সেখানে তারা আদিম কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শে আসে, আর তাদের কাছে থেকে অনেক কিছু শেখে। অন্য আর্য গোষ্ঠীসমূহ মধ্য এশিয়ার গিরিপথ দিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায়। পূর্ব তুর্কিস্তানে এখনও সাদা চামড়া নীল চোখের নর্ডিক জাতি বাস করে, তবে এখন তারা মঙ্গোলীয় ভাষায় কথা বলে।

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের আগেই হিট্টাইটরা ককেশীয় অঞ্চল থেকে দক্ষিণ দিকে বিতাড়িত হয়। তারা আবার উত্তর-পশ্চিমে আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করে। ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে তারা মিত্তানীদের কাছে তাদের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলই হারায়। এই মিত্তানীরা আর্যদেরই আর এক তরঙ্গ যারা ভারতের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তীতে কিছু সময়ের জন্য হিট্টাইটরা মধ্যপ্রাচ্যে শক্তি সঞ্চয় করে। খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দের দিকে আর এক অভিবাসী তরঙ্গে তারা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

বল্কান এলাকার মধ্য দিয়ে আর একটা আর্য চাপ এগিয়ে আসে। প্রথমে আসে কিছু আর্য গোষ্ঠী যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফ্রিজিয়ানরা; তারপর আসে ইয়োলিক, আইয়োনিক, আর ডরিয়ান গ্রিকরা। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে গ্রিস ও গ্রিসের দ্বীপসমূহ থেকে ঈজিয়ান সভ্যতার শেষ চিহ্ন মুছে ফেলে। মাইসিন আর টিরিয়ান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আর নসসের কথা প্রায় ভুলিয়ে দেয়। ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই গ্রিকরা সমুদ্রে নামে। তারা ক্রিট ও রোডসে আবাস গড়ে তোলে আর তারা সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালিতে উপনিবেশ স্থাপন করে ঠিক যেমনটা ফিনিশীয়রা করেছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী নগরসমূহে।

কাজেই যখন তৃতীয় তিগলাথ পিলেসার, দ্বিতীয় সার্গন ও সান্দ্রাপ্যালাস আসিরিয়ায় রাজত্ব করছিল আর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ব্যাবিলনিয়া, সিরিয়া ও মিশরের সাথে, তখন আর্যরা ইতালি, গ্রিস ও পারস্যে সভ্যতার পাঠ নিচ্ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব নবম

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী ছয় শতাব্দী আর্যদের যে ইতিহাস তা হলো আর্যরা কীভাবে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে সমগ্র প্রাচীন পৃথিবী; সেমিটিক ঈজিয়ান ও মিশরীয়দের পদানত করেছিল। আকৃতিগতভাবে আর্য জাতির হাতে রাজদণ্ড চলে এলেও বহুদিন ধরে সেমিটিক ও মিশরীয় ধ্যান-ধারণাই প্রচলিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সংগ্রাম ইতিহাসের সব পর্যায়েই বহাল ছিল এবং এখনও আছে। সর্বশেষ ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য ও প্রথম দারায়ুসের সাম্রাজ্য।

২০. সর্বশেষ ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য ও প্রথম দারায়ুসের সাম্রাজ্য

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি তৃতীয় সার্গনের অধীনে কীভাবে আসিরিয়া এক মহান সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। সার্গন এই ব্যক্তিটির প্রকৃত নাম ছিল না। তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন বিজিত ব্যাবিলনীয়দের স্মরণ করিয়ে দিতে প্রথম সার্গনের নাম যিনি তার সময়ের দুই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্যাবিলন যদিও ছিল এক বিজিত নগরী তবুও জনসংখ্যা ও গুরুত্বের দিক থেকে তা নিজেকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর এখানের মহান দেবতা বেল মার্ডাককে বণিক ও পুরোহিতরা যথেষ্ট মান্য করে চলত। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মেসোপটেমিয়া বর্বর যুগ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছিল, যখন একটা নগর দখল বলতে বোঝাত লুটপাট আর গণহত্যা। বিজয়ীরা এভাবেই বিজিতদের ওপর তাদের রাগ ঝাড়ত। সার্গনের পর দেড় শতাব্দী পর্যন্ত আসিরীয় সাম্রাজ্য টিকেছিল। আর লক্ষ করা যায় যে অসুরবানিপাল (সার্দনাপ্যালাস) অন্ততপক্ষে নিম্ন মিশর দখল করেছিল।

তবে আসিরীয়দের ক্ষমতা ও সংহতি দ্রুত ক্ষীণ হতে থাকে। ফারাও প্রথম সামেটিকাসের নেতৃত্বে সাময়িকভাবে মিশর থেকে বিদেশীদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয় এবং দ্বিতীয় নেকো সিরিয়া জয় করাতে যুদ্ধ শুরু করেন। এ সময় আসিরিয়া শত্রুদের পরাস্ত করার মরিয়া চেষ্টা করে; তবে তাদের প্রতিরোধ ছিল ক্ষীণ। দক্ষিণ-পূর্ব মেসোপটেমীয় গোষ্ঠী ক্যালদীয়রা উত্তর-পূর্বের আর্য মিডিস ও পারসিকদের সাথে মিলিত হয়ে ৬০৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নিনেভ নগর দখল করে নেয় (ইতিমধ্যে আমরা সঠিক সাল নির্ণয়ে সক্ষম।)

আসিরীয়া দখলের পর তা ভাগাভাগি শুরু হয়। উত্তরে সাইয়াক্সারেসের নেতৃত্বে স্থাপিত হয় এক মিডীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল নিনেভ নগর আর রাজধানী ছিল ইকবাতানায়। পূর্বদিকে এর বিস্তৃতি ছিল ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত। দক্ষিণে বিশাল এক অর্ধচন্দ্রাকার ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ছিল ক্যালদীয়দের দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য, মহান সম্রাট নেবুচাদনেজারের শাসনে, যা সম্পদ ও শক্তির শীর্ষে আরোহণ করে (বাইবেলে এই নেবুচাদনেজারের নামোল্লেখ আছে)। শুরু হলো মহান ব্যাবিলন

www.nagorikpathagar.org

সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। কিছুদিনের জন্য দুটি পাশাপাশি সাম্রাজ্য শান্তিপূর্ণ ছিল এবং নেবুচাদনেজারের কন্যার সাথে সাইয়াক্সারেসের বিবাহ হয়।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় নেকো সিরিয়া বিজয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একটি ছোট রাজ্য জুডার (যার সম্বন্ধে শিগগিরই আমরা আরো অনেক কথা বলব) রাজা যশিয়াকে ৬০৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মেগিডোর যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে এবং ইউফ্রেতিসের দিকে অগ্রসর হন যে সময় সেখানে ক্ষীয়মান আসিরীয়া নয়, বরং উদীয়মান ব্যাবিলনিয়া। ক্যালদীয়রা বেশ দাপটের সাথেই মিশরীয়দের মোকাবেলা করে। নেকো উৎখাত হয়ে মিশরের দিকে তাড়িত হন, আর ব্যাবিলনীয়, সাম্রাজ্য মিশর, সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৬ থেকে ৫৩৯ অব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাবিলন সাম্রাজ্য অসংরক্ষিতভাবে বিকশিত হয়। বিকাশের ধারা তত দিনই বহাল থাকে যত দিন তারা উত্তরের শক্ত সমর্থ মিডীয় সাম্রাজ্যের সাথে শান্তি বজায় রাখতে পারে। সাতষট্টি বছর ধরে এই প্রাচীন শহরে শুধু জীবনই নয়, বিদ্যারও বিকাশ লাভ ঘটে।

এমনকি আসিরীয় সম্রাটদের বিশেষ করে সার্দানাপ্যালাসের অধীনে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রসার ঘটে। সার্দানাপ্যালাস যদিও আসিরীয় ছিলেন, তিনি পুরোপুরি ব্যাবিলনীয় হয়ে গিয়েছিলেন। [মিডীয় ও দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় (চালদীয়) সাম্রাজ্যের সম্পর্ক।]

৩. ব্যাবিলনীয় সম্রাট নেবুচাদনেজারের রাজত্বকালে মেডীয় ও দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় (চালদীয়) সাম্রাজ্যের সম্পর্ক

www.nagorikpathagar.org

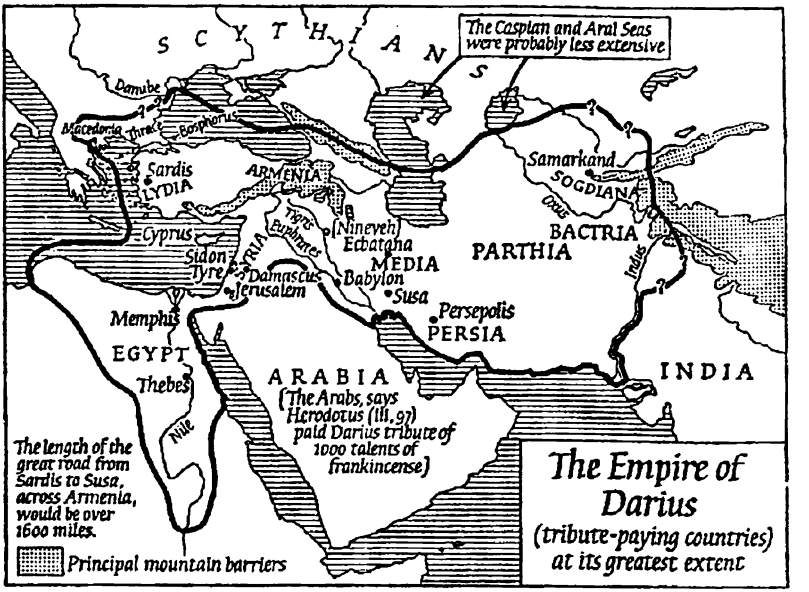

৪. সর্বোচ্চ সম্প্রসারণকালে দারায়ুস (তদীয় করদ রাজ্যসমূহসহ) সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

তিনি একটি লাইব্রেরি নির্মাণ করেছিলেন, কাগজের বই নয়, সুমেরীয় আমলে মেসোপটেমিয়ায় যেমন মাটির ফলকে লেখা হত, তেমনি বইয়ের লাইব্রেরি। তার সংগ্রহ মাটি খনন করে আবিষ্কার করা গেছে, যা পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক অনন্য সম্পদ। ব্যাবিলনীয় যুগের সর্বশেষ ক্যালদীয় সম্রাট নেবুনিডাসের ছিল অতুলনীয় সাহিত্যিক রুচিবোধ। তিনি ছিলেন পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার পৃষ্ঠপোষক, আর তার গবেষকরা প্রথম সার্গনের সিংহাসন আরোহণের তারিখ নির্ণয় করায় তিনি তা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। তবে তার রাজত্বকালে অনৈক্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়, যা দূর করতে তিনি অনেক স্থানীয় দেবতার মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রোমানরা এই কৌশল বেশ সফলভাবে কাজে লাগিয়েছিল। তবে ব্যাবিলনে এই কৌশল সেখানকার শ্রেষ্ঠ দেবতা বেল মার্ডাকের পৌরহিত্য লাভের জন্য ঈর্ষার সঞ্চার হয়। তারা নেবুনিডাসের বিকল্প হিসেবে পারসিক সাইরাসকে প্রতিষ্ঠা করে, যিনি ছিলেন পার্শ্ববর্তী মিডীয় সাম্রাজ্যের শাসক। সাইরাস ইতিমধ্যেই পূর্ব এশিয়া মাইনরের বিত্তশালী মিডীয় রাজা ক্রোয়েসাসকে পরাজিত করে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ব্যাবিলনের ওপর চড়াও হন আর দুর্গ প্রাকারের বাইরে ভয়াবহ সংঘর্ষের পরে দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় তার জন্য (৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব), বিনাযুদ্ধেই তার সৈন্যরা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলে আছে, যুবরাজ তখন এক মহাভোজে নিমগ্ন আর এদিকে আগুনের অক্ষরে লেখা হচ্ছে এক রহস্যময় বার্তা "মেনে মেনে তেকেল উফারসিন" ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েলের ভাষ্য মতে যার অর্থ

www.nagorikpathagar.org

"ঈশ্বর তোমার সাম্রাজ্যের দিনগণনা শেষ করেছেন। দাঁড়িপাল্লায় তোমার ওজন শূন্য আর তোমার সাম্রাজ্য পারস্যের মেডিসদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।" সম্ভবত বেল মার্ডাকের পুরোহিতরা দেয়ালের এই লিখন আগেই পড়েছিলেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে, সেই রাতেই বেলশাজরকে হত্যা করা হয় আর নেবুনিডাসকে বন্দি করা হয়। সব কিছু এতই নির্বিঘ্নে চুকে যায় যে সে সময় বেল মার্ডাকের মন্দিরে পূজা অর্চনায় কোনো বাধা পড়েনি।

এভাবেই ব্যাবিলনীয় ও মিডীয় সাম্রাজ্য একীভূত হয়, সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বিস মিশরকে পদানত করেন। দৈবক্রমে ক্যাম্বিসের মাথা খারাপ হয়ে নিহত হন আর তার স্থলাভিষিক্ত হন সাইরাসের প্রধান অমাত্য হিস্টাস্পেসের পুত্র মিডীয় বংশজাত প্রথম দারায়ুস।

প্রথম দারায়ুসের পারস্য সাম্রাজ্যই ছিল প্রাচীন সভ্যতার বুকে প্রথম আর্য সভ্যতার পত্তন আর তার সাম্রাজ্যই ছিল এ যাবৎকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ, তার সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল গোটা এশিয়া মাইনর আর সিরিয়া, সমগ্র আসিরীয় আর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য, মিশর, ককেশাস আর ক্যাস্পিয়ান অঞ্চল, মিডিয়া, পারস্য আর এর শেষ সীমা ছুঁয়ে গিয়েছিল ভারতের সিন্ধু নদ পর্যন্ত। এমন বিশাল এক সাম্রাজ্য সম্ভব হয়েছিল যার মূলে ছিল অশ্ব আর তার আরোহী এবং মানুষের দ্বারা নির্মিত রাস্তা। এ যাবৎ দ্রুততম বাহন বলতে বোঝাত গাধা আর বলদ এবং মরু অঞ্চলে উট। পারস্য সম্রাটদের নির্মিত রাস্তা সাম্রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত ছিল ধমনীসদৃশ আর অশ্ববাহনের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান আর রাজকীয় আদেশ নির্দেশ বাহিত হত রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। তাছাড়া ইতিমধ্যে পৃথিবীতে ধাতব মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়েছে; যা বাণিজ্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তবে বেবিলন আর এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী রইল না। শেষ পর্যন্ত বেল মার্ডাক মন্দিরের পুরোহিতদের ষড়যন্ত্রও কাজে এলো না। গুরুত্বপূর্ণ হলেও বেবিলন ততক্ষণে এক ক্ষয়িষ্ণু নগর। এখন নতুন সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে উঠল সুসা, পার্সিপোলিস আর ইকবাতানা। রাজধানীর মর্যাদা লাভ করল সুসা। ইতিমধ্যে নিনেভ পরিত্যক্ত আর ধ্বংসোন্মুখ।

২১. ইহুদিদের আদি ইতিহাস

এবার আমরা সেমিটিক জনগোষ্ঠী হিব্রুদের আলোচনায় আসব। সমসময়ে তেমন গুরুত্ব বহন না করলেও পরবর্তী বিশ্ব ইতিহাসে যাদের গুরুত্ব অসীম। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের বহু পূর্বেই যারা জুডিয়াতে বসতি স্থাপন করেছিল, আর পরবর্তীকালে তাদের রাজধানী হয়েছিল জেরুজালেম। তাদের ইতিহাস গ্রথিত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল দক্ষিণে মিশর আর উত্তরে সদা পরিবর্তনশীল সিরিয়া, আসিরিয়া আর আর ব্যাবিলনের সাথে। তাদের দেশ ব্যবহৃত হত মিশর আর এসব রাজ্যের সাথে যোগাযোগের রাজপথ হিসেবে।

বিশ্ব ইতিহাসে তাদের গুরুত্ব এখানে যে তাদের রয়েছে লিখিত সাহিত্য রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস, আইনের সংকলন, কাল নির্ঘণ্ট স্তোত্র, জ্ঞানগ্রন্থ, কাব্য, কল্পকথা, রাজনৈতিক বক্তব্য, শেষ পর্যন্ত খ্রিষ্টানরা যাকে ওল্ড টেস্টামেন্ট হিসেবে গ্রহণ করেছিল, আর সেটাই হলো হিব্রু বাইবেল। ইতিহাসে এই সাহিত্যের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে। সম্ভবত এই সাহিত্য সংকলিত হয়েছিল ব্যাবিলনে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি কীভাবে ফারাও দ্বিতীয় নেকো আসিরীয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, যে সময় আসিরীয়া যুদ্ধরত ছিল মেডিস, পারসিক, আর ক্যালদীয়দের সাথে। জুডার রাজা মশিয়া তার বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজেই পরাজিত ও নিহত হন মেগিডোর যুদ্ধে (৬০৮ খ্রিষ্টপূর্ব)। জুডাই পরিণত হয় মিশরের করদরাজ্যে, আর ব্যাবিলনের মহান সম্রাট নেবুচাদনেজার নেকোকে মিশরে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, আর জুডাকে ম্যানেজ করার জন্য তিনি জেরুজালেমে একটা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, জনগণ ব্যাবিলনের কর্মকর্তাদের পাইকারিহারে নিধন করে ছোট্ট রাজ্যটি ভেঙে ফেলে, যা দীর্ঘদিন উত্তরের রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিশরকে রসদ জুগিয়েছে। জেরুজালেম দখল করে ভস্মিভূত করা হয়, আর শেষ পর্যন্ত যারা বেঁচে থাকে তাদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারা ওখানেই রয়ে যায় যত দিন না সাইরাস বেবিলন কব্জা করেন (৫৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব)। তিনি আবার তাদের একত্র করে নিজ দেশে ফেরত পাঠান যেখানে আবার তারা জেরুজালেমের মন্দির ও প্রাকার নির্মাণ করে।

এ সময়ের আগ পর্যন্ত মনে হয় না জেরুজালেম ততটা সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। সম্ভবত তাদের মধ্যে দু-একজন মাত্র লিখতে পড়তে পারত। তাদের ইতিহাসে এমন কথা নেই যে তাদের কেউ বাইবেল পাঠ করেছে; শুধুমাত্র জসিয়ার আমলেই গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্যাবিলনীয় দখল তাদেরকে সভ্য আর ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তারা দেশে ফিরল নিজ সাহিত্য সচেতন আর রাজনীতি সচেতন হয়ে।

মনে হয় সে সময়ের বাইবেল পেন্টাটিউক অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্য অধ্যায়গুলি পৃথক গ্রন্থাকারে বর্তমান ছিল, পরবর্তীতে যেগুলি পেন্টাটিউকের সাথে জুড়ে দিয়ে বর্তমান হিব্রু বাইবেলের রূপ দেয়া হয়।

বিশ্ব সৃষ্টির বিবরণ, আদম-হাওয়া, মহাপ্লাবন যা দিয়ে বাইবেল আরম্ভ, তার সমান্তরালে প্রচলিত ছিল ব্যাবিলনীয় পুরাণ কথা; মনে হয় এসবের মধ্যে বিধৃত আছে সকল সেমিটিক জনগোষ্ঠীর সাধারণ বিশ্বাস। তাই মুসা আর স্যামসনের কাহিনীর মধ্যে সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় ধারার সমান্তরাল প্রবাহ। তবে আব্রাহামের কাহিনীর সাথে শুরু হলো প্রকৃত ইহুদি ধারা।

www.nagorikpathagar.org

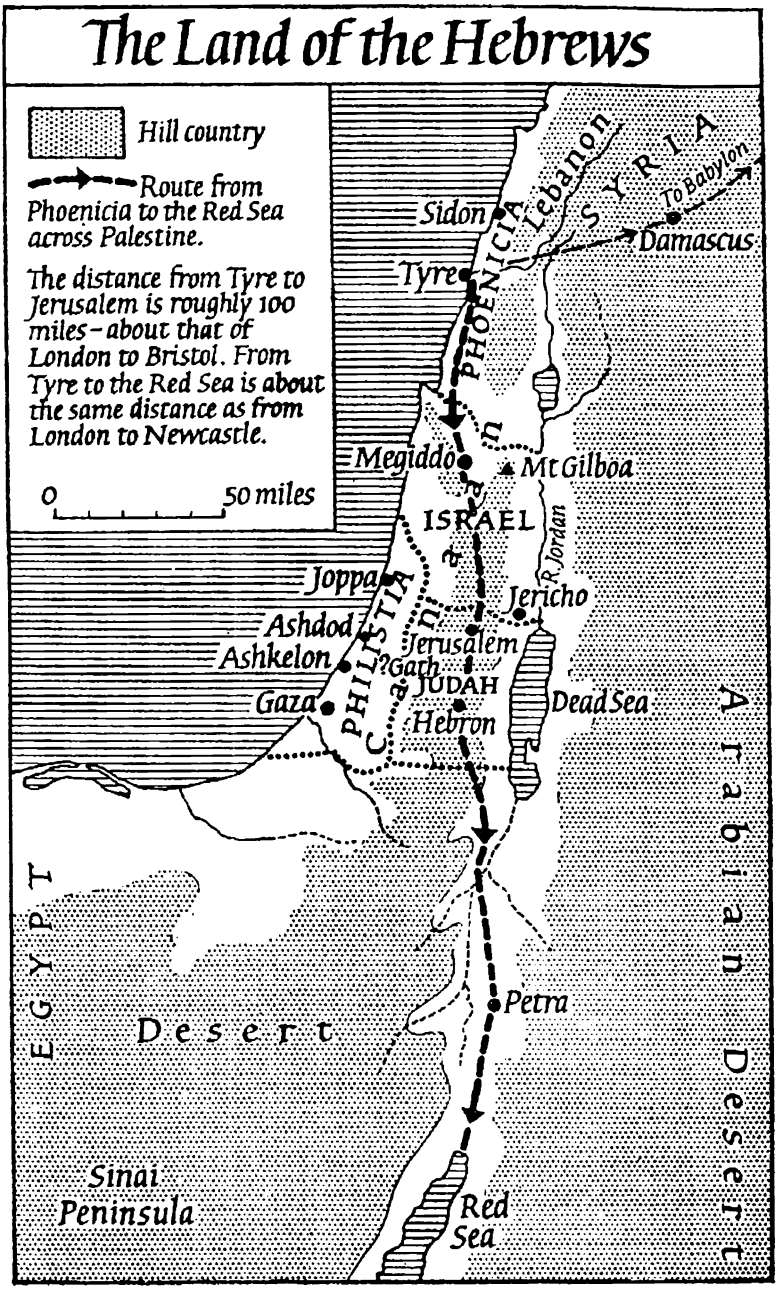

৫. হিব্রুদের আবাসভূমি

www.nagorikpathagar.org

আব্রাহাম সম্ভবত জীবিত ছিলেন ব্যাবিলনের হামুরাবির সময়ে। তিনি ছিলেন সেমিটিক পিতৃতান্ত্রিক যাযাবর। তাঁর ভ্রমণ এবং তার নাতি-নাতনীরা কীভাবে মিশরে বন্দি হয়েছিল তা জানার জন্য পাঠককে অবশ্য বুক অব জেনেসিসের কাছে যেতে হবে। তিনি কেনানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন আর ঈশ্বর তাদেরকে সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

মিশরে দীর্ঘ প্রবাস আর তার বংশধর মুসার নেতৃত্বে দীর্ঘ চল্লিশ বছর বারোটি জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে কেনান থেকে পূর্ব দিকে আরবের মরুভূমি পর্যন্ত বিশাল এলাকা আক্রমণ করে বসে। হয়তো তারা কাজটি করেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১৩০০ অব্দের মধ্যে। এই কাহিনীর সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য কোনো মিশরীয় দলিল পাওয়া যায়নি। তবে তারা পার্বত্য এলাকার বাইরে কোনো অঞ্চল দখল করতে পারেনি। উপকূলীয় অঞ্চল তখনও কেনানীয়দের দখলে ছিল না, বরং নবাগত ঈজিয়ান গোত্রের লোকদের অধিকার ছিল যাদেরকে বলা হয়েছে ফিলিস্তিন, আর তাদের নগরসমূহ গাজা, গাথ, আশদদ্, আস্কেলন আর যোপ্পা সাফল্যের সাথে হিব্রু আক্রমণ মোকাবেলা করেছিল। বহু প্রজন্মব্যাপী আব্রাহামের সন্তানদের অখ্যাত জাতি হিসেবে পার্বত্য পশ্চাদভূমিতে আবদ্ধ থেকে ফিলিস্তিন ও সমগোত্রীয় জাতি যেমন মোয়াবীয়, মিদিনীয়দের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকতে হয়। পাঠকরা বাইবেলের বিচারক অধ্যায়ে এসব যুদ্ধ ও বিপর্যয়ের কথা পাঠ করতে পারবেন। মোটামুটিভাবে এই অধ্যায়ে বিপর্যয় ও ব্যর্থতার কাহিনী অকপটে বিবৃত রয়েছে।

এই যুগের অধিকাংশ সময়ই হিব্রুরা আলগাভাবে শাসিত হয়েছে, জ্যেষ্ঠদের দ্বারা নির্বাচিত পুরোহিত বিচারকদের দ্বারা; অবশেষে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের দিকে তারা সল নামে এক রাজা নির্বাচন করে, যিনি তাদেরকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। তবে সলের নেতৃত্ব পুরোহিতদের নেতৃত্বের চেয়ে তেমন উন্নত ছিল না। মাউন্ট গিলবোয়ার যুদ্ধে তিনি ফিলিস্তিনিদের শরাঘাতে প্রাণ হারান, তার বর্ম ফিলিস্তিনিদের ভেনাসের মন্দিরে সংরক্ষণ করা হয় আর তার দেহ বেথ শান মন্দিরের দেয়ালের সাথে কিলক ঠুকে আটকে রাখা হয়।

তার উত্তরসূরি ডেভিড (দাউদ) অধিকতর সফল ও রাজনীতি জ্ঞানসমৃদ্ধ ছিলেন। ডেভিডের সময়কালই ছিল হিব্রু জাতির একমাত্র উন্নতির কাল। এর মূলে ছিল ফিনিশীয় নগর টায়ারের সাথে তার মিত্রতা যার শাসক ছিলেন বুদ্ধিমান ও উদ্যমী রাজা হিরাম। তার উদ্দেশ্য ছিল হিব্রুদের পার্বত্য এলাকার মধ্য দিয়ে লোহিত সাগরে যাওয়ার পথ। সাধারণত ফিনিশীয় বাণিজ্য সামগ্রী লোহিত সাগরে পৌঁছাত মিশরের মধ্য দিয়ে; তবে এ সময় মিশরে চলছিল চরম বিশৃঙ্খলা, এপথে ফিনিশীয়দের আরো প্রতিবন্ধকতা ছিল। যে কারণেই হোক হিরাম ডেভিড ও তার পুত্র সলোমনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। হিরামের উদ্যোগেই মাথা তুলেছিল জেরুজালেমের প্রাকার, প্রাসাদ আর মন্দির বিনিময়ে হিরাম লোহিত সাগরে তার নৌবহর গড়ে তুলেছিল। জেরুজালেমের মধ্য দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে বাণিজ্যের

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। আর সলোমনের প্রজাসাধারণ তাদের সম্রাটের অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য আর জৌলুস প্রত্যক্ষ করে। এমনকি ফারাও নিজেও তার এক কন্যাকে সলোমনের সাথে বিয়ে দেন।

তবে সব কিছুর একটা মাত্রা থাকা প্রয়োজন। গৌরবের শীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়েও সলোমন ক্ষুদ্র এক নগরীর ক্ষুদ্র রাজাই রয়ে যান। তার ক্ষমতা এতই ক্ষণস্থায়ী ছিল যে তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দ্বাবিংশ রাজবংশের প্রথম ফারাও শিশাক জেরুজালেম অধিকার করে তার সব, সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। বুক অব কিংস্ ও ক্রনিকলে সলোমনের যে জৌলুসের বিবরণ রয়েছে, অধিকাংশ সমালোচকই তা সন্দেহের চোখে দেখেন। তারা বলেন যে পরবর্তী লেখকরা দেশপ্রেমের আতিশয্যে সলোমনের ঐশ্বর্যের অতিরঞ্জন করেছেন। তবে প্রথম পাঠে বাইবেলের বিবরণ ততটা হতবিহ্বলকারী নয়। সলোমনের মন্দিরের ঠিকমতো মাপজোক নিলে তাকে শহরতলির যে কোনো গির্জার চেয়ে বড় মনে হবে না। আর তার চৌদ্দশত বর্ষ আমাদের চমক সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়, যখন দেখি তার উত্তরসূরি আহাব আসিরীয় বাহিনীতে ২০০০ রথ পাঠিয়েছিলেন। বাইবেলের বর্ণনায় আরো প্রমাণ হয় সলোমন তার সম্পদের প্রদর্শনী পছন্দ করতেন আর তার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে বেশি বেশি কর আদায় করতেন আর তাদের বেশি বেশি খাটিয়ে নিতেন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে রাজ্যের উত্তরাংশ জেরুজালেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসরায়েলের সাথে যুক্ত হয়। জেরুজালেম জুডার রাজধানী হিসেবে টিকে থাকে।

হিব্রু জনগণের সমৃদ্ধি ছিল ক্ষণস্থায়ী। হিরামের মৃত্যুর সাথে সাথে টায়ার থেকে জেরুজালেমকে শক্তি জোগানো বন্ধ হয়ে গেল। মিশর আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল। ইসরায়েলের রাজাদের ইতিহাস এবং জুডার রাজাদের ইতিহাস উত্তরে প্রথমে সিরিয়া, তারপর আসিরিয়া এবং অবশেষে ব্যাবিলন ও দক্ষিণে শক্তিশালী মিশরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাদের কাহিনী দুর্যোগ মোকাবেলা ও বিপদ বিলম্বিত করার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই গল্প বর্বর রাজাদের বর্বর জনগণকে শাসন করার গল্প। ৭২১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয় আক্রমণে তাদের অস্তিত্ব ইতিহাসের আবর্তে হারিয়ে যায়। জুডা অবশ্য ৬০৪ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যায় আর তারপর তারাও ইসরায়েলের ভাগ্যবরণ করে। বাইবেলে বিচারকদের আমল থেকে ইহুদি ইতিহাসের বর্ণনা সমালোচনামুক্ত নয়, তবে স্পষ্টতই এসব গল্পের সত্যতা মিলে পরবর্তীকালে মিশর আসিরিয়া ও ব্যাবিলনে খননকাজ চালানোর ফলে।

একমাত্র ব্যাবিলনেই হিব্রু জনগণ তাদের ইতিহাস সংহত এবং ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটাতে পেরেছিল। সাইরাসের নেতৃত্বে যে জনগণ জেরুজালেমে আগমন করেছিল তারা জ্ঞানে ও মনোবলে পূর্বজদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তারা সভ্যতা অর্জন করেছিল। তাদের মানসিকতা গঠনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি, যারা নবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, এখন যাদের প্রতি আমরা

www.nagorikpathagar.org

মনোযোগ সন্নিবেশ করব। এসব নবী মানব সমাজ বিনির্মাণে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন।

২২. জুডিয়ার পুরোহিত ও নবীগণ

আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের পতন সেমিটিক জনগণের বহুবিধ দুর্যোগের সূত্রপাত বলা যায়। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে মনে হয়েছিল সেমিটিক শাসকরাই বুঝি সমস্ত সভ্যজগৎ নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা শাসন করেছে বিশাল আসিরিয়া সাম্রাজ্য আর মিশর। আসিরিয়া ব্যাবিলন, সিরিয়া, সবার ভাষাই ছিল সেমিটিক গোত্রের এবং তারা পরস্পরের ভাষা বুঝত। সেমিটিকদের হাতেই ছিল সারা বিশ্বের বাণিজ্য। টায়ার ও সিডন যা ছিল ফিনিশীয় উপকূলের প্রাচীন বাণিজ্য নগরী যার কলোনি বিস্তৃত ছিল স্পেন, সিসিলি ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অবতলে। ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত কার্থেজ নগরের লোকসংখ্যা ছিল দশ লাখের ওপরে। বেশ কিছু সময়ের জন্য এটাই ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নগরী। এখান থেকে জাহাজ চলাচল করত ব্রিটেন ও আটলান্টিক মহাসাগরে। সম্ভবত এগুলি মেডেইরা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি হিরাম জাহাজ তৈরি করেছিলেন, যার মাধ্যমে আরব এমনকি ভারতের সাথে বাণিজ্য করত। ফারাও নেকোর রাজত্বকালে একটা নৌবহর সমগ্র আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আর্য জাতির লোকেরা তখন পর্যন্ত বর্বর ছিল। শুধু গ্রিকরাই তাদের ধ্বংস করা সভ্যতার ওপর এক নতুন সভ্যতা গড়ে তুলছিল। আর মেডিসরা মধ্য এশিয়ায় দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছিল, যেমনটা আমরা জানতে পারি একটা আসিরীয় লিপি থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে কেউ কল্পনাও করেনি যে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের মধ্যে আর্য ভাষী জনগণের দ্বারা সেমিটিক আধিপত্যের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যাবে, আর সর্বত্রই সেমিটিকরা প্রজা বা করদ বা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তবে একমাত্র উত্তর আরবের মরু অঞ্চলেই বেদুইনরা যাযাবর জীবনধারা গ্রহণ করে, আর এই সেমিটিক ধারাতেই প্রথম সার্গন আর তার আক্কাদীয় জনগোষ্ঠী সুমেরিয়া জয় করে। তবে আরবের বেদুইনরা কখনই আর্যদের দ্বারা বিজিত হয়নি।

ঘটনাবহুল এই পাঁচ শতাব্দীতে যেসব সেমিটিক জনগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েছিল, তার মধ্যে শুধু একটিমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্য টিকে রেখেছিল, তারা ছিল এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, ইহুদি সম্প্রদায়, পারসিক সাইরাস যাদেরকে জেরুজালেম পুনর্গঠনের জন্য ফিরে পাঠিয়েছিলেন। আর তারা এটা করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ ব্যাবিলনে সংগৃহীত তাদের সমৃদ্ধ সাহিত্য বাইবেল তারা সঙ্গে করে এনেছিল। ইহুদিরা যতটা না বাইবেল বিনির্মাণ করেছিল তার চেয়ে বেশি বাইবেল করেছিল ইহুদি বিনির্মাণ। বাইবেলের মধ্যে যে ধ্যানধারণা নিহিত তা আশপাশের অন্য

www.nagorikpathagar.org

জনগোষ্ঠীর চেয়ে আলাদা যা পাঁচ সহস্রাব্দিব্যাপী কঠোরতা, দুঃসাহসিকতা ও উৎপীড়ন সহ্য করার মনোবল জুগিয়েছিল। সবচেয়ে অগ্রসর ইহুদি চিন্তাধারা হলো তাদের ঈশ্বরকে নিয়ে যিনি অদৃশ্য এবং বহুদূরে যার বাস। ন্যায়ের প্রতিভূ সেই প্রভু মানুষের হাতে তৈরি মন্দিরস্থিত কোনো দেবতা হতে পারে না। অন্য সব জাতির ঈশ্বরই মন্দিরে স্থিত কোনো মূর্তি। যদি সেই মূর্তি ভেঙে ফেলা হয় বা মন্দির ধ্বংস হয়, তাহলে সেই দেবতারও মৃত্যু হয়। তবে ইহুদিদের এই ঈশ্বরের ধারণা সম্পূর্ণ নতুন যিনি পুরোহিত ও পশুবলির অনেক ঊর্ধ্বে স্বর্গে বাস করেন। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে আব্রাহামের এই ঈশ্বর নির্বাচিত জাতি হিসেবে জেরুজালেমকে ন্যায়ের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ব্যাবিলনে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসতে পেরে তাদের এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।

এটা কি কোনো অলৌকিক ব্যাপার যে একই ভাষাভাষী আর প্রথা, স্বভাব, রুচি ও ঐতিহ্যে সমভাগি ব্যাবিলনীয়, সিরীয় ও পরবর্তীকালে ফিনিশীয় গোষ্ঠীর লোকেরা একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ধর্মমত ও প্রত্যাশায় বলীয়ান হবে? টায়ার সিডন, কার্থেজ আর স্পেনিশ ফিনিশীয় নগরের পতনের পর হঠাৎ করেই ফিনিশীয়রা যেন ইতিহাস থেকে উবে গেল; আর শুধু জেরুজালেম নয়, স্পেন, আফ্রিকা, মিশর, আরব ও প্রাচ্য দেশেও ইহুদিরা শক্ত অবস্থান নিলো। বাইবেলের পাঠই তাদের সংগঠিত করেছিল। জেরুজালেম তাদের রাজধানী হলেও সত্যিকারের রাজধানী ছিল এই মহাগ্রন্থ। ইতিহাসে এটা এক অভিনব ব্যাপার। এর বীজ বপন হয়েছিল বহুপূর্বে যখন সুমেরীয় ও মিশরীয়রা হিয়ারোগ্লিফিক্সে তাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছিল। ইহুদিরা ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল যাদের কোন মন্দির ছিল না (৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমের পতনের সময় যেমনটা লক্ষ করা গেছে) লিপিবদ্ধ বাণীর মহাশক্তিতেই তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল।

ইহুদিদের এই মানসিক ঝালাই কাজ না ছিল পরিকল্পিত বা পূর্ব অনুমিত, না ছিল কোনো পুরোহিত বা রাজনীতিবিদের কর্মকাণ্ড। ইতিহাসে ইহুদিদের উত্থান শুধু যে এক নতুন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় তা-ই নয়, এক নতুন মানসিকতারও সূচনা। সলোমনের সময় ইহুদিরা ছিল ছোট্ট এক জনগোষ্ঠী ছোট্ট এক নগরে পুঞ্জিভূত, সে সময়কার অন্যান্য জাতির মতো পুরোহিতের বিজ্ঞতায় শাসিত আর নৃপতিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত। আর এই নতুন মানবের অগ্রপথিক ছিলেন স্বয়ং পয়গম্বর।

পরবর্তীকালে বিভক্তিজনিত কারণে যখন ইহুদিদের মধ্যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে, তখনই পয়গম্বরদের গুরুত্বও বেড়ে যায়।

এই পয়গম্বররা কী? নানাভাবে তাদের আবির্ভাব। দৈবজ্ঞ ইজেকিয়েল ছিলেন পুরোহিত সম্প্রদায়ের, আর প্রফেট আমোস ছিলেন ছাগচর্ম পরিহিত মেষপালক তবে তারা সকলেই ছিলেন একেশ্বরবাদী আর জনগণের মধ্যে সরাসরি বক্তব্য রাখতেন। তারা নবী হয়ে জন্মেন না বা তাদের পবিত্রীকরণেরও প্রয়োজন হয় না। তাদের ফর্মুলা হলো: 'আমার মাঝে প্রভুর বাণীর আগমন ঘটেছে, তাদের মধ্যে ছিল

www.nagorikpathagar.org

তীক্ষ্ণ রাজনীতিবোধ। তারা মিশর, আসিরীয়া অথবা ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে জনগণকে উজ্জীবিত করতেন; তারা পুরোহিতদের অলসতা আর রাজাদের পাপের নিন্দা করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনোনিবেশ করেছিলেন, আমরা যাকে বলি 'সমাজ সংস্কার'। ধনীরা দরিদ্রদের মুখমণ্ডল চূর্ণ করছে, বিলাসীরা শিশুদের রুটি ছিনিয়ে নিচ্ছে, বিত্তশালীরা বিদেশীদের সাথে মিত্রতা করে তাদের জাঁকজমক আর দুষ্কর্মের অনুকরণ করছে। এসবই আব্রাহামের প্রভু জেহোভার অপছন্দ আর নিশ্চয়ই এই দেশকে শায়েস্তা করবেন।

এসব তর্জন-গর্জন লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হয় আর পাঠ করা হয়। ইহুদিরা এক নতুন মতবাদ প্রচার করে। তারা সাধারণ জনগণকে পুরোহিত আর মন্দির থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, সরিয়ে নেয় রাজা আর রাজদরবার থেকে, তাদের পরিচালিত করে ন্যায় ও সত্যের অভিমুখে। মানব ইতিহাসে এখানেই তাদের গুরুত্ব। ইসাইয়া নবীর মহান উচ্চারণ জাতিকে নিয়ে যায় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আর এক ঈশ্বরের ছত্রছায়ার সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে। এখানেই ইহুদি নবীদের ঐশীবাণীর উৎকর্ষ।

সব নবী একই ধারায় কথা বলেননি, আর বুদ্ধিমান পাঠকরা ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে অনেক ঘৃণা লক্ষ করবেন, দেখবেন অনেক কুসংস্কার, বর্তমান সাহিত্যের মতো অনেক অপপ্রচার। তথাপি ব্যাবিলনীয় বন্দিত্বের সময়কার হিব্রু নবীরা পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির সূচনা করে, আর তা হলো অন্ধ কুসংস্কার আর নরবলির মতো কুনিয়ম, ব্যক্তিত্বহীন আনুগত্য-মুক্ত ব্যক্তির জাগরণ।

২৩. গ্রিকদের উত্থান

সলোমনের রাজত্বের অবসানে (আনুমানিক ৯৬০ খ্রিষ্টপূর্ব) যখন ইসরায়েল ও জুডাহ্ ভেঙে পড়ছিল, আর ইহুদি জনগণ ব্যাবিলনে বন্দি দশায় তাদের ঐতিহ্য গড়ে তুলছিল, তখন আর এক মহাশক্তি গ্রিকদের অভ্যুত্থান ঘটছিল। যখন ইহুদি নবীরা মানবজাতি ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের মধ্যে নৈতিক দায়বোধের ঐতিহ্য গড়ে তুলছিল, তখন গ্রিক দার্শনিকরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মাত্রায় বুদ্ধিনির্ভর মানব মনের পরিশীলনের বিকাশ ঘটাচ্ছিল।

আমরা বলেছি গ্রিকরা ছিল আর্য ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের এক শাখা। তারা ঈজিয়ান নগরসমূহ ও দ্বীপসমূহে এসে পড়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে। বিজিত ইউফ্রেতিস অঞ্চলে ফারাও থুতমেসের হস্তি শিকারের পূর্বেই গ্রিকরা তাদের দক্ষিণের অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল। কারণ সেসব দিনে মেসোপটেমিয়ায় ছিল হাতি আর গ্রিসে ছিল সিংহ।

www.nagorikpathagar.org

সম্ভবত গ্রিক আক্রমণেই নসোস ভস্মীভূত হয়, তবে গ্রিক পুরাণে এ ধরনের কোনো অভিযানের কথা নেই, যদিও মিনোসের প্রাসাদ (গোলকধাঁধা) এবং ক্রীটের শিল্পীদের কুশলতার কথা আছে

অধিকাংশ আর্যদের মতোই গ্রিকদের ছিল কবি আর গায়ক যার যোগসূত্র পাওয়া যায় তাদের বর্বর যুগের দুই মহাকাব্য ইলিয়াড, যাতে বর্ণনা আছে কীভাবে এক গ্রিক সম্প্রদায় এশিয়া মাইনরে ট্রয় নগরী আক্রমণ করে ধ্বংস করে, আর অডিসি যাতে বর্ণনা রয়েছে ঋষিতুল্য এক মহাবীর অডিসিউসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। এই মহাকাব্যগুলি লেখা হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম বা সপ্তম শতকে যখন গ্রিকরা তাদের বর্ণমালা আয়ত্ত করতে পেরেছিল তাদের অধিকতর সভ্য প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। ইতিপূর্বে মনে করা হত এসব মহাকাব্যের রচয়িতা ছিলেন এক অন্ধ কবি হোমার, ঠিক যেমন অন্ধ কবি মিল্টন লিখেছিলেন তার বিখ্যাত মহাকাব্য *প্যারাডাইস লস্ট*। সত্যিই কি এমন কোনো কবি ছিলেন যিনি এসব বৃহৎ কাব্য রচনা করেছিলেন নাকি আগের লেখা কোনো কাব্যের মসৃণতা সম্পাদন করেছিলেন, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এসব বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছা বা প্রয়োজন কোনোটাই নেই। যে বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো অষ্টম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিকদের অধিকারে এসব মহাকাব্য ছিল। এই মহাকাব্যগুলিই গ্রিসের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বন্ধনসূত্র হিসেবে কাজ করত, এবং অন্যান্য বর্বর জাতিসমূহের সাথে তাদের পার্থক্য সূচিত করত। তারা বেশ কিছু গোত্রভুক্ত লোক একতাবদ্ধ হতে পেরেছিল প্রথমে কথ্য ও পরে লিখিত সাধারণ ভাষার বদৌলতে, আর তাদের ছিল একই ধরনের সাহস ও আচরণগত আদর্শ।

মহাকাব্যে গ্রিকদের দেখানো হয়েছে বর্বরজাতি হিসেবে যাদের লোহার ব্যবহার জানা ছিল না, লিপিও ছিল না, নগরেও বাস করত না। তারা বাস করত উন্মুক্ত গ্রামে কুড়েঘরে তাদের দ্বারা ধ্বংসকৃত ঈজিয়ানদের নগরের পাশে। তারপর তারা শুরু করে নগরের চারপাশে দেয়াল তোলার আর বিজিত জাতির অনুকরণে দেবতার মন্দির নির্মাণের। বলা হয়ে থাকে যে প্রাচীন সভ্যতার নগর গড়ে ওঠে কোনো উপজাতীয় দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে তারপর দেয়াল ওঠে, তবে গ্রিকদের ক্ষেত্রে আগে দেয়াল পরে মন্দির। তাদের বিভিন্ন কলোনি ছিল, যার সাথে তারা বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের দিকে অনেকগুলি নগর গড়ে উঠেছিল গ্রিসের উপত্যকা ও দ্বীপসমূহে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থিবিস, সামোস, মিলেটুস। ইতিমধ্যে কৃষ্ণসাগরের উপকূল, ইতালি ও সিসিলিতে গ্রিক বসতি গড়ে উঠেছিল। ইতালির পা এবং পদাঙ্গুলিকে বলে "ম্যাগনা গ্রেসিয়া" মার্সেলিস ছিল এক গ্রিক শহর, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পূর্বতন ফিনিশীয় কলোনিতে।

আজকাল যেসব দেশ বিশাল সমভূমি, যার ওপর দিয়ে ইউফ্রেতিস বা নীলের মতো নৌপরিবহনযোগ্য নদনদী প্রবাহিত, সেগুলি একই শাসকের অধীনে ঐক্যবদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

হতে পেরেছিল। মিশরের নগর ও সুমেরিয়ার নগরসমূহে একই ধারার শাসনব্যবস্থা ছিল। তবে গ্রিকরা দ্বীপ আর পর্বতের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিলঃ গ্রিস আর ম্যাগনা গ্রেসিয়া উভয়েই ছিল পার্বত্য এলাকা। ইতিহাসে যখন গ্রিকদের প্রবেশ ঘটে, তখন তারা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল যাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। জাতিগত দিক থেকেও তারা ছিল পৃথক। তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন গ্রিক গোত্রের যেমন আয়োনিক, ইয়েলিয়ান বা ডরিক। কোনো কোনোটা ছিল গ্রিক আর গ্রিক-পূর্বদের মিশ্রণ, ভূমধ্যসাগরীয় জাতিগোষ্ঠী। আবার কেউ ছিল অবিমিশ্র গ্রিক, যারা বিজিতদের কৃতদাস করে রেখেছিল যেমন স্পার্টার হিলটস্‌রা। কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় আর্যরা নিজেদের অভিজাত মনে করত। কোনো কোনো রাজ্যে ছিল সমগ্র নাগরিক সমন্বয়ে গণতন্ত্র; আবার কোথাও কোথাও ছিল নির্বাচিত শাসক এমনকি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র; কোথাও আবার দখলদার উৎপীড়ক। যেসব ভৌগোলিক কারণ গ্রিকদের পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত রেখেছিল, সেই একই কারণ রাষ্ট্রসমূহকে ক্ষুদ্র করেও রেখেছিল। সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রগুলি ইংলিশ কাউন্টির চেয়েও ছোট ছিল; আর কোনো রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা তিন লাখ অতিক্রম করেছিল কি না তাতে সন্দেহ রয়েছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার অতিক্রম করতে পারেনি। তাদের স্বার্থের সাদৃশ্য এমনকি সহানুভূতিও ছিল, তবে একাত্মতা ছিল না। নগরগুলির মধ্যে সংঘ ও মৈত্রী গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে আর ক্ষুদ্র সমগ্র গ্রিস দুটি ব্যাপারের ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকতে পেরেছিলঃ তার একটা হলো মহাকাব্য আর অন্যটি হলো চার বছর অন্তর অন্তর একত্রে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। তবে এতে করে তাদের মধ্যে যুদ্ধবিবাদ পুরোপুরি দূর করতে পারেনি, তবে যুদ্ধের নির্মমতা অনেকটাই হ্রাস করতে পেরেছিল, আর খেলার সময় সাময়িক শান্তি নিশ্চিত থাকত। সময়ের সাথে সাথে তাদের মধ্যে সাধারণ অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে শুধুমাত্র গ্রিক নগর রাষ্ট্রই নয়, গ্রিসের বাইরে এপিরাস ও মেসিডোনিয়াও অলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশ নেয়।

ধীরে ধীরে গ্রিক রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে; অষ্টম ও সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে তাদের সভ্যতার গুণগতমান উচ্চতর মার্গে পৌঁছে যায়। তাদের সামাজিক জীবন ঈজিয়ান ও নদী উপত্যকার সভ্যতার মাঝে বহু চিত্তাকর্ষক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের নেতা ছিল, ছিল অভিজাত পরিবার তবে তাদের ছিল না সুসংগঠিত পরিষদ পরিবৃত অর্ধ ঐশ্বরিক রাজা। বরং তাদের ছিল নেতৃস্থানীয় অভিজাত পরিবার যারা পরস্পরের কর্তৃত্বকে সীমিত রাখত। এমনকি তাদের তথাকথিত গণতন্ত্রও ছিল আসলে অভিজাততন্ত্র। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিক সরকারি কাজে অংশ নিত আর গণপরিষদে যোগ দিত, তবে প্রত্যেকে নাগরিক ছিল না। গ্রিক গণতন্ত্র আধুনিক গণতন্ত্রের মতো ছিল না যেখানে প্রত্যেকের ভোটাধিকার আছে। গ্রিসের অনেক গণতন্ত্রেই নাগরিকের সংখ্যা ছিল কয়েকশ বা কয়েক হাজার আর সেখানে কৃতদাস বা দাসত্বমুক্ত জনগণের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার যারা,

www.nagorikpathagar.org

সরকারি কাজে অংশ নিতে পারত না, সাধারণত গ্রিসে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত থাকত। তাদের রাজা বা স্বৈরশাসক তাদের মতোই মানুষ ছিল যারা নেতৃত্ব কব্জা করতে পারে। তারা ফারাও, মিনোস বা মেসোপটেমিয়ার রাজাদের মতো স্বর্গীয় অভিভাবক ছিল না। কাজেই চিন্তা ও প্রশাসন উভয় দিক দিয়েই ছিল স্বাধীন, ইতিপূর্বে প্রাচীন সভ্যতায় যা কখনোই দেখা যায় নি। গ্রিকরা নগররাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার আমদানি করেছিল। ইতিহাসে তারাই প্রজাতন্ত্রের ধারণা নিয়ে আসে। যেহেতু তারা বর্বর যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তাই তাদের বৌদ্ধিক জীবনে নতুন মাত্রা দেখতে পাই। আমরা দেখি যে পুরোহিতরা আর জীবনের অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত নেই, এ পর্যন্ত যেটা পুরোহিতদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আত্মপ্রসাদ ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, যখন ইসাইয়া ব্যাবিলনে ভবিষ্যদ্বাণী করত, তখন আমরা দেখতে পাই মিলেটুসে থেলিস ও এ্যানাক্সিম্যান্ডার এবং এফিসিউস হেরাক্লিটাসের মতো মানুষ যারা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন। তাদের প্রশ্ন ছিল জীবনের বাস্তব প্রকৃতি কী, কোথা হতেই বা তা এলো, তার প্রকৃত গন্তব্যই বা কী? তারা সব রকমের মনগড়া এড়িয়ে চলা উত্তর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এসব মহান গ্রিক চিন্তাবিদের কথা পরে আমরা আরো বলব। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের এসব চিন্তাবিদ ছিল আদি গ্রিক দার্শনিক, পৃথিবীর আদি জ্ঞানপিপাসু। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন মানব ইতিহাসে এই খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক কতটা গুরুত্ব বহন করে। কারণ এই গ্রিক দার্শনিকরা বিশ্ব এবং তাতে মানুষের অবস্থান নিয়েই শুধু চিন্তা করেছেন তাই নয়, একই সময়ে ইসাইয়া তার মহান ভবিষ্যদ্বাণী আর ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ এবং চীনে কনফুসিয়াস ও লাউৎসে তাদের মহান শিক্ষা প্রচার করে চলেছেন। এথেন্স থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, মানব মনে চলেছে মহা উথালপাতাল।

২৪. গ্রিক ও পারসিকদের মধ্যে যুদ্ধ

যে সময় গ্রিকরা গ্রিসের নগররাষ্ট্র, ইতালি ও এশিয়া মাইনরে স্বাধীন চিন্তার চর্চা করে চলেছে, আর যখন বেবিলন আর জেরুজালেমে হিব্রু নবীরা মানুষের বিবেক জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় রত, ঠিক সেই সময়ে দুটি আর্য জাতি মেডিস ও পারসিকরা প্রাচীন সভ্যজগৎ অধিকার করে এক মহান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত, যা এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্য। সাইরাসের অধীনে বেবিলন এবং প্রাচীন সভ্যতা লিডিয়া পারস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। লেভান্তের ফিনিশীয় নগরসমূহ আর এশিয়া মাইনরের গ্রিক নগরীসমূহ করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ক্যাম্বিস পদানত করেছিল মিশরকে আর পারস্যের তৃতীয় সম্রাট মেডীয় বংশের প্রথম

www.nagorikpathagar.org

দারায়ুসকে সারা পৃথিবী পারস্যের সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিল আর তার অশ্বারোহী বার্তাবাহকরা তার ফরমান বহন করে নিয়েছিল দার্দানেলিস থেকে সিন্ধু নদ আর উত্তরে মিশর থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত।

এটা সত্যি যে গ্রিকদের অধীনে ইতালি, কার্থেজ, সিসিলি ও স্পেনীয় ফিনিশীয় বসতিসমূহ পারসিক সন্ধিসূত্র মেনে নেয়নি। তবে তারাও সম্রাটকে সম্মানের সাথে দেখত, আর দক্ষিণ রাশিয়ার নর্ডিক আর মধ্য এশিয়ার সিথিয়ানরাই একমাত্র জাতি যারা তাদের যন্ত্রণা দিতে পেরেছিল।

তবে এই বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসী মোটেই পারসিক ছিল না। পারসিকরা ছিল সংখ্যাল্প বিজয়ী। সংখ্যাগুরুরা ছিল ঐ এলাকার স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাসকারী অন্যান্য জাতি। ইতিবাচক হলো পারশী ছিল প্রশাসনিক ভাষা। বাণিজ্য ও অর্থনীতি ছিল মূলত সেমিটিক ধারার। টায়ার ও সিডন আগের মতোই ছিল প্রধান ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য বন্দর, আর সেমিটিক নৌকাই চলাচল করত সমুদ্রে। তবে এসব সেমিটিক বণিক ও ব্যবসায়ীরা যারা দূর-দূরান্তে চলাচল করত তারা হিব্রু ঐতিহ্য ও হিব্রু শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যেই সহানুভূতি ও সুবিধা খুঁজে পেত। সাম্রাজ্যের মধ্যে নতুন যে উপাদানটি বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা হলো গ্রিক উপাদান। গ্রিকরা সমুদ্রে সেমিটিকদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তাদের বিচ্ছিন্ন ও বলিষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা তাদেরকে প্রয়োজনীয় ও সংস্কারমুক্ত কর্মচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।

সিথিয়ানদের কারণেই প্রথম দারায়ুস ইউরোপ আক্রমণ করেছিলেন। তিনি পৌঁছতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ রাশিয়ায়, যা ছিল সিথিয়ান অশ্বারোহীদের আবাসভূমি। তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বস্ফোরাস প্রণালী পার হয়ে বুলগেরিয়ার ওপর দিয়ে দানিয়ুবে পৌঁছেন। নৌকার সাঁকো বানিয়ে দানিয়ুব পার হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। তাঁর সৈন্যবাহিনী দারুণ মার খায়। তাঁর বাহিনী ছিল পদাতিক আর সিথিয়ান অশ্বারোহীরা সহজেই তাদের ঘিরে ফেলে, তাদের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারা কখনই সম্মুখ যুদ্ধে আসত না। বিচ্ছিন্ন কাউকে পেলেই মেরে ফেলত। শেষ পর্যন্ত দারায়ুস অবমাননাকর পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়েছিলেন।

তিনি সুসায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তবে থ্রেস ও মেসিডোনিয়ায় তার বাহিনী রেখে এলেন, আর মেসিডোনিয়া তার অধীনতা মেনে নিয়েছিল। এশিয়ার গ্রিক নগরসমূহের বিদ্রোহই তার ব্যর্থতার কারণ ছিল, সে কারণেই ইউরোপীয় গ্রিকরাও প্রতিদ্বিতায় নামতে বাধ্য হয়েছিল। দারায়ুসের সংকল্প ছিল ইউরোপীয় গ্রিকদের পদানত করার। ফিনিশীয় নৌবহর তাঁর করায়ত্ত থাকায় একের পর এক দ্বীপ দখল করা সহজ হয়েছিল; অবশেষে ৪৯০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি এথেন্স আক্রমণ করে বসেন। পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্মাডা এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে যাত্রা শুরু করে, আর এই অভিযানের বাহিনী এথেন্সের উত্তরে ম্যারাথনে অবতরণ করে। সেখানে গ্রিকরা তাদের মোকাবেলা করে হারিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

এই সময় একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। গ্রিসে স্পার্টানরা ছিল এথেন্সের তিক্ততম শত্রু, তবে এথেন্স একজন দ্রুতগামী বার্তাবাহককে পাঠিয়ে স্পার্টানদের কাছে আবেদন করে যেন তারা গ্রিকদের বর্বরদের কৃতদাসে পরিণত হতে না দেন। এই বার্তাবাহক, যাকে ম্যারাথন দৌড়ের আদর্শ মনে করা হয় সে মাত্র দুই দিন দুই রাতে একশ মাইলের পার্বত্য এবড়োথেবড়ো পথ অতিক্রম করে। স্পার্টানরা দ্রুততার সাথে ও উদারভাবে সাড়া দেয়, তবে তৃতীয় দিনে স্পার্টান বাহিনী যখন ম্যারাথনের ময়দানে পৌঁছায় তখন শূন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পারসিকদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদের দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। এভাবেই শেষ হলো পারসিকদের প্রথম গ্রিস আক্রমণ, পরেরটি ছিল আরো বেশি চিত্তাকর্ষক। ম্যারাথন যুদ্ধে পরাজয়ের খবর পৌঁছার কিছুদিনের মধ্যেই দারায়ুসের মৃত্যু ঘটে। আর পরবর্তী চার বছর ধরে তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী জারেক্সেস গ্রিকদের ধ্বংস করার জন্য বিশাল এক বাহিনী গড়ে তোলেন। কিছু সময়ের জন্য আতংকে গ্রিকবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়। এ যাবৎ পৃথিবীতে যত সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়েছে, তার মধ্যে জারেক্সেসের বাহিনী ছিল সর্ববৃহৎ। এটা ছিল বহুধাবিভক্ত জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ সমাবেশ। ৪৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই বাহিনী নৌকার সাঁকো বানিয়ে দার্দানেলিস প্রণালী পার হয়; আর উপকূল বরাবর নানারকমের জলযান রসদ বয়ে নিয়ে চলে। থার্মোপাইলির সংকীর্ণ গিরিসংকটে লিওনিডাসের ১৪০০ সৈন্যের এক ক্ষুদ্রবাহিনী বিশাল পারসিক বাহিনীর গতিরোধ করে। অতুলনীয় বিক্রমে যুদ্ধ করে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিহত হয়। তবে পারসিক বাহিনীর যে ক্ষতি করে তাও নগণ্য ছিল না, আর পরে জারেক্সেসের পারসিক বাহিনী থিবিস ও এথেন্সের ওপর হামলে পড়ে এদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে। থিবিস* পরাজয় মেনে নিয়ে সন্ধি করে। এথেনীয়রা তাদের নগর পরিত্যাগ করে চলে যায় আর একে ভস্মীভূত করে ফেলা হয়।

মনে হলো গ্রিস সম্পূর্ণরূপে বিজয়ীদের কব্জায় এসে গিয়েছিল, তবে বিরূপ অবস্থা ও বিধ্বস্ত প্রত্যাশার মধ্যেও বিজয় এসেছিল। গ্রিক নৌবহর, যা আকারে পারসিকদের এক তৃতীয়াংশও ছিল না, সালামিসের যুদ্ধে পারস্য বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেয়। জারেক্সেস ও তার বিশাল বাহিনীর সরবরাহ লাইন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আর তার মনোবল সম্পূর্ণরূপে ধসে গেল। অর্ধেকে পরিণত হওয়া বাহিনী নিয়ে তিনি এশিয়ায় ফিরে এলেন। পেছনে ফেলে আসা পারস্যভীতির সমাপ্তি ঘটল। এশিয়ার অধিকাংশ গ্রিক নগরী স্বাধীন হয়ে গেল। এসব ঘটনাই সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে পৃথিবীর প্রথম লিখিত ইতিহাস হেরোডোটাসের গ্রন্থে। হেরোডোটাসের জন্ম আনুমানিক ৪৮৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরের আয়োনীয় নগর হেলিকার্নেসাসে আর সঠিক তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় তিনি ব্যাবিলন ও মিশর পর্যটনে গিয়েছিলেন। মিকেল থেকে পারস্য পর্যন্ত বংশগত গোলযোগ চলছিল। ৪৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে জারেক্সেসকে খুন করা হয়

---

* এটা একটা গ্রিক নগরী, একই নামে মিশরীয় নগরের সাথে একে মিলিয়ে ফেলা চলবে না। অবশিষ্ট পারসিক বাহিনী এশিয়া মাইনরের মিকেলের যুদ্ধে নৌবহরসহ গ্রিকদের দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

এবং তারপরই মিশর সিরিয়া ও মিডিয়াতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায় আর স্বল্পস্থায়ী বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। হেরোডোটাস পারস্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার দিকগুলি তুলে ধরেন, হেরোডোটাসের ইতিহাসকে যে প্রপাগান্ডা বলা হয়, তা অনেকটাই ছিল সত্যি, আর সে প্রপাগান্ডার উদ্দেশ্য ছিল পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রিকদের ঐক্যবদ্ধ করা। হেরোডোটাস এরিস্টাগোরাস নামে এক চরিত্র সৃষ্টি করেন যিনি তৎকালীন পরিচিত পৃথিবীর একটা মানচিত্র নিয়ে গ্রিকদের কাছে গিয়ে বলেন :

"এসব বর্বররা যুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট শৌর্যবান নয়। অপরপক্ষে তোমরা যুদ্ধজয় করার জন্য যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করেছ; তোমরা যা অর্জন করেছ তা পৃথিবীর কোনো জাতির কাছেই নেই। তোমাদের রয়েছে সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জ নকশাকাটা পোশাক, পশু ও কৃতদাস, ইচ্ছা করলে এসবই তোমাদের আয়ত্তে থাকতে পারে।"

২৫. গ্রিসের জাঁকজমক

পারসিকদের পরাজয়ের পরবর্তী দেড় শতাব্দী ছিল গ্রিক সভ্যতার সবচেয়ে গৌরবময় সময়। এ কথা সত্যি এথেন্স ও স্পার্টার আধিপত্য লাভের যুদ্ধে গ্রিস ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল (৪৩১-৪০৪ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং ৩৩৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মেসিডোনিয়ানরা গ্রিসের আধিপত্য নিয়ে নেয়, তবু এ যুগের গ্রিক চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা, শৈল্পিক চেতনা সব মিলিয়ে পরবর্তী ইতিহাসে আলোকবর্তিকারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আর এই মানসিক বিকাশের কেন্দ্রে ছিল এথেন্স। ত্রিশ বছরের বেশি ধরে (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৬-৪২৮) যে ব্যক্তিটি তেজস্বিতা ও স্বাধীন চেতনার প্রতীক হয়ে ছিলেন তিনি পেরিক্লেস, যিনি পারসিকদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা গ্রিসকে পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আজও গ্রিসে যে সৌন্দর্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তা এই প্রচেষ্টারই অবশেষ। আর তিনি শুধু বৈষয়িক এথেন্স নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হননি, আধ্যাত্মিক এথেন্সের নির্মাতাও তিনি। তিনি তাঁর চারপাশে শুধু স্থপতি আর ভাস্করদেরই জমায়েত করেছিলেন তা-ই নয়, তাঁকে পরিবৃত করেছিল কবি, নাট্যকার, দার্শনিক আর শিক্ষকরা। হেরোডোটাস এথেন্স এসেছিলেন তাঁর ইতিহাস পড়িয়ে শোনাবার জন্য (৪৩৮ খ্রিষ্টপূর্ব)। অ্যানাক্সাগোরাস এসেছিলেন সূর্য ও তারকাসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে। এস্কিলাস, সফোক্লেস আর ইউরিপিডিস একের পর এক এসেছিলেন সৌন্দর্য ও মহত্বের নতুন শেখরে গ্রিক নাটককে পৌঁছে দিতে।

পেরিক্লেস এথেন্সের বৌদ্ধিক ও মনোজগতে যে উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরও সেই ধারা বহাল ছিল, যদিও ইতিমধ্যে প্রাধান্য লাভের পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধও শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাজনীতির আকাশে কালো-ছায়া বিস্তার করলেও মনের আলো নিভিয়ে দিতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

পেরিক্লেসের বেশ আগে থেকেই স্বাধীন গ্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আলাপ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাজার বা পুরোহিতের হাতে ন্যস্ত ছিল না, সে দায়িত্ব ও যুক্তি উপস্থাপনার সক্ষমতা সর্বজনগ্রাহ্য গুণ হিসেবে গৃহীত হত, আর এরই প্রেক্ষিতে আবির্ভাব ঘটে এক শিক্ষক শ্রেণীর; যাদের বলা হত সফিস্ট, যাদের দায়িত্ব ছিল যুবসম্প্রদায়কে যুক্তিপ্রবণ করে গড়ে তোলা, কিন্তু বাস্তব ভিত্তি ছাড়া মানুষ যুক্তি দিতে পারে না, আর জ্ঞান অনুসরণ করে বাচন ক্ষমতার ওপর। এসব জ্ঞানভিক্ষুদের কার্যকলাপ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানুষকে পরিচালিত করে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ, চিন্তনপদ্ধতি ও তর্কের সিদ্ধতার দিকে। পেরিক্লেসের মৃত্যুর পর একজন সক্রেটিসের আবির্ভাব ঘটে, যিনি ছিলেন কুতর্কের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত, আর সফিস্টরা আসলে কুতার্কিক ছিল। একদল উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় যুবশ্রেণী সক্রেটিসের চারপাশে জড়ো হয়েছিল। অবশেষে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল যুব সম্প্রদায়কে বিপথগামী করার অভিযোগ এনে (৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব); তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয় তার বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে নিজের বাড়িতে স্বহস্তে হেমলক বিষপান করে। তবে তার মৃত্যুর পরও মানুষের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটেনি। তাঁর অনুসারী যুবকরা তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করেছিল।

এই যুব শ্রেণীর অগ্রপথিক ছিলেন প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) তিনি অনতিবিলম্বে তার অ্যাকাডেমির উদ্যানে শিক্ষাদান শুরু করেন। তাঁর শিক্ষাদানের দুটি ভাগ ছিল, মানব চিন্তার ভিত্তি ও পদ্ধতি আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ। তিনি প্রথমে তার কল্পরাজ্য নির্মাণ করেন, যা ছিল এমন এক সমাজ নির্মাণ; যা চলমান সমাজ থেকে ভিন্নতর ও উন্নততর। এতে প্রকাশ পায় মানব মনের এক অভূপূর্ব সাহসিকতা যা এযাবৎকাল চলমান সমাজ গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মাধ্যমে মানব মনের এক অভূপূর্ব সাহসিকতার বিকাশ ঘটে। এযাবৎকাল যেসব ঐতিহ্য ও সামাজিক রীতিনীতি কখনও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি সেই নিষিদ্ধ এলাকাতেই তাদের পদচারণা। প্লেটো মানব জাতিকে সোজাসাপ্টা বলে দেন : 'অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার যা তোমাদের ভোগান্তি সৃষ্টি করছে, তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য, প্রয়োজন শুধু তাদের সামনাসামনি দাঁড়াবার সাহস। তোমরা যদি এগুলি ঝেড়ে ফেলতে পার তাহলে উন্নততর জীবনযাপন সম্ভব। তোমাদের ক্ষমতাকে তোমরা জাগাতে পারনি।' এটা অত্যন্ত উন্নত দুঃসাহসিক চিন্তা, যা মানবজাতির মধ্যে আন্তঃপ্রবিষ্ট হতে এখনও অনেক বাকি। তাঁর প্রাথমিক গ্রন্থগুলির মধ্যে *রিপাবলিক* অন্যতম। এটা হলো অভিজাত সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন : আর-তাঁর সর্বশেষ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ ল'জ (LAWS): আর একটা কল্পরাজ্যের বিধিবিধান।

প্লেটোর চিন্তনপদ্ধতি ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন এগিয়ে নিয়ে যান তারই এক শিষ্য অ্যারিস্টটল, যিনি শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লাইসিয়াম। অ্যারিস্টটলের জন্ম মেসিডোনিয়ার স্ট্যাগিরা শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজবৈদ্য। কিছুদিন যাবৎ অ্যারিস্টটল ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজপুত্র আলেকজান্ডারের গৃহ শিক্ষক, যিনি অল্পদিনের মধ্যেই বহু মহান কীর্তি স্থাপন করেন যে সম্বন্ধে আমরা

www.nagorikpathagar.org

শিগগিরই বিস্তারিত বলব। অ্যারিস্টটলের চিন্তনপদ্ধতি যুক্তিশাস্ত্রকে এমন এক উচ্চতায় উন্নীত করে পরবর্তী দেড় হাজার বছর ধরে তা সেখানেই থিতু হয়ে ছিল, যত দিন না মধ্যযুগীয় পণ্ডিতরা সেই ধারার অগ্রগতি সাধন করেন। তিনি কোনো কল্পরাজ্য সৃষ্টি করেননি। প্লেটো যেমন শিখিয়েছিলেন, মানুষ যত দিন না তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেখানে অ্যারিস্টটল শিখিয়েছিলেন মানুষকে অনেক বেশি সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, ইতিমধ্যে যা তার আয়ত্তে আছে তার চেয়ে। কাজেই অ্যারিস্টটল নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান অর্জনের ধারাবাহিকতায় অবতীর্ণ হন, যাকে বলা হয় বিজ্ঞান। তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁর বাহিনীকে দিকে দিকে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন প্রাকৃতিক ইতিহাসের জনক। রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই। তাঁর লাইসিয়ামের ছাত্ররা ১৫৮টি দেশের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করে দেখিয়েছিলেন।

তাই খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই আমরা এমন সব মানুষের দেখা পেয়েছিলাম, যারা সত্যিকার অর্থেই স্বপ্নিল চিন্তাপদ্ধতি ত্যাগ করে জীবনের সমস্যাগুলিকে সুশৃঙ্খল সমালোচনার দৃষ্টিতে সমাধানের পথ খোঁজেন। তারা অস্বাভাবিক ভুতুড়ে দেবদেবী আর দৈত্যদানোর শৃঙ্খলিত ধ্যান ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পেরেছিলেন। মুক্ত, নির্ভুল ও নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাধারার পত্তন হয়। সতেজ, অনিরুদ্ধ, প্রাণচঞ্চল এক নতুন প্রজন্ম উত্তরের জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ ঘটান নির্মল উজ্জ্বল দিবালোকের মতো।

২৬. আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্য

খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩১ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৪ পর্যন্ত চলমান পেলোপনেশীয় যুদ্ধ গ্রিসকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে উত্তরের সমগোত্রীয় মেসিডোনিয়া রাজ্য ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা ও সভ্যতায় এগিয়ে যাচ্ছিল। মেসিডোনীয়রা গ্রিকের সমগোত্রীয় এক ভাষায় কথা বলত, আর মাঝে মধ্যে মেসিডোনীয় প্রতিযোগীরা অলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশ নিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৯ অব্দে একজন অত্যন্ত দক্ষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই ছোট্ট দেশটির রাজা হলেন যার নাম ফিলিপ। ইতিপূর্বে ফিলিপ গ্রিসের একজন বন্দি ছিলেন। তিনি গ্রিক শিক্ষায় পুরোপুরি শিক্ষিত হয়েছিলেন এবং সম্ভবত হেরোডোটাসের ধ্যান ধারণার সাথে পরিচিত ছিলেন, যা দার্শনিক সক্রেটিসের দ্বারা বিকশিত হয়েছিল আর তিনি আশা করেছিলেন সংঘবদ্ধ গ্রিসের দ্বারা এশিয়া বিজয়ের।

তাঁর প্রথম কাজ ছিল নিজের রাজ্য সম্প্রসারিত করা, সংগঠিত করা আর সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা। হাজার বছর ধরে অশ্বচালিত রথই ছিল যুদ্ধজয়ের প্রধান অনুসঙ্গ, আর তার সাথে ঘনসন্নিবিষ্ট পদাতিক। অশ্বারোহীরাও যুদ্ধ করত, তবে বিশৃঙ্খল যুদ্ধই বেশি লক্ষ করা যেত। ফিলিপ তার পদাতিক বাহিনীকে সুসংবদ্ধ ব্যূহাকারে

www.nagorikpathagar.org

সাজিয়ে রণকৌশল শিক্ষা দেন, আর তার অশ্বারোহী বাহিনীকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অশ্বারোহী বাহিনীই ছিল তাঁর ও তার পুত্র আলেকজান্ডারের যুদ্ধজয়ের প্রধান উপকরণ। তাঁর পদাতিক বাহিনী শত্রুসৈন্যকে সামনে ঠেকিয়ে রাখত আর অশ্বারোহী বাহিনী দুপাশ থেকে আক্রমণ করে শত্রু সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিত। ধনুর্ধরেরা বিফল করে দিত শত্রুর রথারোহীদের। এই নতুন বাহিনী নিয়ে ফিলিপ থেসালির মধ্য দিয়ে গ্রিসের দিকে অগ্রসর হন। এথেন্স আর তার মিত্রদের বিরুদ্ধে কায়েরোনিয়ার যুদ্ধে সমগ্র গ্রিস তার পদানত হয়। অবশেষে হেরোডোটাসের স্বপ্ন সার্থক হয়। সমগ্র গ্রিক রাজ্যসমূহের এক সম্মেলনে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিলিপকে নেতা নির্বাচন করা হয়। ৩৩৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিসের এক বিশাল ঐক্যবদ্ধ বাহিনী এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তিনি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তাকে হত্যা করা হয়। ধারণা করা হয়, এ হত্যার পিছনে রানী আলেকজান্ডারের মা অলিম্পিয়াসের হাত ছিল, কারণ ফিলিপ দ্বিতীয় বিবাহ করায় তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন।

তবে ফিলিপ তাঁর সন্তানের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। তিনি শুধু বিশ্বের মহত্তম দার্শনিক এরিস্টটলকে পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন তাই নয়, তিনি নিজেও তাঁর যুদ্ধকৌশল নিয়ে পুত্রের সাথে আলোচনা করতেন। কায়েরোনিয়ার যুদ্ধে মাত্র ১৮ বছর বয়সী আলেকজান্ডার অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। কাজেই সিংহাসন আরোহণের সময় যদিও তার বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর, তাঁর পিতার আরব্ধ পারস্য অভিযানের দায়িত্ব নিতে তার তেমন অসুবিধা হয়নি।

মেসিডোনিয়া ও গ্রিসে তার অধিকার পাকাপোক্ত করতে দুবছর কেটে যায়। ৩৩৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি এশিয়া অভিযানে অগ্রসর হন। প্রথমেই তিনি ছোট কিছু বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে সহজেই তাদের পরাজিত করে, এশিয়া ও এশিয়া মাইনরের বেশ কিছু শহর দখল করে নেন। তারপর তিনি সমুদ্র উপকূল ধরে এগিয়ে যান। শহরগুলি সংগঠিত করার প্রয়োজন পড়ে এবং ওখানে কিছু সৈন্য মোতায়েন করা হয়, কারণ পারসিকদের নৌবহর ছিল শক্তিশালী আর টায়ার ও সিদন বন্দর তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। যদি তিনি পেছনের শহরগুলি অরক্ষিত রেখে যেতেন তাহলে পারসিকরা সহজেই নৌসেনাদের অবতরণ করিয়ে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারত। ৩৩৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইসাসের যুদ্ধে তিনি তৃতীয় দারায়ুসের বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেন। দেড় শতাব্দী পূর্বে ঠিক যেমন জারেক্সেস দার্দানেলিস প্রণালী পরে হয়ে পেয়েছিলেন অসংগঠিত প্রতিরোধ, এবার আলেকজান্ডারও তেমনটাই পেলেন; যার মধ্যে ছিল আমির ওমরা, ক্যাম্প পরিচালক আর হারেম। সিদন সহজেই আত্মসমর্পণ করে তবে টায়ার কঠিন প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। অবশেষে এই মহান নগরী পরাস্ত, লুণ্ঠিত ও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। গাজাও পর্যুদস্ত হয়, আর ৩৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের শেষ দিকে আলেকজান্ডার বিজয়ীর বেশে মিশরে প্রবেশ করে পারসিকদের কাছ থেকে থেকে শাসনভার করায়ত্ত করেন।

আলেকজান্ড্রিয়েটা ও আলেকজান্দ্রিয়ায় তিনি স্থলপথে প্রবেশযোগ্য দুটি শক্তিশালী নগরী নির্মাণ করেন। যেখানে বিদ্রোহের কোনো সুযোগ ছিল না। এর

www.nagorikpathagar.org

ফলে ফিনিশীয় নগরসমূহের বাণিজ্য এদিকেই মোড় ফিরল। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে ফিনিশীয়দের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটল আর আলেকজান্ডারের নির্মিত নগরগুলিতে ইহুদিদের প্রাদুর্ভাব ঘটল।

৩৩১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার মিশর থেকে বের হয়ে ব্যাবিলনের দিকে অগ্রসর হলেন, ইতিপূর্বে যেমনটা করেছিলেন থোথমেস, রামেসেস ও নেকো। তবে তিনি এগিয়ে চললেন টায়ারের পথ ধরে। লুপ্ত নগরী নিনেভের কাছে নবপ্রতিষ্ঠিত আর্বেলা শহরের কাছে আলেকজান্ডার মুখোমুখি হলেন দারায়ুসের সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে। পারসিক রথ বহরকে পর্যুদস্ত করে মেসিডোনীয় অশ্বারোহী বাহিনী। আর পদাতিকরা শেষ করল অবশিষ্ট কাজ। দারায়ুস তার বাহিনী নিয়ে পশ্চাদপসরণ করলেন। তিনি আক্রমণকারীদের প্রতিরোধের আর কোনো চেষ্টা করলেন না। তিনি উত্তরে মেডিসের গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গেলেন। আলেকজান্ডার ব্যাবিলনের দিকে তার অভিযান পরিচালনা করলেন, যে ব্যাবিলন তখন পর্যন্ত সমৃদ্ধ আর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারপর এগিয়ে গেলেন সুসা আর পার্সিপলিসের দিকে, তারপরে এক পানোৎসবের পর পুড়িয়ে দিলেন রাজাধিরাজ দারায়ুসের প্রাসাদ।

অবিলম্বে আলেকজান্ডার মধ্য এশিয়া অভিমুখে তার সামরিক অভিযান পরিচালনা করলেন আর পারস্য সাম্রাজ্যের শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছলেন। প্রথমে তিনি এগিয়ে চললেন উত্তর দিকে দারায়ুসকে অনুসরণ করে। ভোর হওয়ার আগেই তিনি তাঁকে ধরে ফেললেন তবে জীবিতাবস্থায় নয়। তার লোকেরাই তাঁকে হত্যা করে তাঁর রথের ওপর ফেলে রেখেছিল। অগ্রবর্তী গ্রিক সৈন্যরা যারা তাকে দেখে, তিনি তখনও জীবিত ছিলেন, তবে আলেকজান্ডার সেখানে পৌঁছার আগেই তার শেষ নিশ্বাস নির্গত হয়ে যায়। তিনি ক্যাস্পিয়ান সাগর বেষ্টন করে পশ্চিম তুর্কিস্তানের পাহাড়ি এলাকার দিকে এগিয়ে যান। তারপর হেরাত, কাবুল ও খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতে পদার্পণ করেন। ভারতে এক ভারতীয় রাজা পুরুর সাথে এক ভয়াবহ লড়াই লড়েন, আর এখানেই মেসিডোনীয় বাহিনী হস্তিবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে তাদের পরাস্ত করে। এখানে তিনি জাহাজ নির্মাণ করে সিন্ধু নদের মোহনায় পৌঁছান এবং সেখান থেকে পিছন ফিরে বেলুনিস্তানের মধ্য দিয়ে আবার ৩২৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সুসা নগরে ফিরে আসেন ছয় বছর পর। এরপর তার বিজিত বিশাল সাম্রাজ্য সংগঠিত ও সুসংহত করায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রজাদের মন জয় করার চেষ্টা করেন। তিনি পারসিক রাজাদের মতো লম্বা আলখেল্লা আর উঁচু পাগড়ি পরিধান করেন। আর এটাই তার মেসিডোনীয় জেনারেলদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার করে। তাদের সাথে আলেকজান্ডারের ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। তিনি মেসিডোনীয় অফিসারদের সাথে পারসিক ও ব্যাবিলনীয় কন্যাদের অনেকগুলি বিয়ের আয়োজন করেন। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের বৈবাহিক মহামিলন। তিনি যে মহান ঐক্যের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার পূর্ণতা তিনি দেখে যেতে পারেননি। ব্যাবিলনে এক পানোৎসবের পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন। শিগগিরই এই বিশাল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, তাঁর

www.nagorikpathagar.org

সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে একজন সেলিউকাস সিন্ধু থেকে ইউফ্রেতিস পর্যন্ত প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্য নিজের অধিকারে রেখে দেন, অন্য একজন টলেমি অধিকারে রাখেন মিশর, আর মেসিডোনিয়ায় কব্জা জমান এন্টিগোনাস। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে চলে অস্থিরতা। উত্তরে বর্বরদের আক্রমণ চলে অবিরাম, শেষ পর্যন্ত অন্য শক্তি রোমানদের জাগরণ ঘটতে থাকে পশ্চিমে। একের পর এক তারা বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে অখণ্ড এক দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের রূপ দেয়।

২৭. আলেকজান্দ্রিয়ার জাদুঘর ও লাইব্রেরি

আলেকজান্ডারের পূর্ব থেকেই গ্রিক বণিক, শিল্পি, রাজ কর্মচারী ভাড়াটিয়া সৈন্যরূপে পারস্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল। জারেক্সেসের মৃত্যুর পর বংশগত অন্তর্দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়ায় প্রায় ১০,০০০ গ্রিক ভাড়াটিয়া লোকজন জেনোফোনের নেতৃত্বে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দশ *সহস্রের প্রত্যাবর্তন* বইটি ব্যাবিলন থেকে গ্রিক এশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের ওপর একজন জেনারেলের লেখা প্রথম গ্রন্থ। তবে আলেকজান্ডারের বিজয় এবং তার সংক্ষিপ্তকালীন সাম্রাজ্য স্থাপন এবং তার জেনারেলদের শাসন প্রাচীন বিশ্বে গ্রিক ভাষা, সংস্কৃতি ও ফ্যাশন বিস্তারে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। গ্রিসের এই প্রভাব মধ্য এশিয়ায় ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। ভারতীয় শিল্পের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর।

বহু শতাব্দী ধরে শিল্প ও সংস্কৃতিতে গ্রিস তার মর্যাদা টিকিয়ে রেখেছিল; এই গ্রিক ধারা টিকে ছিল ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক হাজার বছর ধরে, তবে চিন্তা চেতনার জগতে নেতৃত্ব শিগগিরই স্থানচ্যুত হয়ে চলে গেল ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায়, যা ছিল আলেকজান্ডারের প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য নগরী। এখানে মেসিডোনীয় জেনারেল টলেমি ফারাওর সিংহাসন দখল করে বসলেন, যার দরবারে গ্রিক ভাষা ব্যবহৃত হত। রাজা হওয়ার আগে তিনি ছিলেন আলেকজান্ডারের অন্তরঙ্গ। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের চিন্তায় অভিসিঞ্চিত। তিনি তার সকল সামর্থ্য নিয়োজিত করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণ ও তত্ত্বানুসন্ধানে। তিনি আলেকজান্ডারের অভিযানের ইতিহাসও লিখেছিলেন, তবে দুর্ভাগ্যবশত সেটি হারিয়ে গেছে। আলেকজান্ডার অ্যারিস্টটলের তত্ত্বানুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিপুল অংকের অর্থ বরাদ্দ দিয়েছিলেন; তবে প্রথম টলেমি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার একটা ফাউন্ডেশন গড়ে তুলে তা সঙ্গীতের দেবী "মিউজের" নামে উৎসর্গ করেছিলেন, যা আলেকজান্দ্রিয়ায় মিউজিয়াম নামে খ্যাত। পরবর্তী দুই তিন প্রজন্ম আলেকজান্দ্রিয়ায় যে গবেষণা চলে তা অতুলনীয়। ইউক্লিড, ইরাতোস্থেনিস, যার পৃথিবী পরিমাপ প্রকৃত মাপের ৫০

www.nagorikpathagar.org

মাইলের মধ্যে এসেছিল, এপোলোনিয়াস যিনি কণিক সেকসনের ওপর গ্রন্থ লিখেছিলেন, হিপ্পারকাস যিনি তারকামণ্ডলের ম্যাপ তৈরি করেছিলেন, আর হেরোফাইনাস, যিনি প্রথম বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ডিজাইন করেছিলেন। এরা ছিলেন বৈজ্ঞানিক আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডল। আর্কিমেডিস সাইরাকিউস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলেন পড়াশোনা করার জন্য আর মিউজিয়ামের সাথে তার ছিল গভীর যোগাযোগ। হেরোফাইলাস ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রিক শারীরতত্ত্ববিদ, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় তিনি জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ করতেন।

এক পুরুষের বেশি সময়কাল ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় টলেমির রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় যেসব প্রখ্যাত বিজ্ঞান ও চিন্তাবিদ আলো ছড়িয়েছিলেন খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের আগে এমনটা আর কখনোই দেখা যায়নি। তবে এর গতি অবিচ্ছিন্ন ছিল না। এই অধঃপতনের অনেকগুলি কারণ ছিল। সবচেয়ে বড় কারণটি হলো মিউজিয়ামটি ছিল রয়াল কলেজ যার অধ্যাপকরা নিযুক্ত হতেন এবং বেতন পেতেন ফারাওদের দ্বারা। এটা ততক্ষণ ঠিকঠাক ছিল, যত দিন ফারাও ছিলেন প্রথম টলেমি, যিনি ছিলেন অ্যারিস্টটলের ছাত্র ও বন্ধু। কিন্তু টলেমির পরবর্তী বংশধররা ধীরে ধীরে মিশরীয় ভাবধারায় ফিরে যেতে থাকে, তারা মিশরীয় পুরোহিত আর ধর্মগুরুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জ্ঞানচর্চার ধারা রুখে দেন আর তাদের নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধিৎসার স্রোত সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দেয়।

প্রথম টলেমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে শুধু যে উৎসাহিত করেছিলেন শুধু তা-ই নয়, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে এনসাইক্লোপেডিয়ার সংরক্ষণাগার বানিয়েছিলেন। শুধু সংরক্ষণাগার নয়, এখান থেকে বই কপি করে বিক্রির ব্যবস্থাও ছিল। বই কপি করার বিশাল এক বাহিনী নিয়োজিত হয়েছিল যারা দিনরাত কাজ করত, আজ আমরা যে বৌদ্ধিকচর্চার বাতাবরণে বাস করছি, এখানে তার সূত্রপাত বলা যায়। এখানেই শুরু হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান সংগ্রহ ও বিতরণ। মানবজাতির ইতিহাসে এই মিউজিয়াম ও লাইব্রেরি এক নতুন যুগের সূচনা করে। আধুনিক ইতিহাসের সূচনা হয় এখানেই।

অনেক বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে গবেষণাকর্ম এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ। এ বাধাগুলির মধ্যে একটা ছিল দার্শনিকদের সাথে সমাজের দূরত্ব। এসব সমাজপতির মধ্যে ছিলেন সাধারণ অভিজাত এবং ব্যবসায়ী ও কলাকুশলী যার মধ্যে ছিল কাচশিল্পী, ধাতুশিল্পী, তবে চিন্তাবিদদের সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না, কাচশিল্পীরা তৈরি করত বর্ণিল পুতি ও সুন্দর সুন্দর পাত্র। তবে স্বচ্ছ কাচের প্রচলন তখনও হয়নি, কাজেই ফ্লাস্ক বা লেন্সের প্রচলন ছিল না, ধাতু শিল্পীরা তৈরি করত অস্ত্রশস্ত্র আর অলংকার, তবে তারা রাসায়নিক তুলাদণ্ড আবিষ্কার করতে পারেনি। দার্শনিকরা অণু ও বস্তুর ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন, তবে তাদের চিন্তার রাজ্যে এনামেল, পিগমেন্ট, ফিলটার প্রবেশ করেনি। কাজেই অল্প দিনের জন্য আলেজান্দ্রিয়ায় যে সুযোগ এসেছিল তাতে মাইক্রোস্কোপ বা

www.nagorikpathagar.org

রসায়নের বিকাশ ঘটেনি, যদিও হেরো একটা বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন, সেটা কোনো পাম্প মেশিনে বা নৌকা চালনায় বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়নি। একমাত্র ওষুধ ছাড়া অন্য কোনো বাস্তব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটেনি। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় টলেমির উৎসাহে ভাটা পড়ল। মিউজিয়ামের আবিষ্কারসমূহ কিছু পাণ্ডুলিপির মধ্যেই আটকে রইল যত দিন না রেনেসাঁর মাধ্যমে মানুষের কৌতূহলের পুনর্জাগরণ ঘটে।

গ্রন্থ নির্মাণেও লাইব্রেরি তেমন অগ্রগতি আনতে পারেনি। তখন পর্যন্ত মণ্ড থেকে কাগজ তৈরির কৌশল আবিষ্কার হয়নি। কাগজ ছিল চীনাদের আবিষ্কার আর খ্রিষ্টীয় নবম শতকের আগে পশ্চিমে তার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তখন পর্যন্ত বই লেখা চলত পার্চমেন্ট বা প্যাপিরাস শিটে। এগুলি জড়িয়ে রাখা হত আর ভাঁজ খুলে এসব পড়া বেশ অসুবিধাজনক ছিল। তবে প্রাচীন প্রস্তর যুগেও প্রিন্টিংয়ের সাথে মানুষের পরিচয় ছিল। প্রাচীন সুমেরিয়াতে সীলমোহর দেখা গেছে। তবে কাগজের অভাবে বই ছাপার যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। আলেকজান্দ্রিয়ায় পর্যাপ্ত বই তৈরি হয়েছিল তবে সেগুলি সহজলভ্য ছিল না, তাই সম্পদশালী বা প্রভাবশালীদের বাইরে সাধারণের জন্য সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। কাজেই সে যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক ঔজ্জ্বল্য বেশিদূর আলো দেখাতে পারেনি, আর তা শুধু নির্বাচিত কিছু দার্শনিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা যেন কালো আবরণে ঢাকা লণ্ঠনের আলো, যা সীমিত পরিসরে আলোকিত করতে পেরেছিল। সে আলোর ঔজ্জ্বল্য চোখধাঁধানো ছিল বটে, তবে সাধারণের অজ্ঞাতেই থেকে গেছে। যে বিজ্ঞানের বীজ তখন বপন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে যা গোটা বিশ্বে আলো ছড়িয়েছিল, তখন তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গিয়েছিল এবং শিগগিরই আলেকজান্দ্রিয়ার ওপর এক রক্ষণশীলতার আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল। এরিস্টটল যে জ্ঞানের বীজ বপন করেছিলেন পরবর্তী হাজার বছর তা অনঙ্কুরিতই রয়ে যায়। তারপর এক সময় তাতে অঙ্কুরোদগমের চাঞ্চল্য দেখা দিলো। জ্ঞানের সেই ধারাই বহু শতাব্দী পরে বিশ্বকে আর একবার নাড়া দেয়। যা সমগ্র মানব সভ্যতার গতি প্রকৃতি বদলে দিয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়াই একমাত্র গ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিচর্চার কেন্দ্র ছিল না। আলেকজান্ডারের স্বল্পকালীন শাসনামলে আরো বেশ কিছু শহরে জ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিসিলির সাইরাকিউজ, যেখানে দুই শতাব্দী ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। এশিয়া মাইনরে ছিল পার্গেমাম, যেখানেও ছিল এক বিশাল লাইব্রেরি। তবে শিগগিরই এই হেলেনিক জগতে উত্তর থেকে আক্রমণ নেমে আসে। এককালে যে পথ ধরে গ্রিক ও ফ্রিজিয়ানরা হামলে পড়েছিল, ঠিক সেই পথেই এগিয়ে এলো বর্বর গলরা। তারা হামলা করে সব কিছু চুরমার করে দিলো। আর গলদের পিছে পিছে ইতালি থেকে আর এক বিজয়ী জাতি এগিয়ে এলো, রোমানরা যারা আলেকজান্ডার ও দারায়ুসের অধিকৃত গোটা পশ্চিমা বিশ্ব অধিকার করে বসে। তারা ছিল সবল তবে চিন্তাশীল ছিল না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চেয়ে আইনকে

www.nagorikpathagar.org

যারা প্রাধান্য দিত। মধ্য এশিয়া থেকেও নতুন নতুন আক্রমকরা এসে ভারতকে গ্রিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এরা ছিল অশ্বারোহী ধনুর্ধর পার্থিয়ান, তারা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রেকো পারসিকদের সাথে ঠিক সেই ব্যবহারই করেছিল, যেমনটা সপ্তম ও ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মেডিস ও পারসিকরা করেছিল। তাছাড়াও উত্তরপূর্ব দিক থেকে ধেয়ে এসেছিল যাযাবর জাতিসমূহ তারা নর্ডিক ও আর্যভাষায় কথা বললেও ছিল হলুদ গাত্রবর্ণের ও কালো কেশের মঙ্গোলীয়। তবে এসব জাতি সম্বন্ধে পরবর্তীতে আরো সবিস্তারে বলব।

২৮. গৌতম বুদ্ধের জীবনী

এবার আমরা তিনশ বছর পিছিয়ে গিয়ে এমন এক মহান শিক্ষকের কথা বলব যিনি এশিয়ার ধর্মীয় চিন্তা ও অনুভূতিতে বিপ্লব এনেছিলেন। তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধ, যিনি ভারতের বারানসীতে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, যে সময় ইসাইয়া ইহুদিদের ধর্মশিক্ষা দিচ্ছিলেন ব্যাবিলনে আর হেরাক্লিটাস একই সাথে তার বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা প্রচার করছিলেন। এসব ব্যক্তি একই সময় অর্থাৎ ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তাদের চিন্তা-চেতনার দ্যুতি ছড়াচ্ছিলেন পরস্পরের সাথে কোনোরূপ যোগসূত্র ছাড়াই।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক সত্যিই ইতিহাসের এক মহান সন্ধিক্ষণ, সর্বত্রই এমনকি চীনেও মানুষের মন অভূতপূর্ব সাহসিকতা দেখাতে পেরেছিল। সর্বত্রই তারা রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র আর নরবলির চক্র থেকে বেরিয়ে এসে এসবের বিরুদ্ধে সবার সামনে অসীম সাহসিকতায় তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দিতে থাকেন। মনে হয় যে ২০,০০০ বছরের বালখিল্যতা কাটিয়ে মানুষ সবে যৌবনে পদার্পণ করছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের দিকে কোনো এক সময় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর্য ভাষাভাষী এক জাতি ভারতে প্রবেশ করেছিল। তাদের আক্রমণ একবারই ছিল, না পর্যায়ক্রমিক ছিল তা নিশ্চিত নয়, তবে তারা উত্তর ভারতে তাদের ভাষা ও ঐতিহ্য চালু করতে পেরেছিল। সংস্কৃত ভাষা আর্য ভাষারই এক অদ্ভুত প্রজাতি। সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় তারা দেখেছিল এক কৃষ্ণকায় উন্নত সভ্য জাতি তবে তারা ছিল কম সাহসী আর ইচ্ছাশক্তিতে দুর্বল। তারা গ্রিক আর পারসিকদের মতো সহজে পূর্বজদের সাথে মিশে যেতে পারেনি। তারা আলাদাই থেকে গেছে। ঐতিহাসিকদের কাছে ভারতের অতীত অস্পষ্ট হলেও, ভারতীয় সমাজ ইতিমধ্যেই কয়েক স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যাদের মধ্যে উপস্তরও ছিল বিস্তর, যারা একে অন্যের আহার্য গ্রহণ করত না, পরস্পরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হত না আর সহজভাবে মেলামেশাও করত না।

www.nagorikpathagar.org

আর এই জাতিভেদ প্রথা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজো টিকে আছে। এই দিক দিয়ে ইউরোপীয় ও মঙ্গোলীয়দের মধ্যে সহজ মিশ্রণ ছিল। তাই ভারতীয় সমাজ বহুধাবিভক্ত সম্প্রদায়ের এক সমাজ।

সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন হিমালয়ের পাদদেশের এক ছোট্ট রাজ্যের অভিজাত পরিবারের সন্তান, যারা ছিল সেই রাজ্যের শাসক। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল তার এক আত্মীয়ার সাথে। তিনি শিকার করতেন আর রৌদ্রকরোজ্জ্বল উদ্যানে ঘুরে বেড়াতেন। এ ধরনের আয়েশি জীবনযাত্রার মাঝেই তার মনে এক অসন্তোষ চাড়া দিয়ে উঠল। সুন্দর মানসিকতার অধিকারীর মাঝে এ অসন্তোষ অস্বাভাবিক। তিনি অনুভব করলেন তিনি যে ধরনের জীবনযাপন করছেন তা বাস্তবতাবিবর্জিত, যেন তিনি কয়েক দিনের ছুটি কাটাতে এসেছেন, যে বিনোদনের শেষ নেই। রোগ, শোক, মৃত্যু, অনিশ্চয়তা তার মনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। যখন তাঁর মনের এ অবস্থা চলছে, তখনই এক সিদ্ধপুরুষের সাথে তার দেখা, যেমন সাধুসন্ত সেই সময়ের ভারতে মোটেই অপ্রতুল ছিল না। এসব লোক নিজেদেরকে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতেন আর অধিকাংশ সময় কাটাতেন ধ্যান ও ধর্মীয় আলোচনায়। তারা জীবনের গভীর বাস্তবতা অনুসন্ধান করতেন আর এ ধরনের আবেগ গৌতমকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল। এ অবস্থায় যখন তিনি শুনলেন তার এক সন্তান জন্মেছে, তাঁর মনে হলো তার পায়ে আরো একটা বেড়ি পড়ল।

তার আত্মীয়স্বজনদের মহা আনন্দের মাঝে তিনি গ্রামে ফিরে এলেন। নতুন অতিথির অভ্যর্থনায় বিশাল ভোজ আর নৃত্যগীতের আয়োজন চলছে, রাতে গৌতম এক দারুণ মনোকষ্টের মধ্যে জেগে উঠলেন, কে যেন তাঁর কানে কানে বলছে, বাড়িতে আগুন লেগেছে। সেই মুহূর্তেই তিনি স্থির করলেন তার উদ্দেশ্যহীন সুখী জীবন তিনি ত্যাগ করবেন। ধীর পায়ে তিনি ঘরের চৌকাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন, নিষ্প্রভ প্রদীপের আলোয় দেখলেন তাঁর স্ত্রী নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, কোলের মধ্যে জড়ানো রয়েছে তাঁর শিশুপুত্র, একবার তাঁর ইচ্ছা হলো শেষবারের মতো তার সন্তানকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরেন, কিন্তু স্ত্রীকে জাগিয়ে দেওয়ার ভয়ে তিনি তা থেকে বিরত হলেন, তার পর উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত রাতে বাড়ির বাইরে এসে তার অশ্বে আরোহণ করলেন, আর দ্রুতবেগে বেরিয়ে পড়লেন বিশাল উন্মুক্ত বিশ্বের মাঝে।

সে রাতে অশ্বারোহণে বহুদূরে চলে গেলেন তিনি। সকালে নিজেকে দেখতে পেলেন তাঁর রাজ্যসীমার বাইরে, আর বালুকাময় এক নদীতীরে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন। তারপর তলোয়ার দিয়ে নিজের ঝাঁকড়া চুলগুলি কেটে ফেললেন, শরীর থেকে সব অলংকার খুলে ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করে নিজ প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তিনি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তির দেখা পেয়ে তার সাথে নিজের বেশ পরিবর্তন করে নিলেন। এভাবে সকল পার্থিব বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মোক্ষলাভের চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তিনি বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে এক সাধুর আখড়ায় উপনীত হলেন। সেখানে একদল সাধু

www.nagorikpathagar.org

বাস করতেন, যারা লোকালয়ে গিয়ে সামান্য রসদ ভিক্ষা করে আনতেন আর লোকদের জ্ঞানের কথা শোনাতেন। সেখানে থেকে গৌতম তৎকালে প্রচলিত সকল অধিবিদ্যা আয়ত্ত করে ফেললেন। তবে তারা গৌতমকে যে সমাধান দিলো তাতে তিনি তুষ্ট হতে পারেননি।

ভারতীয় মানসিকতায় আবহমানকাল ধরে যে বিশ্বাসটি প্রচলিত তা হলো কেবল সাধনার মধ্য দিয়েই জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করা যায়, যেমন উপবাস, নির্ঘুম ও আত্মপীড়ন; আর এসব তত্ত্বই পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন গৌতম। তাঁর পাঁচজন শিষ্যকে নিয়ে তিনি বনে গিয়ে উপবাস ও কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হলেন। তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যেন আকাশের সামিয়ানায় টাঙানো বিশাল এক ঘণ্টাধ্বনি। কিন্তু তার নিজের মনে হলো সত্য অর্জন থেকে তিনি অনেক দূরে। একদিন তিনি তার দুর্বল শরীর নিয়ে পায়চারী করতে করতে গভীর চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন এসব জাদু তন্ত্রমন্ত্রের পথ ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

তাঁর শিষ্যদের অবাক করে দিয়ে তিনি আত্মপীড়নের পথ পরিহার করে সাধারণ খাবার দিতে বললেন। তিনি বুঝতে পারলেন মানুষের চিন্তার জগতে যা কিছু অর্জন তার জন্য চাই পুষ্ট মস্তিষ্ক ও বলিষ্ঠ শরীর। এ ধরনের ধারণা এদেশের তৎকালীন চিন্তা জগতে সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করে বারানসীর পথে চলে গেল হতাশ হয়ে। এবার গৌতম নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মন যখন জটিল কোনো ভাবনার ঘূর্ণাবর্তে নিপতিত হয়, তখন সে তার উদ্দিষ্ট পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, বুঝতে পারে না সে এগিয়ে যাচ্ছে না পিছিয়ে পড়ছে, আর হঠাৎ এক সময় আলোর ঝলকানির মতো তার কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়, তখন সে তার অর্জন বুঝতে পারে। গৌতমের ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটল। একদিন তিনি বিশাল এক বৃক্ষের নিচে আহার করতে বসেছেন, হঠাৎ তাঁর মাঝে এক দিব্যদৃষ্টি এসে গেল। তিনি অনুধাবন করলেন জীবনকে তিনি স্বচ্ছভাবে দেখতে পেয়েছেন। তিনি সারাদিন সারারাত গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে রইলেন, তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর সত্যদর্শন তিনি বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন। তিনি প্রথমে বারানসীতে গিয়ে তার পক্ষত্যাগী শিষ্যদের খুঁজে বের করে তার নতুন তত্ত্বদর্শনের কথা বুঝিয়ে বললেন। বারানসীতে রাজার মৃগ উদ্যানে তারা এক কুটির নির্মাণ করে তার তত্ত্ববাণী প্রচার করতে শুরু করলেন, আর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা সেখানে ভিড় করতে শুরু করল। তার শিক্ষা প্রচারের সূত্রপাত ছিল এক ভাগ্যবান যুবকের আত্মকথা দিয়ে যে যুবক ছিলেন তিনি নিজে 'আমি কেন পরিপূর্ণ সুখী হতে পারলাম না?' প্রশ্নটি ছিল তার আত্মোপলব্ধির। থেলিস ও হেরাক্লিটাসের বহির্জাগতিক অনুসন্ধিৎসা থেকে এ প্রশ্নটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রমাত্রার। আর হিব্রু পয়গম্বরদের সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তির শিক্ষা থেকেও স্বতন্ত্র ছিল এই শিক্ষা। এই ভারতীয় শিক্ষক আত্ম অস্বীকৃতির দিকে যাননি। তিনি বরং আত্ম-অহমিকাকে খুঁজে বের করে তাকে ধ্বংস

www.nagorikpathagar.org

করার পরামর্শই দিয়েছিলেন। মানুষের সকল দুঃখকষ্টের মূলে রয়েছে লোভ। মানুষ যতক্ষণ তার বাসনা কামনা ত্যাগ করতে না পারছে, ততক্ষণ তাকে দুঃখকষ্ট পেতেই হবে। মানুষের কামনা তিনটি রূপে প্রকাশ পায়, যার সবগুলিই মন্দ। প্রথম প্রকাশ ক্ষুধা, লোভ, দৈহিক বাসনা; দ্বিতীয়টি অহংকার যা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে এবং তৃতীয়টি ইহজাগতিক সাফল্য ও তা অর্জনে মরিয়া প্রয়াস। জীবনের হতাশা ও বিরক্তি থেকে মুক্তি পেতে এসব কামনা বাসনা *ত্যাগ* করতে হবে। যখন এদের জয় করা যাবে, যখন অহংবোধ সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে, তখনই আমার আত্মার পরিপূর্ণ শান্তি নির্বাণ আর এটাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন।

এটাই তাঁর শিক্ষার সারকথা। সত্যিই খুব সূক্ষ্ম আর অধিবিদ্যক শিক্ষা, গ্রিক তত্ত্ব কথার মতো তত সরল আর সহজবোধ্য নয়, হিব্রু শিক্ষার মতো ঈশ্বরভীতিকে কেন্দ্র করেও নয়। এই শিক্ষা গৌতমের প্রত্যক্ষ শিষ্যরাও সহজে অনুধাবন করতে পারেনি। আর এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে তাঁর তিরোধানের অনতিবিলম্বেই তার শিক্ষার মধ্যে বিকৃতি আসে, আসে স্থূলতা। ভারতে একটা অতি প্রচলিত ধারণা এই যে নির্দিষ্ট বিরতিতে পৃথিবীতে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি অবতাররূপে আবির্ভূত হন, যাকে বলা হয় বুদ্ধ, আর গৌতমের অনুসারীরা তাঁকে বুদ্ধ বলে স্বীকৃতি প্রদান করে। তিনি হলেন সর্বশেষ অবতার, যদিও বুদ্ধ নিজেকে কখনও এরকম দাবি করেননি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকেই তাকে নিয়ে বহু অলৌকিক কাহিনী বিস্তার লাভ করতে থাকে। মানুষের মন চিরকালই অলৌকিকতাকে নৈতিকতার উর্ধ্বে স্থান দেয়, আর গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটে।

তবু তাঁর এক বিরাট অর্জন পৃথিবীর বুকে রয়ে যায়। যদিও অধিকাংশ মানুষের চিন্তায় নির্বাণ বিষয়টি অতি উচ্চমাপের ধারণা, গৌতমের সরল জীবন মানুষের মাঝে এক উন্নত প্রেরণার জন্ম দেয়, অন্তত গৌতমের অষ্টমার্গ শিক্ষার মূল চেতনা মানুষের বোধগম্য ছিল, এ ছিল উন্নত জীবন দর্শনের এক মহান পথ। এর মাঝে ছিল মানসিক উন্নতির পথনির্দেশনা, সৎ, সরল উন্নত জীবনযাপনের পথ। যার মধ্যে ছিল মানসিক ঋজুতা, সঠিক উদ্দেশ্য, সঠিক বাক্য, সঠিক আচরণ আর সৎ জীবনযাপন আর ছিল বিবেকের তাড়না, ছিল নির্বিকার গন্তব্য।

২৯. মহারাজ অশোক

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পর, এই উন্নত মহৎ বৌদ্ধ শিক্ষা, যে শিক্ষার মূল কথা ছিল আত্মসংযম, তা পৃথিবীতে খুব সামান্যই প্রভাব ফেলতে পারে। তারপর এই শিক্ষা পৃথিবীর সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ এক সম্রাটের কল্পনাকে জয় করতে পেরেছিল।

www.nagorikpathagar.org

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি কীভাবে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ভারতবর্ষে এসে সিন্ধু নদের তীরে পুরুরাজের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। একজন গ্রিক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন একজন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আলেকজান্ডারের তাঁবুতে গিয়ে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন গঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করতে। আলেকজান্ডার আর এগোতে পারেননি, কারণ মেসিডোনীয় সৈন্য অজানা পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যেতে রাজি হয়নি। পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত গ্রিকদের সাহায্য ছাড়াই বিভিন্ন পার্বত্য উপজাতির সহায়তা নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হন। উত্তর ভারতে তিনি এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন আর শেষ পর্যন্ত ৩০৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পাঞ্জাবে প্রথম সেলিউকাসকে আক্রমণ করে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের শেষ গ্রিক নিশানা মুছে ফেলেন, তাঁর পুত্র সাম্রাজ্যকে আরো প্রসারিত করেন আর নাতি অশোক ২৬৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আফগানিস্তান থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের অধিশ্বর হয়ে বসেন।

প্রথমে অশোক তার পিতা ও পিতামহের পদাংক অনুসরণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করতে চেয়েছিলেন। ২৫৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি কলিংগ আক্রমণ করে জয়লাভ করেন তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তাঁর মনে যুদ্ধের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা জাগে। আর কখনও তিনি যুদ্ধের কথা ভাবেননি। তিনি বুদ্ধের শান্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, আর ঘোষণা করেন এরপর ধর্মের পথেই তিনি জয় করতে চান।

তার ২৮ বছরের রাজত্ব বিক্ষুব্ধ বিশ্ব ইতিহাসে শান্তির এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সারা ভারতবর্ষে তিনি কূপ খনন আর বৃক্ষরোপণের অভিযান শুরু করেন। তিনি হাসপাতাল স্থাপন করেন আর ঔষধি বৃক্ষের উদ্যান গড়ে তোলেন। তিনি ভারতবর্ষে উপজাতিসমূহ এবং অধীনস্থ রাজ্যসমূহের উন্নতির জন্য মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি বুদ্ধের বাণী প্রচারকদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করেন আর তাদের রচিত সাহিত্যকে উৎসাহিত করেন। কারণ মহান ভারতীয় শিক্ষা গুরুর সরল শিক্ষায় অতি দ্রুত বিকৃতি আসতে থাকে, কুসংস্কারের অপচ্ছায়া বিস্তার করে। অশোকের প্রেরিত ধর্ম প্রচারকরা কাশ্মীর, পারস্য, সিংহল এমনকি আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত ছুটে যান।

এমনই ছিলেন মহান সম্রাট অশোক। তাঁর যুগের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক বেশি অগ্রসর। তাঁর আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি কোনো রাজপুত্র বা সংগঠন রেখে যাননি, আর তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই ক্ষয়িষ্ণু ভারতবর্ষে তার গৌরবগাঁথা স্মৃতি হয়ে রয়ে যায়। শক্তিশালী সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ্য সমাজ সর্বদাই তার সরল ও খোলামেলা বৌদ্ধ শিক্ষার বিরোধিতা করে এসেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্ম উদ্ভট দেবদেবী আর অসংখ্য শ্রেণিভেদ নিয়ে মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ পাশাপাশি চলতে থাকে। অতঃপর বৌদ্ধ প্রভাব ক্ষীণতর আর তার জায়গায় বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তবে

www.nagorikpathagar.org

ভারতে এর প্রভাব কমতে থাকলেও ভারতের বাইরে চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে, যেখানে আজও তার প্রভাব অটুট রয়েছে।

৩০. কনফুসিয়াস ও লাওৎসে

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যখন মানব জাতি যৌবনপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে, চলেছিল তখনকার দুই মহান ব্যক্তিত্ব কনফুসিয়াস ও লাওৎসের কথা আমাদের বলতে হবে।

ইতিহাসের এই বইয়ে এ পর্যন্ত চীনের কথা তেমন একটা বলা হয়নি। বর্তমানেও তৎকালীন ইতিহাস বেশ অস্পষ্ট। বর্তমানে নিউ চায়না খননকাজের মাধ্যমে অতীত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছে, যেমনটা হয়েছিল গত শতাব্দীতে ইউরোপে। বহু পূর্বেই প্রাচীন চীন সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল বিশাল নদী উপত্যকাগুলিতে প্রাচীন হেলিওলিথিক ধারা অনুসরণ করে। প্রাচীন সুমেরীয় ও মিশরীয় ধারা এখানেও বর্তমান ছিল, যেখানে ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক পুরোহিত বা পুরোহিত রাজা যারা মাঝে মধ্যেই রক্তোৎসর্গ করত। ছয় হাজার বছর আগে মিশর ও সুমেরিয়ায় যে ধরনের জীবনধারা ছিল, এখানেও তেমনটাই ছিল, অথবা হাজার বছর আগে যেমনটা ছিল মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতায়।

সুদূর অতীতে নরবলি থাকলেও পরে তা পশুবলিতে পরিণত হয় এবং সেটাও ইতিহাসের ঊষালগ্নে। আর এক ধরনের চিত্রলিপির উদ্ভব হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দেরও আগে। ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া যেমন মরুভূমি ও উত্তরের যাযাবরদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হত, ঠিক তেমনই চীনও উত্তরের বর্বরদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হত। তারা ছিল প্রায় একই রকমের ভাষাভাষী গোত্রের লোক যেমন হুন, মঙ্গোল, তুর্কি ও তাতার, তারা বিভক্ত হত, আবার একত্র হত যেমন হত ইউরোপ, মধ্য এশিয়ার ক্ষেত্রে নর্ডিকরা। এসব মঙ্গোলীয় জাতির লোকদের অধিকারে ঘোড়া ছিল নর্ডিকদেরও আগে আর এমনটা হতে পারে খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ অব্দের দিকে তারা আলতাই পার্বত্য এলাকায় লোহা আবিষ্কার করতে পেরেছিল, আর পশ্চিমের মতোই এসব যাযাবররা কোনো এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য গড়তে পেরেছিল আর তারা সভ্য বসতির অঞ্চল দখল করতে পেরেছিল।

এটা খুবই সম্ভব যে আদি চৈনিক সভ্যতা মোটেই মঙ্গোলীয় ছিল না, ঠিক যেমনটা পশ্চিম এশিয়া বা ইউরোপীয় সভ্যতা নর্ডিক বা সেমিটিক ছিল না'। হতে পারে আদি চৈনিক সভ্যতার সাথে মিশরীয়, সুমেরীয় বা দ্রাবিড় সভ্যতার কোনো যোগসূত্র ছিল। আর যখন রেকর্ডভুক্ত ইতিহাস পাওয়া গেল তত দিনে অনেক বিজয়

www.nagorikpathagar.org

আর পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটে গেছে। যাহোক ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আমরা দেখতে পাই চীনে অনেক নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়ে গেছে, আর কম-বেশি সবাই এক মহান সমাজতান্ত্রিক পুরোহিত অধিরাজের আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কর প্রদান করছে। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। ১১২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শ্যাঙ রাজবংশের অবসান হলে শ্যাঙদের স্থান দখল করল চাও রাজবংশ এবং তারা এক ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল আর সেটা ছিল ভারতে অশোক আর মিশরে টলেমির সমসময়ে। দীর্ঘ চাও শাসনের শেষ দিকে চীন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। হুন জাতির লোকেরা চড়াও হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় রাজ্যগুলি কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। চীন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তি উল্লেখ করেন যে সে সময় চীনে পাঁচ-ছয় হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। চীনাদের কথায় এ সময়টাকে বলে বিশৃঙ্খলার যুগ। তবে এই বিশৃঙ্খল যুগেও অনেক বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড ঘটেছে আর শিল্পসংস্কৃতির অনেকগুলি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। চীনাদের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা নিশ্চিত হব সেখানেও মিলেটুস আর এথেন্স, পার্গেমাম পার মেসিডোনিয়ার মতো সভ্যতার কেন্দ্র। তবে এ নিয়ে এখানেই বিরতি দিতে হবে কারণ এসময়কার চীন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আমাদের অজানা।

বিভক্ত গ্রিসে ঠিক যেমন ছিল দার্শনিক আর ইহুদি নবী, ঠিক তেমনি বিশৃঙ্খল চীনেও এই সময়টাতে ছিল দার্শনিক আর শিক্ষক। এসব ক্ষেত্রে অনিরাপত্তা আর অনিশ্চয়তা উন্নত মানসিকতা অর্জন ত্বরান্বিত করেছে। কনফুসিয়াস ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান আর লু প্রদেশে তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। গ্রিসের মতোই তিনি এখানে তার শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারের জন্য একটা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চীনের অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা তাকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তিনি এক আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উন্নত জীবনযাপনের চিন্তা করেছিলেন, আর তিনি এক রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রে ঘুরে বেরিয়েছিলেন একজন রাজার খোঁজে; যিনি তার প্রশাসনিক ও শিক্ষাদান চিন্তাকে বাস্তব রূপদান করতে পারবেন। সেই স্বপ্নের রাজপুত্রের সন্ধান তিনি কোনো দিনই পাননি, তবে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আবর্তে পড়ে তার সংস্কার ভাবনা আর শিক্ষণ প্রস্তাব নস্যাৎ হয়ে যায়। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে দেড় শতাব্দী পর গ্রিক দার্শনিক প্লেটোও একজন আদর্শ রাজপুত্রের সন্ধান করেছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তিনি সাইরাকিউসের শাসক ডায়োনিসাসের পরামর্শক ছিলেন।

কনফুসিয়াস হতাশা নিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। একজন বুদ্ধিমান রাজারও জন্ম হলো না, যিনি আমাকে তাঁর শিক্ষক মনে করে; তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, "আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আমার সময়ের মৃত্যু হলো।" তবে তার শিক্ষা তিনি যতটা কল্পনা করেছিলেন তার চেয়ে অধিক মূল্যবান হয়ে দেখা দিয়েছিল, যার সাংগঠনিক শক্তি চীনা জনগণের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। চীনারা তাঁকে তিনজন মহান শিক্ষকের অন্যতম মনে করে, অপর দুজন বুদ্ধ ও লাওৎসে।

www.nagorikpathagar.org

কনফুসিয়াসের শিক্ষার সারকথা ছিল অভিজাত শ্রেণীর সত্যিকারের জীবনযাত্রা। তার চিন্তার মূলকথা ছিল আত্মোন্নতি আর গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা ছিল আত্মবিলুপ্তির মাঝে প্রশান্তি, আর গ্রিকদের বহির্বিশ্বের জ্ঞান এবং ইহুদিদের ন্যায়পরায়ণতা। কনফুসিয়াস ছিলেন সবচেয়ে বেশি গণমুখী শিক্ষক। জগতের বিশৃঙ্খলা আর দুঃখকষ্ট তাকে পীড়িত করত। পৃথিবীকে সুন্দর করার জন্য মানুষের মহত্ত্ব অর্জন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের আচরণকে পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি সঠিক নিয়ম প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন; একজন নম্র আত্মনিয়ন্ত্রিত গণমুখী ভদ্রলোক। সুশৃঙ্খল নিয়মনিগড়ে তিনি চীনকে বাঁধতে চেয়েছিলেন।

লাওৎসের শিক্ষা, যিনি দীর্ঘদিন চাও রাজবংশের রাজকীয় লাইব্রেরির দায়িত্বে ছিলেন, তিনি কনফুসিয়াসের চেয়ে অনেক বেশি রহস্যময় আর দুর্বোধ্য ছিলেন। তার মানসিকতা ছিল স্টোয়িকদের মতো সুখদুঃখে ঔদাসীন্য। সুখ ভোগ আর ক্ষমতা লিপ্সা থেকে দূরে থেকে সরল জীবনযাপন ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর লেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দুর্বোধ্য, তিনি ধাঁধার মধ্য দিয়ে লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার শিক্ষার মধ্যে অনেক প্রক্ষেপ, অনেক বিস্তৃতি রূপকল্প ঢোকানো হয়েছিল, যেমনটা হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের বেলাতেও। চীনে ও ভারতের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো প্রাচীন ধ্যান ধারণার মাঝে অদ্ভুত, অলৌকিক ও অযৌক্তিক গালগল্পের অনুপ্রবেশ ঘটানো বৌদ্ধবাদ ও তাওবাদ (লাওৎসের তত্ত্বকে এভাবেই বলে চীনারা), চীনে যেমনটা আজকাল দেখতে পাই তা হলো সাধু, মন্দির, পুরোহিত নৈবেদ্য নিবেদনের প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতি, অবশ্য মিশর ও সুমেরীয়ার বলি প্রথা থেকে বেরিয়ে আসা। তবে কনফুসিয়াসের শিক্ষার মাঝে প্রক্ষেপ তেমন বেশি হয়নি, কারণ তা ছিল সরল, ঋজু আর সহজবোধ্য।

হোয়াংহো নদীর উপত্যকার উত্তরে চীন বেশি করে কনফুসীয় মতাবলম্বী ছিল আর ইয়াং সিকিয়াং উপত্যকার দক্ষিণে চীন ছিল তাও মতাবলম্বী। সে সময় থেকেই এই দুই মতাবলম্বীর মধ্যে ভাবধারাগত এক বিরোধ বর্তমান আছে চীনে, সেটা হলো উত্তরের ভাবধারা আর দক্ষিণের ভাবধারা। পরবর্তীকালে পিকিং আর নানকিং; এক দিকে ঋজু রক্ষণশীল প্রশাসনিক মানসিকতার উত্তর, আর অন্য দিকে সন্দেহবাদী, কৌশলী, ঢিলেঢালা নিরীক্ষাধর্মী দক্ষিণ।

চীনের এই গোলমেলে বিভক্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, চাও রাজবংশ এতটাই দুর্বল আর নিন্দিত হয়ে পড়ে যে লাওৎসে অসুখী মন নিয়ে রাজনুকূল্য ছেড়ে নিভৃত ব্যক্তিগত জীবনযাপনে ফিরে যান। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুটি অধস্তন শক্তি সামনে উঠে আসে, তার মধ্যে একটা ৎসী আর অন্যটা ৎসীন। উভয়েই উত্তরের শক্তি, আর দক্ষিণের ইয়াংসি উপত্যকায় শক্তি অর্জন করে চু, যা ছিল এক আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তি, অবশেষে ৎসী ও ৎসীনরা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের মৈত্রি জোট তৈরি করে চুদের দমন করে, চীনে অস্ত্রবিরতি ও শান্তি স্থাপন করা হয়। ৎসীনরা শক্তির দিক দিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। অবশেষে ভারতে অশোকের সময়ে ৎসীন সম্রাট চাও সম্রাটের জাহাজ অধিকার করে নেয়।

www.nagorikpathagar.org

তার পুত্র শি হুয়াং তিকে (২৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যিনি রাজা আর ২২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট হন) চীনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সার্বজনীন সম্রাট বলে মান্যতা দেওয়া হয়।

শি হুয়াং তি ৩৬ বছর ধরে রাজা এবং সম্রাটরূপে রাজত্ব করেন। এদিক থেকে তিনি আলেকজান্ডারের চেয়ে অধিক ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁর শক্ত সমর্থ শাসনকাল চীনা জনগণের জন্য এক সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ যুগের সূচনা করে। উত্তরের মরুভূমি থেকে আগত হুন আগ্রাসীদের তিনি শক্ত হাতে দমন করেন, আর সেই বিরাট কাজ চীনের প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন যা আক্রমণকারীদের জন্য শেষ সীমা বলে নির্ধারিত হয়।

৩১. ইতিহাসে রোমের অভ্যুদয়

পাঠকগণ সভ্যতার ইতিহাসেই একটা সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ করেন; যদিও ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে সুউচ্চ পর্বতের প্রতিবন্ধকতা আর রয়েছে মধ্য এশিয়া আর ভারতের মধ্যভাগের পর্বতমালা। প্রথমত, হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচীন পৃথিবীর উর্বর নদী উপত্যকাসমূহে গড়ে ওঠে হেলিওলিথিক সংস্কৃতি, যার মূল বৈশিষ্ট্য মন্দিরকেন্দ্রিক ও পুরোহিততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। স্পষ্টতই এই সভ্যতার আদি ধারক বাহক সেসব শ্যামাঙ্গ জাতি, যারা ছিল মানব সভ্যতার কেন্দ্রে। তারপর চলে এল ঋতুনির্ভর ঘাসের দেশের পরিযায়ী জাতিসমূহ, যারা আদিম সভ্যতার ওপর তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই শুধু চাপিয়েছিল; তাই নয়, ভাষারও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল। তারা বিভিন্ন জায়গায় নানামুখী অগ্রগতির সূচনা করেছিল। মেসোপটেমিয়ায় প্রথমে এলামাইট, তারপর সেমাইট, অবশেষে নর্ডিক, মেডিস, পারসিক, গ্রিক যারা জুগিয়েছিল উজ্জীবক প্রণোদনা। ঈজিয়ান অঞ্চলে ছিল গ্রিকরা, ভারতে আর্যভাষীরা, মিশরে অনুপ্রবেশ ক্ষীণ হলেও প্রচলিত পুরোহিততন্ত্রে তারা পরিবর্তন এনেছিল, চীনে হুনরা জয় করেও পূর্বজদের মাঝে বিলিন হয়ে গিয়েছিল। চীনারা হয়ে যায় মঙ্গোলীয় ঠিক যেমনটা উত্তর ভারতীয়রা হয়ে যায় আর্য আর মেসোপটেমিয়া হয়ে যায় সেমিটিক আর্য। যাযাবররা সর্বত্রই যেমন ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, তেমনি জাগিয়েছিল নতুন মনোবল, স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা, আর নৈতিক উন্নয়ন। আবহমান কালের বিশ্বাসে তারা প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, তারা আবদ্ধ মন্দিরের কোটরে সূর্যালোক ঢুকিয়েছিল। তাদের রাজারা পুরোহিতও ছিল না, ঈশ্বরের অবতারও ছিল না, তারা ছিল সহযোদ্ধাদের নেতা। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিবর্তে জেগে উঠছে নতুন নৈতিক ও বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা যে মনোবল মানবজাতির পরবর্তী অগ্রগতিতে কখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। আমরা দেখতে পাই শাসকগোষ্ঠী এবং সমৃদ্ধ সংখ্যাল্প শ্রেণীর মধ্যে লিখন ও পঠনের ঐতিহ্য গড়ে উঠছে। এগুলি আর শুধুমাত্র

www.nagorikpathagar.org

পুরোহিতদের অধিকাররূপে সংরক্ষিত থাকেনি। অশ্বের আগমন ও রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ফলে যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। ধাতব মুদ্রার উদ্ভব ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়।

এবার আমরা সুদূরপ্রাচ্য চীন থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে পশ্চিমের ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় নিবদ্ধ করব। এখানে আমরা লক্ষ করব অতি গুরুত্বপূর্ণ এক নগরী রোমের উত্থানপর্ব, যা মানব ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

এ যাবৎ আমরা ইতালি সম্পর্কে তেমন কিছু বলিনি। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের আগে এ অঞ্চলটি ছিল অতি অল্প বসতির পর্বত অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চল। আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এখানে এসে ছোট ছোট শহর ও নগর গড়ে তোলে। আর সর্বদক্ষিণ প্রান্তে ছিল গ্রিক অধ্যুষিত অঞ্চল; মহান পায়েস্তামের ধ্বংসাবশেষ প্রাথমিক গ্রিক জনবসতির মহত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বুকে ধারণ করে রয়েছে। উপদ্বীপের মাঝামাঝি অঞ্চলে এক অনার্য জাতি এট্রুস্কানরা, যারা ছিল ঈজিয়ানদের সমগোত্রীয়, নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারা বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীকে পরাস্ত করে স্বাভাবিক আর্য ধারাকে পাল্টে দিয়েছিল। প্রথম দিকে রোম ছিল অগভীর টাইবার উপত্যকার এক ছোট্ট বাণিজ্যিক শহর। সেখানে ছিল এট্রুস্কান রাজার অধীনে ক্ষুদ্র এক লাতিন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল থেকে জানা যায়, রোমের প্রতিষ্ঠাকাল ৭৫৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, যা মহান ফিনিশীয় নগর কার্থেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মাত্র অর্ধ শতাব্দী পরে, আর অলিম্পিয়াডের ২৩ বছর পরে।

সেই ঘটনাবহুল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে (৫১০ খ্রিষ্টপূর্ব) এট্রুস্কান রাজারা বিতাড়িত হন আর সে সময় রোমে এক অভিজাত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে প্যাট্রিসিয়ানরা প্লিবিয়ানদের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে রোমের ইতিহাস ছিল অভিজাতদের বিরুদ্ধে প্লিবিয়ানদের সংগ্রাম, যাতে তারাও প্রশাসনে অংশ নিতে পারে। এই সংগ্রামের সমান্তরাল ঘটনা গ্রিসে প্রত্যক্ষ করাও কঠিন নয়, গ্রিকরা যাকে বলত অভিজাততন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানরা প্রাচীন পরিবারের অধিকাংশ বন্ধন ভেঙে ফেলে তাঁদের সাথে কর্মক্ষেত্রের সাম্য আনতে পেরেছিল, আর রোমের কাছেও স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কারণ অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ বর্তমান থাকলেও রোমক শক্তি সম্প্রসারিত হচ্ছিল বাইরে।

রোমান শক্তির সম্প্রসারণ শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। এ পর্যন্ত তারা এট্রুস্কানদের সাথে শুধু অসফল যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। রোমের মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভিয়াইতে এট্রুস্কানদের একটা শক্ত দুর্গ ছিল, যা রোমানরা কখনই কব্জা করতে পারেনি। যাহোক খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩৪ অব্দে এট্রুস্কানদের জন্য একটা বড় দুর্ভাগ্য নেমে আসে। সিসিলির সাইরাকিউসে গ্রিকরা তাদের নৌবহর ধ্বংস করে ফেলে। তাছাড়া একই সময়ে উত্তর থেকে একটা নর্ডিক উপজাতি গলরা তাদের ওপর হামলে পড়ে। রোমান আর গলদের মাঝখানে পড়ে এট্রুস্কানরা ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

রোমানরা ভিয়াই দখল করে নেয়। গলরা রোম পর্যন্ত এগিয়ে আসে তবে রাজধানী দখল করতে পারেনি। রাতের অন্ধকারে তাদের একটা আক্রমণ হাঁসের প্যাকপ্যাকানিতে ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আক্রমকরা উত্তর ইতালিতে ফিরে যায়।

গল আক্রমণ রোমকে দুর্বল না করে আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলে। তারা এট্রুস্কানদের পরাজিত করে অঙ্গীভূত করে নেয় এবং আর্নো থেকে ন্যাপলস্ পর্যন্ত সমগ্র মধ্য ইতালিতে তাদের দখল বহাল করে। এতে তাদের ইতিহাস প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের কাছাকাছি এসে পড়ে। ইতালিতে যখন তাদের বিজয় রথ এগিয়ে চলছিল, ঠিক একই সময়ে মেসিডোনিয়া ও গ্রিসে ফিলিপ তার ক্ষমতা সংহত করছিলেন, আর আলেকজান্ডারের জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছিল মিশর ও সিন্ধুদের দিকে। আলেকজান্ডারের পতনের পর রোমানরা পূর্ব দিকে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে।

রোমক শক্তির উত্তরে গলদের প্রাধান্য রয়ে যায়; দক্ষিণে গ্রিক বসতি ম্যাগনা গ্রেসিয়া অর্থাৎ ইতালির গোড়ালি ও পদাঙ্গুলিতে। গলরা ছিল সহিষ্ণু ও যুদ্ধংদেহী জাতি, আর রোমানরা তাদের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য দুর্গ ও দুর্গসদৃশ সুরক্ষিত বসতি গড়ে তুলেছিল। দক্ষিণের গ্রিক বসতি টারেন্টাম (বর্তমানে টারান্টো) রোমানদের জন্য ততটা ভয়ের কারণ ছিল না।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি কীভাবে আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তার সেনাধ্যক্ষ ও অন্তরঙ্গ সাথীদের মাঝে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায়। এই অতি উৎসাহীদের ছিল তার এক আত্মীয় যার নাম পাইরাস, যিনি এপিরাসে তার কব্জা মজবুত করতে পেরেছিলেন, যে জায়গাটা ছিল ইতালির গোড়ালির দিকে আড্রিয়াটিক সাগর পার হয়ে। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ফিলিপের মতো "ম্যাগনা গ্রেসিয়া" পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তার আয়ত্তে ছিল সেকালের বিচারে বেশ দক্ষ আধুনিক সেনাবাহিনী আর ছিল বড় সড় এক পদাতিক বাহিনী। আর থেসালির অশ্বারোহী বাহিনী, যা ছিল মেসিডোনীয় অশ্বারোহীদের মতোই সুদক্ষ, ছিল বিশটি লড়াকু হস্তি। তিনি ইতালি আক্রমণ করে ভীষণ যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করে দুটি উল্লেখযোগ্য স্থান হেরাক্লিয়া (২৮০ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং অ্যাস্কুলাম (২৭৯ খ্রিষ্টপূর্ব) থেকে বিতাড়িত করে সিসিলির দিকে অগ্রসর হন।

তবে এখানে এসে তিনি রোমানদের চেয়ে অনেক বেশি দুর্জয় শক্তির মুখোমুখি হন, আর সেটা হলো ফিনিশীয় বাণিজ্য নগরী কার্থেজ। সম্ভবত সেকালের পৃথিবীতে ওটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী। সিসিলি কার্থেজের এত কাছে ছিল যে সেখানে নতুন এক আলেকজান্ডারকে স্বাগত জানানো কার্থেজবাসীদের কাছে মোটেই কাম্য ছিল না। মাত্র অর্ধশতাব্দী পূর্বে কার্থেজের মাতৃসদৃশ শহর টায়ারের জন্য কী ঘটেছিল সেটা তাদের ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কাজেই তারা রোমে একটা নৌবহর পাঠিয়েছিল যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর তারা সমুদ্রে পাইরাসের সংযোগ

www.nagorikpathagar.org

বিচ্ছিন্ন করে দিলো, আর ন্যাপ্‌ল্‌স্‌ ও রোমের মাঝামাঝি বেনিডেন্টামে তাদের ক্যাম্প আক্রমণ করতে গিয়ে সাংঘাতিক মার খেয়েছিল।

আর হঠাৎ করে এপিরাস থেকে এক দুঃসংবাদ পাওয়ায় তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। গলরা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসছে। তবে এবার তারা ইতালির মধ্য দিয়ে আসছে না, কারণ রোমান সীমান্ত তখন সুরক্ষিত দুর্জেয়। তারা ইলিরিয়ার (বর্তমান সার্বিয়া ও আলবেনিয়া) মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে মেসিডোনিয়া ও এপিরাসের দিকে। রোমানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সমুদ্রে কার্থেজীয়দের দ্বারা আতংকিত হয়ে আর স্বগৃহে গলদের দ্বারা আতংকিত হয়ে পাইরাস দেশে ফিরে এলেন দেশজয়ের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে (২৭৫ খ্রিষ্টপূর্ব) আর রোমের শক্তি সম্প্রসারিত হলো মেসিনা প্রণালী পর্যন্ত।

প্রণালীটির সিসিলীয় প্রান্তে ছিল গ্রিক নগর মেসিনার অবস্থান আর শিগগিরই এটা একদল জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। কার্থেজীয়রা, যারা ইতিমধ্যেই সিসিলিতে প্রভুত্ব করতে শুরু করেছে আর সাইরাকিউসের মিত্র হয়ে উঠেছে, তারা জলদস্যুদের বিতাড়িত করে সেখানে একটা কার্থেজীয় সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করে। এদিকে জলদস্যু রোমানদের সাহায্য প্রার্থনা করায় রোমানরা তাদের প্রার্থনায় সায় দিলো। কাজেই মেসিনা প্রণালীর দুই প্রান্তে দুই পরাশক্তি কার্থেজ আর রোম মুখোমুখি অবস্থানে এসে গেল।

৩২. রোম ও কার্থেজ

খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৪ অব্দে রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, যাকে বলা হয় পিউনিক যুদ্ধ। সেই একই বছরে অশোকের রাজত্বের শুরু বিহারে, শিহুয়াংতি ছোট্ট শিশু, আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে চলছে বিজ্ঞানের গবেষণা, আর বর্বর গলরা এশিয়া মাইনরে পার্গেনামের কাছ থেকে কর আদায় করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের দূরত্বের বাধা তখনও দূর হয় নি। কাজেই স্পেন, ইতালি, উত্তর আফ্রিকা আর ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় রোম আর সেমিটিক শক্তির মাঝে যে চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল তার খবর খুব সামান্যই রাখত। সেই যুদ্ধের রেশ আজও কাটেনি পৃথিবীতে।

রোম কার্থেজের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করল ঠিকই, কিন্তু আর্য আর সেমিটিকদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হয়ে গেল না। আজকের পৃথিবীতে যে বিবাদ বিসংবাদ তা অতীতের রেশ ধরেই চলছে।

প্রথমে পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয় ২৬৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মেসিনার জলদস্যুদের সাথে। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ রূপ নেয় সিসিলি অধিকার করার, অবশ্য সাইরাকিউসের গ্রিক

www.nagorikpathagar.org

রাজাকে বাদ দিয়ে। সমুদ্রের আধিপত্য প্রথমত কার্থেজীয়দের হাতেই ছিল। তাদের ছিল বড় বড় যুদ্ধজাহাজ, এত বড় যুদ্ধজাহাজ ইতিপূর্বে আর কখনোই নির্মিত হয়নি যাতে ছিল পাঁচ সারি দাঁড় আর বিশাল গলুই। দুই শতাব্দী পূর্বে সালামিসের যুদ্ধে যে যুদ্ধজাহাজ ব্যবহৃত হয় তাতে ছিল প্রত্যেক পার্শ্বে তিন স্তরের দাঁড়ের সারি। তবে রোমানদের নৌবিদ্যায় অভিজ্ঞতা কম থাকলেও অসাধারণ উদ্যম ও তৎপরতায় কার্থেজীয়দের অতিক্রম করে গিয়েছিল। তারা তাদের নৌবহরে বিশেষ করে গ্রিক নাবিকদের নিয়োগ দিয়েছিল। তারা আবিষ্কার করেছিল শত্রুবহর আটক করে তাতে আরোহণের পদ্ধতি। কার্থেজীয়রা রোমান বহর আক্রমণ করতে এলে রোমানরা বিশাল বিশাল লোহার আকশি নিক্ষেপ করে কার্থেজীয় জাহাজ আটকে দিয়ে তাদের জাহাজে দলে দলে উঠে গিয়ে আক্রমণ করত। মিলায় (২৬০ খ্রিষ্টপূর্ব) ও একনমিসে (২৫৬ খ্রিষ্টপূর্ব) কার্থেজীয়রা দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়। তারা কার্থেজে নৌ অবতরণ রুখেছিল তবে পালের্মোতে পরাস্ত হয়। সেখানে তারা ১০৪টি হাতির বহর হারায়। রোমানরা এত বড় বিজয় ইতিপূর্বে আর কখনোই দেখেনি। এর পরে ঘটে রোমানদের দুটি পরাজয় আর একটি বিজয়। কার্থেজীয়দের শেষ নৌবহর পরাজিত হয় এগেশিয়ান দ্বীপে (২৪১ খ্রিষ্টপূর্ব)। এরপর কার্থেজীয়রা সন্ধি প্রার্থনা করে। সাইরাকিউসের রাজা হিয়েরোর ডমিনিয়ন বাদে সমগ্র সিসিলি রোমানদের আয়ত্তে চলে যায়।

পরবর্তী ২০ বছর ধরে রোম ও কার্থেজ তাদের সন্ধির শর্ত মেনে চলে। উভয়েরই স্বগৃহে অশান্তি চলছিল। দক্ষিণ থেকে গলরা ইতালির প্রতি আতংকের সৃষ্টি করছিল, যে আতঙ্ক দূর করতে তারা দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দিয়েছিল আর তেলামনের যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিল। রোম আল্পসের দিকে এগিয়ে যায়, আর আড্রিয়াটিক উপকূলে ইলিরিয়া পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। কার্থেজ অন্তর্কলহে বিপর্যস্ত হচ্ছিল, কর্সিকা ও সার্দিনিয়ায় বিদ্রোহ দমন করার মতো শক্তি তার ছিল না। শেষ পর্যন্ত রোম এগিয়ে এসে এই দুটি দ্বীপের বিদ্রোহ দমন করে নিজের অঙ্গীভূত করে নেয়।

সে সময় স্পেন ছিল কার্থেজীয়দের দখলে উত্তরে এব্রো নদী পর্যন্ত। ঐখানেই রোমানরা তাদের থামিয়ে দেয়, কার্থেজীয়দের এব্রো নদী পার হওয়ার কোনোরকম চেষ্টা রোমানরা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলে মনে করত। অবশেষে ২১৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এক কার্থেজীয় যুবক জেনারেল হানিবল রোমানদের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে এব্রো নদী অতিক্রম করে। সমগ্র ইতিহাসে তিনি ছিলেন এক গৌরবদীপ্ত জেনারেল। তিনি স্পেন থেকে রওনা দিয়ে আল্পস পর্বত পার হয়ে ইতালিতে ঢুকে পড়েন, আর গলদের রোমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে ১৬ বছর স্থায়ী দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সূত্রপাত করেন। ট্রানসিমেনে হ্রদ ও ক্যানের যুদ্ধে তিনি রোমানদের চরমভাবে পরাস্ত করেন আর তার সমগ্র ইতালি অভিযানে কোনো রোমান সেনাপতি তার সামনে দাঁড়াতে পারেনি। তবে একটা

www.nagorikpathagar.org

রোমকবাহিনী মার্সেইতে অবতরণ করে স্পেনের সাথে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তার কোন অবরোধ অভিজ্ঞতা ছিল না, আর তাই রোম দখল করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত নিজ দেশে নুমিদীয়দের বিদ্রোহ আশংকায় নিজেদের শহর রক্ষায় আফ্রিকায় ফিরে যায়, এর পর রোমানদের পাল্টা আক্রমণে নিজ দেশে জামার যুদ্ধে হানিবল প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পায় আর এ হারের নেতৃত্বে ছিল সিপিও আফ্রিকেনাস এল্ডার। জামার যুদ্ধের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের অবসান ঘটে (২০২ খ্রিষ্টপূর্ব) কার্থেজ আত্মসমর্পণ করে। সে স্পেন এবং তার যুদ্ধজাহাজ রোমানদের হাতে তুলে দেয়। একটা বিশাল অংকের ক্ষতিপূরণও দিতে হয়, আর হানিবলকে রোমানদের হাতে তুলে দিতে বলা হয়, তবে হানিবল এশিয়ায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন, সেখানে শত্রুদের হাতে ধরা পড়ার ভয় থেকে বাঁচতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

পরবর্তী ৫৬ বছর রোম ও শক্তিহীন কার্থেজের মধ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। ইতিমধ্যে রোম বহুধাবিভক্ত গ্রিসে তার অধিকার বিস্তার করে আর এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে তৃতীয় এন্টিয়োকাসকে পরাজিত করে, যিনি ছিলেন লিডিয়ার ম্যাগনেশিয়াতে এক নিঃসঙ্গ রাজা। মিশর, যা তখনও টলেমি বংশের অধীনে, পারগেনাম আর এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ দেশ রোমের অধীনস্থ মিত্রে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে দুর্বল পরাধীন কার্থেজ ধীরে ধীরে তার অতীত সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করতে থাকে। তার জেগে ওঠাকে রোম দেখতে থাকে বিদ্বেষ আর সন্দেহের চোখে। ছোটখাটো মতান্তর নিয়ে রোম আক্রমণ চালায় আর ঝটিকা আক্রমণে কার্থেজ দখল করে নেয় (১৪৬ খ্রিষ্টপূর্ব) রাস্তায় যুদ্ধ আর নরহত্যা চলতে থাকে ছয় দিন ধরে, সাংঘাতিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল এটা আর দুর্গের পতনের পর দেখা গেল রাজ্যের আড়াই লাখ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার অবশিষ্ট রয়েছে। বাদবাকি লোকদের দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয় আর গোটা কার্থেজ নগর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে মুছে ফেলার জন্য পুড়ে কালো হওয়া মাটিতে চাষ করে বীজ বপন করে দেওয়া হয়। এভাবে শেষ হলো তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ। পাঁচ শতাব্দী পূর্বে যেসব সেমিটিক রাজ্য আর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র একটা বাদে সবগুলি লোপ পেয়ে গেল। সেই একমাত্র রাজ্যটি হলো জুডিয়া যা সেলুকীয়দের হাত থেকে স্বাধীন হয়ে ম্যাকাবীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে তাদের বাইবেল প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছে যার মাধ্যমে ইহুদি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা আজও টিকে রয়েছে। এটা স্বাভাবিক যে কার্থেজীয় আর ফিনিশীয়রা যারা পরাজিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা এই সাহিত্যের মধ্যে তাদের একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিল। মোটামুটিভাবে তারা সারা পৃথিবীতে ব্যবসায়ী আর ব্যাংকার হিসেবে পরিচিত। সেমিটিকরা এদের সাথে মিশে যায়।

www.nagorikpathagar.org

৬. রোমান শক্তি ও তদীয় মিত্ররাজ্যসমূহের পরিলেখ (তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের প্রারম্ভে ১৫০ খ্রিষ্টপূর্ব)

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ ৩৫ ৯৯

www.nagorikpathagar.org

জেরুজালেম যা চিরকালই ইহুদিবাদের কেন্দ্র না হয়ে বরং প্রতীকরূপে পরিচিত, রোমানরা তাকে দখল করে নেয় ৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আর ৭০ খ্রিষ্টাব্দে নানা উত্থান-পতনের পর নিজেদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। মন্দিরটি ধ্বংস করে ফেলা হয়। ১৩২ খ্রিষ্টাব্দের একটা বিদ্রোহের ফলে ধ্বংসটা চূড়ান্ত হয়। আমরা আজ যে জেরুজালেম দেখি তা পরবর্তীকালে রোমানদের উদ্যোগেই পুনর্নির্মিত হয়। আগের ইহুদি মন্দিরের জায়গায় গড়ে ওঠে রোমান দেবতা জুপিটার ক্যাপিটোলিনাসের মন্দির আর ইহুদিদের শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

৩৩. রোম সাম্রাজ্যের বিস্তার

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে যে রোমক শক্তি পশ্চিমা বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যেসব শক্তির উত্থান ঘটেছিল নানা দিক দিয়েই তার থেকে ভিন্ন। প্রথমত, এটা কোন রাজতন্ত্র ছিল না বা এটা কোনো এক বিজেতার সৃষ্টি নয়। অবশ্য এটা বিশ্বে প্রথম প্রজাতন্ত্রও ছিল না, পেরিক্লেসের সময় অনেকগুলি রাজ্য এথেন্সের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল এবং তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। আর যে সময় কার্থেজ রোমের সাথে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন সে ছিল সার্দিনিয়া, কর্সিকা, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিস আর স্পেন ও সিসিলির অধিকাংশের প্রভু। তবে এটাই প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সাম্রাজ্য, যা বিলুপ্ত না হয়ে নতুন কলেবরে আবির্ভূত হয়। তবে এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল প্রাচীন সাম্রাজ্য যার কেন্দ্র ছিল মেসোপটেমিয়া আর মিশর থেকে অনেক পশ্চিমে। রোমের অবস্থান পশ্চিমে হওয়ায় সম্পূর্ণ নতুন এলাকা ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির লোকের সমাহার ঘটে। রোমান শক্তির সম্প্রসারণ ঘটে মরক্কো আর স্পেন পর্যন্ত আর শিগগিরই এগিয়ে চলে উত্তর পশ্চিমে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ব্রিটেন পর্যন্ত আর উত্তর-পূর্বে হাঙ্গেরি ও দক্ষিণে রাশিয়া পর্যন্ত। অপরপক্ষে এই শক্তি মধ্য-এশিয়া ও পারস্যকে ধরে রাখতে পারেনি, কারণ এগুলি তার প্রশাসনিক কেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বিপুলসংখ্যক নর্ডিক আর্য ভাষাভাষী জনগণ। কাজেই শিগগিরই তারা একাত্ম করতে পেরেছিল পৃথিবীর সকল গ্রিক অঞ্চল আর এর জনসংখ্যার বেশির ভাগই পূর্বতন যে কোনো সাম্রাজ্যের তুলনায় কম হেমিটিক ও সেমিটিক ছিল। প্রাক্তন যে কোনো সাম্রাজ্যের তুলনায় বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে রোমানরা পারস্য ও গ্রিসের দিকে হাত বাড়ায়নি। মেডিস ও পারস্যের শাসকগণ বহুকাল যাবৎ ব্যাবিলনীয় ধারাতেই অবস্থান করে। তারা রাজাধিরাজের মুকুট পরা বজায় রেখেছিল আর মন্দিরের দেবতাদের পৌরহিত্যের পদটিও কব্জা করে রেখেছিল। সেলুকীয় সম্রাটদের ছিল একই রকম দরবার আর শাসনব্যবস্থা যেমনটা ছিল নেবুচাদনেজারের আমলে। টলেমীয়রা

www.nagorikpathagar.org

পুরোপুরি মিশরীয় ফারাও হয়ে গিয়েছিল। তবে রোমানরা তাদের নিজস্ব নগরের শাসন চালাত আর বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে নিজেদের আইন বহাল রেখেছিল। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর আগে তাদের ওপর একমাত্র যারা প্রভাব ফেলেছিল তারা হলো গ্রিক। কাজেই রোম ছিল প্রথম সাম্রাজ্য যারা আর্যধারায় বিশাল এক সাম্রাজ্য পরিচালনা করে। এ যাবৎকালে ইতিহাসে এটা এক নতুন ধারা, এক সম্প্রসারিত আর্য প্রজাতন্ত্র। আগের যে ধারা ছিল কোনো এক বিজয়ীর অধীনে কোনো শস্য দেবতার মন্দিরকেন্দ্রিক রাজধানী নির্ভর সাম্রাজ্য তা আর টেকেনি। রোমানদেরও দেবতা ছিল, মন্দির ছিল, তবে গ্রিক দেবতার মতো তারাও ছিল অর্ধমানবীয় অমর স্বর্গীয় ব্যক্তি বিশেষ। সংকটের সময় রোমানদের রক্তোৎসর্গের প্রথা ছিল, এমনকি নরবলিও বিরল ছিল না, হয়তো এটা তারা ধার করেছিল তাদের ধূসর এট্রুস্কান যুগের শিক্ষকদের কাছ থেকে। তবে শীর্ষপর্যায় অতিক্রমের পর রোমের ইতিহাসে কখনোই পুরোহিত বা মন্দির বড় কোনো ভূমিকা পালন করেনি।

রোমান সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটেছিল, বলা যায় অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ; রোমান জনগণ অসচেতনভাবেই নিজেদের দেখতে পেল এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্বে, তবে তাদের শিক্ষানবিশ পর্বটাকে সফল বলা যায় না। শেষ পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য ধসে পড়ে। আর শতাব্দীর পর শতাব্দী আকৃতি ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। একশ বছরে তাদের যে পরিবর্তন এসেছিল, বাংলা বা মেসোপটেমিয়া বা মিশরে হাজার বছরেও সেই পরিবর্তন আসেনি। তাদের পরিবর্তনের ধারা ছিল অব্যাহত, কখনোই থিতু হতে পারেনি।

এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্পূর্ণই রয়ে যায়। রোমানরা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারে যে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল; আজকের ইউরোপ আর আমেরিকা বিশ্বব্যাপী শক্তি-বলয় নির্মাণ করতে গিয়ে একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

ইতিহাসের ছাত্রদের এটা পর্যবেক্ষণ করা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক সমগ্র রোমান যুগে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রেও কতটা পরিবর্তনের স্রোত বহমান ছিল। লোকের মনে একটা প্রবণতা আছে রোমান শাসনকে পরিপূর্ণ, স্থায়ী, দৃঢ়, সর্বাঙ্গ সুন্দর, মহৎ, চূড়ান্ত কিছুরূপে কল্পনা করা। ম্যাকলের *লেইজ অব অ্যানশিয়েন্ট রোম* বইয়ে দেখানো হয়েছে ক্যাটোসিপিও, জুলিয়াস সিজার, ডাইওক্লিশিয়ান, কনস্টান্টিন দ্য গ্রেট এবং তাদের দিগ্বিজয়, বাগ্মীতা, গ্লাডিয়েটরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ খ্রিষ্টীয় শহীদ ইত্যাদি সব কিছুকেই সুউচ্চ, মহান মর্যাদাবানরূপে চিত্রিত করা। এসব ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত।

রোমের বিস্তারকে আমরা চার স্তরে বিভক্ত করে দেখতে পারি। প্রথম পর্যায় শুরু হয় গলদের দ্বারা রোম আক্রমণ (৩৯০ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং শেষ হয় প্রথম পিউনিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এ পর্যায়টাকে আমরা বলতে পারি অঙ্গীভূতকরণ পর্যায়। সম্ভবত এ সময়টাকে বলা যায় রোমের ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পর্যায় হিসাবে।

www.nagorikpathagar.org

দীর্ঘকালীন প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের বিভেদ সমাপ্ত হয়ে যায়, এট্রুস্কান ভীতি দূর হয়, কেউই বিরাট ধনী বা নিতান্ত দরিদ্র ছিল না, অধিকাংশ লোকই ছিল গণচিন্তক। যতটা বোঝা যায় রাজ্য ছিল প্রজাতান্ত্রিক, ঠিক যেমনটা ছিল সপ্তদশ শতকের শেষ আর অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকান ইউনিয়ন, স্বাধীন কৃষকের প্রজাতন্ত্র। শুরুর দিকে রোম ছিল ছোট্ট এক রাজ্য যার আয়তন বিশ মাইল বর্গের বেশি নয়। তাকে যুদ্ধ করতে হয় শক্তসমর্থ সমগোত্রীয় রাজ্যসমূহের সাথে, অবশ্য সে তাদের ধ্বংস কামনা না করে সংযুক্তি কামনা করেছিল। শতাব্দীব্যাপী গৃহবিবাদ তাদের শিখিয়েছিল আপসকামিতা ও ছাড় দেওয়ার সংস্কৃতি। কোনো কোনো পরাজিত রাজ্য তাদের ভোটাধিকার লাভ করে। কেউ কেউ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে এবং রোমানদের সাথে বাণিজ্যিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের অধিকার লাভ করে। কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পূর্ব নাগরিকদের গ্যারিসন স্থাপন করা হয় আর সদ্য বিজিত এলাকাসমূহে কলোনি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বড় বড় রাস্তা নির্মাণ করা হয়। এসবের অনিবার্য পরিণতি ছিল ইতালির দ্রুত লাতিনীকরণ। ৮৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই ইতালির সব স্বাধীন জনগণকে রোমের নাগরিক গণ্য করা হয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যই এক সম্প্রসারিত নগরী। ২১২ খ্রিষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের সকল লোককে নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়।

সকল প্রবেশ্য নগরের অধিবাসীদের নাগরিকত্ব প্রদান ছিল রোমান সম্প্রসারণের এক কৌশল। এতে করে আগের দেশ জয় ও আত্মীকরণের ধারা পাল্টে গিয়েছিল।

তবে প্রথম পিউনিক যুদ্ধে সিসিলি বিজয় ও সংযুক্তিকরণ পূর্বের রীতিতেই হয়েছিল। আর এর আশেপাশেই আর একটি ধারার উদ্ভব ঘটেছিল। সিসিলিকে গণ্য করা হত পরাজিত শিকার। একে ঘোষণা করা হয়েছিল রোমের এস্টেটরূপে। এর উর্বর মাটি আর কর্মঠ জনগণকে রোমের সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার মনে করা হত। প্যাট্রিসিয়ান আর ধনী প্লিবিয়ানরাই ছিল এর অংশীদার। তাছাড়া যুদ্ধের ফলে প্রচুর কৃতদাস তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের পূর্বে অধিবাসীরা ছিল মূলত কৃষক নাগরিক। সামরিক সেবা প্রদান ছিল একাধারে সুযোগ ও দায়। সক্রিয় সামরিক দায়িত্বে নিযুক্তিকালে তাদের খামারগুলি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ত আর কৃষির দায় বহন করত কৃতদাসরা। ফিরে এসে দেখত সিসিলিতে তাদের কৃতদাসদের কৃষি দেশের কৃষির সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে। সময় বদলে গেছে। প্রজাতন্ত্র তার চরিত্র পাল্টেছে। রোমের আয়ত্তাধীন সিসিলিই শুধু নয়, স্বগৃহের সাধারণ মানুষও ধনী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ছে। রোম এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করল। অর্থাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধনীদের রিপাবলিক।

পরবর্তী দু'শ বছর রোমের সৈনিক-কৃষকরা স্বাধীনভাবে সরকারে অংশ লাভের সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল, একশ বছর ধরে তারাই ছিল সুবিধাভোগী। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ তাদের সমস্ত অর্জন নস্যাৎ করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

তাদের নৈর্বাচনিক মূল্যও ক্ষীণ হয়ে আসে। রোমের প্রশাসনিক ক্ষমতা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ও অধিক গুরুত্ববহ ছিল সিনেট। সরকারের এই বিভাগে প্রথমে ছিল শুধু প্যাট্রিসিয়ানরা, তারপর সর্বস্তরের খ্যাতিমানরা। তাদের আহ্বান করত কিছু ক্ষমতাধর কর্মকর্তা যেমন কনসাল বা সেন্সর। ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডসের মতোই এখানে সমাবেশ ঘটেছিল ভূস্বামী, খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ, বড় বড় ব্যবসায়ী ইত্যাদি। আমেরিকার সিনেটের চেয়ে ব্রিটিশ হাউস অব্ লর্ডসের সাথেই এর সাদৃশ্য ছিল বেশি। পিউনিক যুদ্ধের পরবর্তী তিনশ বছর ধরে এই সিনেটই ছিল রোমের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। দ্বিতীয় অঙ্গটি ছিল পপুলার অ্যাসেম্বলি। এতে ছিল রোমের সর্বসাধারণ জনগণ। রোম যখন ছিল মাত্র বিশ মাইল বর্গের ছোট্ট এক রাজ্য তখন এটাই ছিল সম্ভাব্য সমাবেশ। তবে রোমের নাগরিকত্ব যখন ইতালীয় ইতালির সীমার বাইরে বিস্তৃত হলো, তখন আর এটা রাষ্ট্রীয় কাজ সামাল দিতে পারছিল না। এর সভা আহ্বান করা হত নগর প্রাকার থেকে সিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে, তারপর এটা ধীরে ধীরে পরিণত হলো ইতর ভদ্র নিম্নশ্রেণীর মানুষের সংগঠন। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই সংগঠনটি সিনেটের ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারত, আর সাধারণ মানুষের দাবি ও অধিকার আদায়ের কার্যকরী সংস্থা ছিল। পিউনিক যুদ্ধের পর এটা বিজিত জনগণের নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাহীন এক নামমাত্র সংস্থায় পরিণত হয়।

রোমান সাম্রাজ্যে কখনই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়নি। নাগরিকদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর মতো প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা কারো মাথায় আসেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা মাথায় রাখা ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য বিশেষ আবশ্যক। জনগণের অ্যাসেম্বলি কখনো আমেরিকার হাউস অব রিপ্রেজেন্টটিভ বা ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের সমতুল্য হয়ে ওঠেনি। তাত্ত্বিকভাবে সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান হলেও বাস্তবে তেমন কিছুই না।

অতএব দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে রোমের সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিল অতিশয় নিম্নমানের। সে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল, তাকে প্রায়ই কৃষিখামার হারাতে হয় আর এসবের প্রতিকারের জন্য তার কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। কাজেই প্রতিকারের একটাই উপায় আর তা হলো আন্দোলন আর বিদ্রোহ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথা বলতে প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব শতকে নিষ্ফল বিদ্রোহই বোঝাত। এখানে অবশ্য সেসব সূক্ষ্ম জটিল রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার অবকাশ নেই কীভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে জোতদারি ভেঙে কৃষকের হাতে চাষযোগ্য জমি ফেরত গিয়েছিল অথবা আংশিক বা পূর্ণ ঋণ মওকুফের ব্যাপার। বিদ্রোহ ছিল, ছিল গৃহযুদ্ধ ইতালির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। দাস বিদ্রোহ কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে কিছু প্রশিক্ষিত গ্ল্যাডিয়েটরও ছিল। দুই বছর ধরে স্পার্টেকাসকে বিসুবিয়াসের জ্বালামুখে আটকে রাখা হয়েছিল, কারণ বিসুবিয়াসকে মনে করা হত নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি। শেষ পর্যন্ত, চরম নিষ্ঠুরতার সাথে এই বিদ্রোহ দমন করা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল। ছয় হাজার বন্দি স্পার্টেকাসকে এপিয়ানের রাজপথে, যে পথ রোম থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, সেই রাজপথের পাশে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় (৭১ খ্রিষ্টপূর্ব)।

সাধারণ মানুষকে যারা দমিয়ে রাখছে আর অপদস্থ করছে তাদের বিরুদ্ধে কখনোই মাথা তুলতে পারেনি, তবে সেসব সম্পদশালী বড়লোকেরা নিজেদের এবং সাধারণের জন্য বিপদ ডেকে এনেছিল সৈন্যবাহিনীর দিক থেকে।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের আগে রোমান সৈন্যবাহিনী ছিল মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষক যারা নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে ঘোড়ায় চড়ে বা পায়ে হেঁটে যুদ্ধযাত্রা করত। এটা ছিল বেশ ভালো এবং সহজলভ্য সমরশক্তি, তবে এটা এমন কোনো বাহিনী ছিল না, যা দেশের বাইরে গিয়ে দীর্ঘ অভিযানের সহিষ্ণুতা দেখাতে পারে। তাছাড়া কৃতদাসের সংখ্যা যেমন বাড়ছিল এস্টেটও তেমনি বেড়ে চলেছিল, স্বাধীনচেতা কৃষক যোদ্ধাদের সরবরাহ কমে আসছিল। একজন বেশ জনপ্রিয় নেতা মেরিয়াস যার নাম, তিনি একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। কার্থেজীয়দের বিতাড়নের পর উত্তর আফ্রিকায় এক অর্ধ-বর্বর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা ছিল নুমিদীয় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা জুগার্থার সাথে রোমানদের বিবাদ বেধে গেল, আর তাদের পরাজিত করতে প্রবল অসুবিধাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জনগণের বিতৃষ্ণার একপর্যায়ে তাকে কনসাল হতে হয়েছিল, যাতে এই অগৌরবের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানো যায়। তিনি এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন বেতনভুক সেনাবাহিনী গড়ে তুলে। জুগার্থাকে শৃংখলাবদ্ধ করে রোমে আনা হয় (১০৬ খ্রিষ্টপূর্ব), আর মেরিয়াসের কনসালশিপের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তার সৃষ্ট সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে কনসালের পদে বহাল রইলেন। তাকে থামানোর মতো কোনো শক্তি রোমে ছিল না।

মেরিয়াসের সময় থেকেই রোমক শক্তির অগ্রগতির তৃতীয় পর্যায় শুরু হলো। আর তা হলো সেনাধ্যক্ষের প্রজাতন্ত্র। কারণ এখন থেকে এমন এক যুগের শুরু হলো যখন রোমক শক্তির নেতৃত্ব অর্জনের জন্য সেনাধ্যক্ষরা প্রতিযোগিতা করত। মেরিয়াসের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তারই অধীনে আফ্রিকায় কর্মরত অভিজাত ঘরানার সুল্লা। তারা পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রচুর ধ্বংসলীলা চালায়। হাজার হাজার লোককে নির্বাসিত করা হয়, হত্যা করা হয় আর তাদের ভূসম্পত্তি বিক্রি করে দেয়া হয়। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আর স্পার্টেকাসের বিদ্রোহের পর আর একপর্যায় শুরু হয়, যার নেতৃত্ব দেন লুকুলাস, পম্পেই দ্য গ্রেট, ক্রেসাস আর জুলিয়াস সিজার। ক্রেসাস ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি স্পার্টেকাসকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন। লুকুলাস জয় করেছিলেন এশিয়া মাইনর আর আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন আর সেখান থেকে বিশাল সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যান। ক্রেসাস আরো দূরে পারস্য পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পার্থিয়ানদের দ্বারা পরাস্ত হয়ে নিহত হন। দীর্ঘ

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পম্পে পরাজিত হন জুলিয়াস সিজারের কাছে (৪৮ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং নিহত হন, আর তারপর জুলিয়াস সিজার রোম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট রূপে আসীন হন।

মানব জাতির ইতিহাসে জুলিয়াস সিজার এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি বীরত্বগাথার এক প্রতীক। তিনি আমাদের কাছে এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে সামরিক অভিযান থেকে সরে এসে রোমান সম্প্রসারণের চতুর্থপর্যায় শুরু করেন, যা ছিল প্রথম সাম্রাজ্য, কারণ প্রবল অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উথালপাতাল সত্ত্বেও, এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অবক্ষয় সত্ত্বেও, রোমান সাম্রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে ১০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সর্ববৃহৎ আকার লাভ করে। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময়ে একপ্রকার ভাটার টান ছিল, মেরিয়াস কর্তৃক সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের আগ পর্যন্ত তেজস্বিতার ঘাটতি ছিল। তৃতীয় পর্যায় চিহ্নিত করা যায় স্পার্টেকাসের বিদ্রোহে। জুলিয়াস সিজার তার খ্যাতি প্রতিপন্ন করতে পেরেছিল গলে, যা ছিল এখন ফ্রান্স ও বেলজিয়াম, সিজার জার্মানদের গল আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়ে রাজ্যটি তার সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন, আর দুবার ডোভার প্রণালী পার হয়ে ব্রিটেনে অবতরণ করেন (৫৫ এবং ৫৪ খ্রিষ্টপূর্ব), অবশ্য ওখানে তার ক্ষমতাকে স্থায়ী করেননি। ইতিমধ্যে পম্পে পূর্ব দিকে ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত তার বিজিত রাজ্য সংহত করেন।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সিনেট ছিল রোমান প্রশাসনের কেন্দ্রে, যার মাধ্যমে কনসাল এবং অন্যান্য কর্মকর্তা মনোনীত হত এবং ক্ষমতা প্রদান করা হত। বেশ কিছু রাজনীতিবিদ যার মধ্যে সিসেরো অন্যতম, যারা রোম রিপাবলিকের মহান ঐতিহ্য ধরে রাখা এবং রোমান আইনের গৌরব সমুন্নত রাখার চেষ্টা করছিলেন। তবে স্বাধীন কৃষকের অবক্ষয়ের সাথেই ইতালিতে নাগরিকতার গৌরব ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এখন এটা কৃতদাস আর দরিদ্র মানুষের দেশে পরিণত হলো; না ছিল স্বাধীনতার বোধ না ছিল আকাঙ্ক্ষা। প্রজাতন্ত্রের নেতাদের সিনেটের প্রতি কোনো তোয়াক্কা ছিল না, তাদের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রিত হত কী করে সেনাবাহিনীকে হাতে রাখা যায়। সিনেটের নেতা হিসেবে ক্রেসাস, পম্পেই আর সিজারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল (প্রথম ত্রৈতশাসন)। কিছুদিনের মধ্যেই কার্হেতে পার্থিয়ানদের হাতে ক্রেসাসের নিহত হওয়ার পর সিজার আর পম্পেইর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। পম্পেই প্রজাতান্ত্রিকদের পক্ষ নিয়ে সিজারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং সিনেট অমান্য করার জন্য তাকে বিচারের সম্মুখীন করতে চান।

একজন জেনারেলের জন্য তার নেতৃত্বসীমার বাইরে সৈন্যবাহিনীদের নিয়ে আসা অবৈধ আর সিজারের সীমারেখা ছিল রুবিকন। ৪৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে "পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে"। বলে তার সীমারেখা পার হয়ে পম্পের এলাকা রোমে অভিযান চালান।

www.nagorikpathagar.org

অতীতে রোমের রীতি ছিল সংকটকালে একজন একনায়ক নির্বাচন করে সংকট উত্তরণের জন্য তাকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা। পম্পেকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সিজার একনায়ক হয়ে বসেন, প্রথমত দশ বছর এবং তারপর সারাজীবনের জন্য। প্রকৃতপক্ষে তাকে আজীবন অধীশ্বর বানানো হয়। তার সম্বন্ধে রাজা কথাটা প্রচলিত হতে থাকে, পাঁচ শতাব্দী পূর্বে এট্রুস্কানদের বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে যে কথাটা রোমবাসীর কাছে ঘৃণিত। যদিও সিজার রাজা হতে চাননি, তবুও তিনি সিংহাসনে আসীন এবং রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। পম্পেইকে পরাজিত করার পর সিজার মিশর গমন করে টলেমি বংশের শেষ চিহ্ন মিশরের দেবী-রানী ক্লিওপেত্রাকে প্রেম নিবেদন করেন। মনে হয় তিনি সিজারের মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে দিতে পেরেছিলেন। তিনি মিশর থেকে দেবতা-রাজার ধারণাটা মাথায় করে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর একটা মূর্তি নির্মাণ করে মন্দিরে স্থাপন করা হয় আর তাতে যে বাণী উৎকীর্ণ হয় তা হলো "অজেয় দেবতার প্রতি নৈবেদ্য"ই রোমের প্রজাতান্ত্রিক চেতনা আর একবার ঝলসে ওঠে আর তাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয় সিনেটে তার নিহত প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পে দ্য গ্রেটের মূর্তির পাশে।

ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিবাদ এরপর আরো ১৩ বছর ধরে চলেছিল। এরপর আরো একটা ত্রিশাসন এসেছিল লেপিডাস, মার্ক অ্যান্টনি আর অক্টেভিয়ান সিজারের। অক্টেভিয়ান সিজার ছিল জুলিয়াস সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্র। 'চাচার মতোই অক্টেভিয়ানের ভাগে পড়ে পশ্চিমের দরিদ্রতর কঠোরতর অঞ্চল, যেখানকার সেনাবাহিনীতে যোগ্যতর ব্যক্তিদের পাওয়া গিয়েছিল। ৩১ খ্রিষ্টাব্দ পূর্বাব্দে তিনি অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধে তার সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেন আর নিজেকে রোমের একমাত্র প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে চরিত্রগত দিক দিয়ে অক্টেভিয়ান ছিলেন জুলিয়াস সিজারের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজা বা দেবতা হওয়ার নির্বোধ বাসনা ছিল না তার। কোনো প্রেমিকা রানীকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। তিনি রোমের সিনেট ও জনগণকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একনায়ক হতেও অস্বীকার করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিনেট তার হাতে সত্যিকারের ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। তাকে রাজা বলা হত না ঠিকই, তবে প্রিন্সেপ আর অগাস্টাস বলা হত। তিনি হলেন অগাস্টাস সিজার প্রথম– সত্যিকারের রোমান সম্রাট (২৭ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ১৪ খ্রিষ্টাব্দ) তারপর একে একে সম্রাট হলেন টাইবেরিয়াস, নীরো, ট্রেজান (৯৮ খ্রিষ্টাব্দ), হাড্রিয়ান (১১৭ খ্রিষ্টাব্দ) এন্টোনিয়াস পায়াস (১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) এবং মার্কাস অরেলিয়াস (১৬১-১৮০ খ্রিষ্টাব্দ) সব সম্রাটরাই ছিলেন সেনানায়ক সম্রাট। তারা সবাই সেনা দ্বারা অধিষ্ঠিত হন আবার কেউ কেউ সেনাদ্বারা উৎখাতও হন। ধীরে ধীরে রোমের ইতিহাস থেকে সিনেট বিলুপ্ত হয়ে যায়। যার জায়গা নিয়েছিল সম্রাট আর তার কর্মচারীরা। রোম সাম্রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত ট্রান্সসিলভানিয়াকে ডেসিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ট্রেজান ইউফ্রেতিস নদী অতিক্রম করেন। হ্যাড্রিয়ানের চিন্তা ছিল শী হুয়াং তির মতো উত্তরের বর্বরদের

www.nagorikpathagar.org

হাত থেকে সুরক্ষার জন্য প্রাচীর নির্মাণ। হাড্রিয়ানের পর থেকে রোম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ থেমে যায়।

৩৪. রোম ও চীন

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দী মানব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মেসোপটেমিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল আর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু রইল না। মেসোপটেমিয়া ও মিশর তখনও যথেষ্ট উর্বর, জনবহুল এবং যথেষ্ট সমৃদ্ধ তবে বিশ্বে আর ঐ অঞ্চলের প্রাধান্য রইল না। ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ল পূর্বে আর পশ্চিমে। দুটি মহান সাম্রাজ্য বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করল, সে দুটি সাম্রাজ্য ইউফ্রেতিস পর্যন্ত তার ক্ষমতা বিস্তার করল, তবে তার বাইরে নয়। কারণ কেন্দ্র থেকে তা অনেক দূরবর্তী। ইউফ্রেতিসের পূর্বে প্রাক্তন পারস্য ও ভারবর্ষে সেলুকীয়দের পতনের পর বেশ কিছুসংখ্যক নতুন প্রভুর উত্থান ঘটে। ৎসীন বংশের সম্রাট শী হুয়াংতির মৃত্যুর পর চীন চলে যায় হ্যান বংশের অধীনে আর তার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে তিব্বত আর পামির মালভূমি পার হয়ে পশ্চিমে তুর্কিস্তান পর্যন্ত।

ঐ সময়ে চীনে ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত ও সবচেয়ে সুসভ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অঞ্চল ও জনবসতির দিক দিয়ে চীন ছিল রোমের চেয়ে অগ্রসর। একই সময়ে একই পৃথিবীতে দুটি বিশাল সাম্রাজ্য পাশাপাশি বিকাশ লাভ করলেও একে অন্যের সম্বন্ধে খুব কমই জানত। স্থলপথ ও জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত না থাকায় তাদের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তবুও তাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একটা লক্ষণীয় দিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল, আর দুই শক্তির মধ্যবর্তী অঞ্চল মধ্য এশিয়া ও ভারতে তার প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। এ এলাকার মধ্য দিয়ে দুই অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। যেমন– স্থলপথে পারস্যের মধ্য দিয়ে উটের বহরে আর জলপথে ভারতের উপকূল আর লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে। ৬৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের পথ ধরে পম্পেই তার বিজয় অভিযান নিয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছান। এদিকে ১০২ খ্রিষ্টাব্দে প্যান চাওয়ের অধীনে চীনের বাহিনী পৌঁছায় ক্যাস্পিয়ান উপকূলে, আর রোমের কাছে দূত পাঠায়। তবে পূর্ব ও পশ্চিমের দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে সরাসরি যোগযোগের জন্য আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়।

এই দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্তরেই ছিল অরণ্যাচ্ছাদিত বর্বররা। আজকের জার্মানি সেকালে মূলত ছিল অরণ্যবেষ্টিত। পূর্ব এশিয়ার উচ্চভূমি ছিল মাঞ্চুরিয়া। দক্ষিণ রাশিয়া থেকে তুর্কিস্তান হয়ে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত বিশাল এলাকা ছিল প্রাকৃতিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে বৃষ্টিপাতের বিরাট তারতম্য দেখা যায়। এখানকার ভূমি

www.nagorikpathagar.org

মানুষের বিশ্বস্ত নয়। বহু বছর ধরে তারা কৃষিভূমি ও চারণভূমি টিকিয়ে রেখেছিল, তারপর আরেক যুগ এলো যখন আর্দ্রতা কমে গেল আর প্রচণ্ড খরা দেখা দিলো।

পশ্চিমের ভূখণ্ডে উত্তরে জার্মানি থেকে দক্ষিণে রাশিয়া তুর্কিস্তান আর গথল্যান্ড থেকে আল্পস পর্বত পর্যন্ত আর্যভাষী নর্ডিক গোষ্ঠীর উৎপত্তিস্থল। পূর্ব ভূ-ভাগের স্তেপ আর মঙ্গোলিয়ার মরু অঞ্চল হুন, মঙ্গোলীয়, তাতার ও তুর্কি জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস। এসব অঞ্চলের বিভন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক ভাষা, নৃগোষ্ঠী ও জীবন পদ্ধতিগতভাবে সমজাতীয়। নর্ডিকরা যেমন সব সময় দক্ষিণে মেসোপেটেমিয়া ভূমধ্যসাগরীয় সভ্য এলাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে, তেমনি হুনরাও চেষ্টা করেছে চীনের স্থায়ী বসতির দিকে বারবার অভিযান চালানোর। উত্তরের প্রাচুর্যের যুগগুলিতে সেখানে জনসংখ্যারও ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। তৃণভূমির অপ্রতুলতা, পশুরোগবৃদ্ধি এসব লড়াকু ক্ষুধার্ত জাতিগোষ্ঠীকে দক্ষিণে অগ্রসর হতে প্ররোচিত করেছে।

কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে যুগপৎ দুটি সক্রিয় সাম্রাজ্য ছিল যারা উত্তরের বর্বরদের অভিযান রুখে দিতে এবং নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিল। হ্যান সাম্রাজ্যের উত্তর দিকে অভিযান ছিল দৃঢ় ও অবিরাম। চীনা জনগোষ্ঠী চীনের বৃহৎ প্রাচীরের ওপারেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শক্তিশালী চীনা সীমান্তরক্ষীদের পেছনে পেছনে চীনা কৃষকরাও এগিয়ে এসেছিল ঘোড়া আর লাঙল নিয়ে। তারা তৃণভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর করেছিল। হুনরা প্রায়ই চীনা কৃষকদের আক্রমণ করে হত্যা করত তবে চীনা বাহিনীর প্রতিশোধমূলক অভিযানও ছিল দুঃসহ। যাযাবরদের হয় স্থায়ী কৃষক হয়ে চীনাদের কর প্রদান করতে হবে, নতুবা নতুন কোনো চারণভূমির সন্ধানে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হত। কেউ কেউ প্রথম বিকল্পটাই বেছে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, আবার কেউ কেউ উত্তর বা পশ্চিম দিকে গিরিপথ পার হয়ে তুর্কিস্তানের দিকে চলে যায়।

মঙ্গোলীয় অশ্বারোহীদের পশ্চিমমুখী যাত্রা ২০০ খ্রিপূর্বাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এটা ছিল আর্যজাতির ওপর একটা বাড়তি চাপ, আর এই চাপ শেষ পর্যন্ত রোমানদের ওপরও পড়ে। সিথিয়ান উপজাতির পার্থিয়ানরা মঙ্গোলিয়ানদের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইউফ্রেতিস পর্যন্ত চলে আসে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দিকে। পম্পেই দ্য গ্রেটের প্রাচ্য অভিযানের সময় তারা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তারা ক্রেসাসকে পরাজিত করে হত্যা করেছিল। তারা পারস্যে সেলুকীয়দের উৎখাত করে পার্থিয়ান রাজবংশ কায়েম করেছিল।

কিছুদিনের জন্য এই যাযাবরদের চাপ পূর্ব ও পশ্চিমে কমে গিয়ে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতের দিকে চলে যায়। এ সময় রোমান ও চৈনিক শক্তির বৃদ্ধির ফলে মূল চাপ এসে পড়ে ভারতের ওপর। বেশ কিছু লুটেরা অভিয়ান পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সমভূমির দিকে চলে আসে। অশোকের সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। আর কিছুদিনের জন্য ভারতের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কোনো এক ইন্দোসিথিয়ান কুশান রাজবংশ উত্তর ভারতে শাসন ক্ষমতায় এসে কিছুটা শৃংখলা

www.nagorikpathagar.org

ফিরিয়ে আনে। এসব অভিযান চলে কয়েক শতাব্দী ধরে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অধিকাংশ সময় ধরেই ভারতবর্ষ এফথেলাইট বা সাদা হুনদের দ্বারা পর্যুদস্ত হচ্ছিল, যারা ছোট ছোট রাজ্যের কাছে কর আদায় করছিল আর সারা ভারতে আতংকের সৃষ্টি করেছিল। প্রতি গ্রীষ্মে এই এফথেলাইটরা তুর্কিস্তানে পশুচারণ করত আর শরৎ কালে গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতের ওপর হামলে পড়ত।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোমান ও চীনা সাম্রাজ্যের ওপর চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসে, কারণ তাদের বর্বর আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসে। এ ছিল এক মারাত্মক আপদ। এগারো বছর ধরে চীনের ওপর আক্রমণ চালায়, সেখানকার সমাজকাঠামো তছনছ হয়ে গিয়েছিল। হ্যান রাজবংশ ধসে পড়ে, এরপর এলোমেলো এক বিশৃঙ্খল যুগের সূচনা হয়, সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে চ্যাং রাজবংশের আগমনের আগ পর্যন্ত যা আর কখনোই সামাল দিতে পারেনি।

এই উৎপাত এশিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ১৬৪ থেকে ১৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এটা রোমান সাম্রাজ্যকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এটা রোম সাম্রাজ্যের ক্ষমতাকে অনেকটাই শিথিল করে দিয়েছিল। রোমের প্রদেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল আর শাসন ক্ষমতা ও দক্ষতার ওপরও যার যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। সীমান্ত আর সুরক্ষিত রইল না আর কোনো কোনো জায়গায় সীমান্ত ভেঙে যাচ্ছিল। নতুন এক নর্ডিক জাতি গথরা, যারা মূলত সুইডেনের গথল্যান্ডের বাসিন্দা, তারা রাশিয়ার ভল্গা অঞ্চল হয়ে কৃষ্ণসাগরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, আর তারা সমুদ্রে জলদস্যুতায় লিপ্ত হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে হুনরাও পশ্চিম দিকে চাপ সৃষ্টি করে। ২৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তারা দানিয়ুব পার হয়ে বর্তমান সার্বিয়ায় একটা স্থলযুদ্ধে সম্রাট ডেসিয়াসকে পরাস্ত ও হত্যা করে। ২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে এক জার্মান জাতি ফ্রাংকরা রাইনের নিম্নাঞ্চলে ঢুকে পড়ে আর অ্যালেমেনিয়রা আলমেস অঞ্চলে প্রবেশ করে। গলের সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারলেও বলকান এলাকায় গথরা বারবার আক্রমণ করছিল। রোমের ইতিহাস থেকে ডেসিয়া প্রদেশ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

রোমের অহংকার আর আত্মবিশ্বাসে চির ধরেছিল। যে রোম নগরী এ যাবৎ ছিল সুরক্ষিত এক উন্মুক্ত নগরী ২৭০-২৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট অরেলিয়াস তাতে দুর্গপ্রাকার নির্মাণ করেন।

৩৫. আদি রোমান সাম্রাজ্যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা

যে রোম সাম্রাজ্য দুই শতাব্দী ধরে গড়ে উঠল, আর অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে আরো দুই শতাব্দী ধরে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সমৃদ্ধি লাভ করল, কীভাবে তা

www.nagorikpathagar.org

বিশৃংখল অবস্থায় নিপতিত হয়ে ভেঙে পড়ল, সে কথা বলার আগে এই বিশাল সাম্রাজ্যে সাধারণ মানুষ কীভাবে দিন যাপন করত, সে বিষয়ে কিছুটা ধ্যান দিতে চাই। ইতিমধ্যে আমাদের ইতিহাস সমসময়ের ২০০০ বছরের মধ্যে চলে এসেছে। আর সভ্য মানুষ রোম ও হ্যান রাজবংশের শান্তির বাতাবরণে প্রায় আধুনিক সভ্য মানুষের কাছাকাছি চলে এসেছিল।

পশ্চিমা জগতে ইতিমধ্যে ধাতব মুদ্রা চালু হয়েছে, কিছু পেশাজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে যারা সরকারি কর্মচারী বা পুরোহিত কোনোটাই নয়; লোকজন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে, তাদের জন্য তৈরি হয়েছে রাজপথ আর পান্থনিবাস। অতীতের অর্থাৎ ৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের আগের চেয়ে জীবন হয়েছে অনেকটাই ঢিলেঢালা। ঐ সময়ের পূর্বে মানুষ সীমাবদ্ধ ছিল কোনো জেলা বা দেশের সীমার মধ্যে আর নির্দিষ্ট ঐতিহ্যের মধ্যে। শুধুমাত্র যাযাবররাই দেশের সীমার বাইরে যেত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে।

তবে রোমের শান্তির রাজ্যই হোক বা হ্যানদের শান্তি সাম্রাজ্যই হোক, এ কথা বোঝাত না যে তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের সকল অংশে একই ধরনের সভ্যতা বিরাজমান ছিল। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলের বিরাট সাংস্কৃতিক পার্থক্য ছিল, ঠিক যেমন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা। বিশাল রোমক সাম্রাজ্যের এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেনানিবাস আর কলোনি, যেখানে রোমক দেবতাদের পূজা আর ল্যাটিন ভাষায় কথাবার্তা চলত, তবে রোমানদের আগমনের পূর্বে যেখানে শহর বা নগর ছিল, সেখানে তাদের প্রচলিত রীতিনীতিই চালু ছিল আর নিজেদের ঐতিহ্যবাহী দেবদেবীর আরাধনাই চলত। গ্রিস, এশিয়া মাইনর মিশর ও গ্রিস অধিকৃত প্রাচ্য এলাকায় ল্যাটিন ভাষা কখনোই প্রচলিত হয়নি। সেখানে গ্রিক ধারারই প্রাধান্য ছিল। টরাসের সল, যিনি পয়গম্বর পল হয়ে যান, তিনি ছিলেন একজন ইহুদি এবং রোমের নাগরিক, তবে তিনি কথা বলতেন এবং লিখতেন গ্রিক ভাষায়, হিব্রু ভাষায় নয়। এমনকি পার্থিয়ানদের দরবারে, যারা পারস্য থেকে গ্রিক সেলুকীয়দের বিতাড়িত করেছিল, তারাও গ্রিক ভাষায় কথা বলাকে কেতাদুরস্ত বলে গ্রহণ করত। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার কিছু কিছু অংশে কার্থেজ ধ্বংসের পরও কার্থেজীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। সেভিলের মতো নগরে, রোম প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই যা সমৃদ্ধ নগরী ছিল, সেখানে বংশপরম্পরায় সেমিটিক দেবদেবী ও সেমিটিক ভাষা টিকে ছিল। সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস, যিনি ১৯৩ থেকে ২১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন, তিনি মাতৃভাষারূপে কার্থেজীয় ভাষায় কথা বলতেন। পরে তিনি লাতিন ভাষা শিখেন বিদেশী ভাষারূপে। কথিত আছে যে, তার বোন কোনো কালেই লাতিন শিখতে পারেননি আর পিউনিক ভাষাতেই গৃহস্থালি সামলাতেন।

গল আর ব্রিটেনের মতো দেশ, আর ডেসিয়া (বর্তমানে রোমানিয়ার) এবং পনোনিয়ার (দানিয়ুবের দক্ষিণে হাঙ্গেরির অংশবিশেষ) মতো প্রদেশ, যেখানে আগে

www.nagorikpathagar.org

থেকে কোনো শহর বা মন্দির বা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি, সেখানে রোমানরা লাতিনীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। রোমানরাই এখানে প্রথমবারের মতো সভ্যতার আলো ছড়িয়েছিল। তারা এখানে শহর ও নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে লাতিন ভাষা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল, আর যেখানে রোমীয় দেবতারা আসন গেড়েছিল। রুমেনীয়, ইতালীয়, ফরাসি, পর্তুগিজ ও স্পেনিশ ভাষার মধ্যে আমরা যে লাতিনীয় উপাদান দেখতে পাই, তাকে আমরা লাতিন ভাষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণরূপে গণ্য করতে পারি। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাতেও লাতিন ভাষা ঢুকে পড়ে। মিশর, গ্রিস ও প্রাচ্য দেশসমূহে লাতিন ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। সংস্কৃতি ও মানসিকতার দিক থেকে তারা গ্রিকই রয়ে যায়। এমনকি রোমেও ভদ্রলোকের ভাষা হিসেবে গ্রিক শেখা হত, আর গ্রিক সাহিত্য ও শিক্ষাকে লাতিনের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হত।

এই মিশ্র সংস্কৃতির সাম্রাজ্যে কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যও মিশ্র প্রকৃতির হবে এটাই স্বাভাবিক। স্থায়ী বসতির প্রধান জীবিকা তখন পর্যন্ত কৃষিকাজই রয়ে গেছে। আমরা জেনেছি কীভাবে শক্ত-সমর্থ রোমান কৃষকরা পিউনিক যুদ্ধের পর কৃতদাস নির্ভর হয়ে পড়ে। গ্রিকরা কৃষির নানারকম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল, যে আর্কেডীয় পদ্ধতিতে ছিল প্রত্যেক নাগরিক নিজে পরিশ্রম করবে, আর স্পার্টায় নিজ হাতে কৃষিকাজ করাটা ছিল অগৌরবের, সেখানে কৃষিকাজের জন্য ছিল বিশেষ ধরনের কৃতদাস হিলোটরা। তবে এটা প্রাচীন ইতিহাস, সারা পৃথিবীতে হেলেনিক অঞ্চলে কৃতদাস নির্ভর জোতদারি পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজে নিয়োজিত কৃতদাসরা ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী যুদ্ধবন্দি, যারা একে অন্যের ভাষা বুঝত না, অথবা তারা ছিল জন্মগত কৃতদাস। তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না যাতে তারা উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারে, তাদের অধিকার বোধ ছিল না, তারা লিখতে পড়তেও জানত না। জনসংখ্যায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তারা কখনও সফল বিদ্রোহ করতে পারেনি। স্পার্টেকাসের নেতৃত্বে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে যে বিদ্রোহ তা ছিল বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষিত এক কৃতদাস বাহিনী গ্ল্যাডিয়েটরদের। রিপাবলিকের শেষ দিকে এবং সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে ইতালিতে কৃষি কর্মীরা খুব অমর্যাদা ভোগ করত। রাতে তাদের শৃংখলাবদ্ধ রাখা হত আর মাথার অর্ধেক কামিয়ে দেয়া হত যাতে তাদের পালানো অসম্ভব ছিল। তাদের নিজস্ব কোনো স্ত্রী ছিল না, তাদের খোঁজা করে দেওয়া হত এমনকি মেরেও ফেলা হত। তাদের প্রভু কৃতদাসদের বিক্রি করে দিতে পারত অ্যারেনার মধ্যে পশুর সাথে লড়াই করার জন্য। কোনো কৃতদাস যদি তার প্রভুকে হত্যা করত, তা হলে সে বাড়ির সব কৃতদাসকে ক্রুসবিদ্ধ করে মারা হত। গ্রিসের কোনো কোনো রাজ্যে যেমন এথেন্স, ক্রীতদাসদের ভাগ্য এতটা মন্দ ছিল না তবু যা ছিল সেটাও যথেষ্ট ঘৃণ্য। তাই বর্বররা যখন সীমান্ত ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ত, ক্রীতদাসরা তাদের শত্রু নয়, বরং মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করত।

সব রকম শিল্প বা যে কোনো কাজ, যেখানে দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে, সেখানে কৃতদাস ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করে। খনি বা ধাতব শিল্প, সমুদ্রগামী

www.nagorikpathagar.org

নৌকায় দাঁড় টানা, রাস্তা তৈরি, বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ, এর সবগুলিতেই কৃতদাসদের লাগানো হত। তাছাড়া সব রকমের গৃহকাজে কৃতদাসদের ব্যবহার করা হত। শহরে ও পল্লী অঞ্চলে ছিল মুক্ত দরিদ্র মানুষ এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দরিদ্র কৃতদাস যারা নিজেদের জন্য কাজ করত, এমনকি মজুরির জন্যও কাজ করত। তারা ছিল দক্ষ কারিগর বা সুপারভাইজার ইত্যাদি। মজুরিগ্রাহক দরিদ্র জনগোষ্ঠী বা যারা দাসদের সাথে প্রতিযোগিতায় ছিল, তারা মোট জনসংখ্যার কত ভাগ ছিল তা জানা যায় না। সম্ভবত স্থান বিভেদে এবং সময়ান্তরে তাদের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটত। তাছাড়া কৃতদাসদের প্রকারভেদও ছিল। এক ধরনের কৃতদাস ছিল যাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত আর চাবুক মেরে কাজ করানো হত। আবার এমন কৃতদাসও ছিল যাদের প্রভু তাদের কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দিত, এমনকি বিয়ে করে সংসার করার অধিকারও দিত। তাদের শুধু নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্তব্য সম্পাদন করতে হত।

আবার সশস্ত্র কৃতদাসও ছিল। ২৬৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পিউনিক যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সশস্ত্র দাসরা যুদ্ধযুদ্ধ খেলার এট্রুস্কান রীতি ছিল, সেই রীতি রোমেও প্রচলন করা হয়। খুব দ্রুত এটা ফ্যাশনে পরিণত হয়। প্রত্যেক বিত্তবান রোমানের জন্য একদল প্রশিক্ষিত গ্ল্যাডিয়েটর রাখাটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। মাঝে মধ্যে এরা এরেনাতে লড়াই করত, তবে এদের মূল কাজ ছিল প্রভুর দেহরক্ষী হওয়া বা অন্যকে সন্ত্রস্ত রাখার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা। তাছাড়া বিদ্বান কৃতদাসও ছিল। পরবর্তী রিপাবলিকের আমলে গ্রিস, উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরের বেশ কিছু সুসভ্য নগরী রোমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, আর সেখান থেকে এসেছিল বেশ কিছু উচ্চশিক্ষিত বন্দি। অনেক ভালো রোমান পরিবারের যুবকদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল কৃতদাসের ওপর। অনেক ধনী পরিবারের গ্রন্থাগারিক বা সেক্রেটারি ছিল দাস। পোষা কুকুরের মতোই সে তার কাব্যগুণ নিজের মধ্যে আগলে রাখত। এই বাতাবরণে যে সাহিত্য কর্মের উদ্ভব হলো তা ছিল সমালোচনামুখর, ভিরু, সুচিন্তিত ও বিবাদাত্মক। কিছু চালাক চতুর উদ্যমী লোক ছিল যারা বুদ্ধিমান দাস ছেলেদের কিনে নিয়ে তাদের শিক্ষিত করে বিক্রি করত।

তবে রিপাবলিক যুগের শুরুর পর থেকে মহামারীর ফলে বিভক্তি পর্যন্ত ৪০০ বছরে কৃতদাসের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বন্দির সংখ্যা যেমন বেড়ে যায়, তাদের প্রতি আচরণও তেমনি পাশবিক হতে থাকে। তাদের কোনো অধিকার ছিল না, আর পাঠক কল্পনা করতে পারে তেমন কোনো নিষ্ঠুরতাই তারা বাদ দিত না। তবে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দিকেই দাসদের প্রতি আচরণে পরিবর্তন আসে। প্রথমত, বন্দির সংখ্যা কমে আসে আর দ্বিতীয়ত, তাদের মূল্যও অনেক গুণ বেড়ে যায়। দাসের মালিক বুঝতে পারে, এসব দুর্ভাগাদের আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি পেলেই তারা নিজেরাও তাদের কাছে থেকে অধিক সেবা পাবে। তাছাড়া সমাজে নৈতিক বোধও বৃদ্ধি পাচ্ছিল, একটা বিচারবোধ জাগ্রত

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছিল। গ্রিকদের উন্নত মানসিকতা রোমানদের মাঝে অনুপ্রবিষ্ঠ হচ্ছিল, নিষ্ঠুরতার প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলো, মালিকেরা পশুর সাথে লড়াই করার জন্য কৃতদাসদের বিক্রি করতে পারবে না, কৃতদাসদের ভূমির মালিকানাও দেওয়া হলো, যাকে বলা হলো পেকুলিয়াম, প্রণোদনা সৃষ্টির জন্য কৃতদাসদের বেতন দেওয়ার নিয়মও প্রবর্তিত হলো, এক ধরনের দাস বিবাহেরও প্রচলন হলো। বিশেষ ঋতুর কৃষি ছাড়া দলবদ্ধ কৃষিকাজ নিষিদ্ধ করা হলো। কৃতদাস পরিণত হলো দায়বদ্ধ চাকরে যারা উৎপাদিত ফসলের অংশবিশেষ প্রভুদের দিতে বাধ্য থাকত, অথবা কোনো বিশেষ ঋতুতে প্রভুর কাজ করতে বাধ্য থাকত।

খ্রিষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে গ্রিক ও লাতিন ভাষী রোম সাম্রাজ্য কীভাবে কৃতদাস নির্ভর হয়ে পড়ে, যারা সত্যিকারের স্বাধীন নাগরিকতার অহংকার করত তারা কীভাবে সংখ্যাল্প হয়ে পড়ে তা আমরা জেনেছি এবং এর মধ্যেই নিহিত ছিল রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ধ্বংস। পারিবারিক জীবন বলতে যা বোঝায়, তা খুব অল্প লোকের ভাগ্যেই জুটত। অল্প কিছু গৃহেই সাধারণ জীবনচর্চা, সুস্থ চিন্তা জ্ঞানচর্চার বাতাবরণ ছিল। স্কুল কলেজ ছিল গোনা। স্বাধীন ইচ্ছা আর স্বাধীন চিন্তা ছিল না বললেই চলে। বিশাল রাজপথ, জৌলুসময় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আইন ও ক্ষমতার ঐতিহ্য, যা পরবর্তী প্রজন্মের বিস্ময় জাগায়, এসবই গড়ে উঠেছিল বিপথগামী চিন্তা, অবরুদ্ধ বোধ আর বিকৃত বাসনার ওপর। আর যে সংখ্যাল্প উচ্চবিত্ত বিশাল শৃংখলিত জনসাধারণের জোর করে আদায় করা শ্রমশক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল তারাও অস্বস্তি ও মনের দিক থেকে দেউলিয়া ছিল। এই বাতাবরণে শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন, বা স্বাধীন ও সুখী মনের কোমলতা বিকাশ লাভ করতে পারে না। অনেক নকল আর অনুকরণ ছিল, ছিল দাসসুলভ পাণ্ডিত্য। তবে ছোট্ট এক নগরী এথেন্সে যে সাহসী সৃজনশীল জ্ঞানচর্চা হয়েছে, রোমানদের চার শতাব্দীর ইতিহাসে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। রোমের রাজদণ্ডের নিচে এথেন্সেও পচন শুরু হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানচর্চাতেও অবক্ষয় শুরু হয়। এসব দিনগুলিতে মানুষের মনোবল যেন থিতিয়ে এসেছিল।

৩৬. রোম সাম্রাজ্যে ধর্মের বিকাশ

খ্রিষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে লাতিন ও গ্রিক সাম্রাজ্যে মানুষের আত্মা হয়ে পড়েছিল উদ্বিগ্ন আর হতাশাগ্রস্ত। জবরদস্তি আর নিষ্ঠুরতা থাবা বিস্তার করেছিল; ছিল অহমিকার প্রদর্শনী। ছিল না সম্মানবোধ, প্রশান্তি আর ছিল স্থায়ী সুখের অভাব। দুর্ভাগাদের কপালে জুটত অবজ্ঞা আর বঞ্চনা। ভাগ্যবানদের ভোগ-বাসনার মধ্যে অনিশ্চিত আশংকা ছিল। বহুসংখ্যক নগরে প্রধান বিনোদন ছিল অ্যারেনার

www.nagorikpathagar.org

রক্তাক্ত ক্রীড়া প্রদর্শনী, যেখানে পশু আর মানুষের লড়াইয়ে ছিল যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। এম্ফিথিয়েটার ছিল রোমান ধ্বংসাবশেষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপনা। এ ধারাতেই বহমান ছিল জীবনস্রোত। মানব হৃদয়ের অস্বস্তির প্রকাশ ঘটেছিল ধর্মীয় অস্থিরতার মধ্যেও।

আর্য যাযাবররা যখন সভ্য জগতে হানা দিয়েছিল সেই প্রাথমিক দিনগুলি থেকেই এটা অনিবার্য ছিল যে প্রাচীন দেবতা ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে রদবদল হবে বা লুপ্ত হবে। শত শত প্রজন্মের পরিক্রমায় শ্যামাঙ্গ সভ্যতার মানবগোষ্ঠীর মানুষের জীবন ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক। আনুষ্ঠানিকতা পালন, প্রাণোৎসর্গ আর রহস্যময়তা তাদের জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আমাদের আধুনিক দৃষ্টিতে তাদের দেবতারা হয়তো দানবীয় ও অযৌক্তিক মনে হতে পারে; কারণ আমরা বাস করি আর্য মানসিকতার জগতে। তবে এসব প্রাচীন জাতির কাছে দেবতারা ছিল জীবনে স্বপ্নিল বাস্তবতা। সুমেরিয়া বা মিশরে প্রথম দিকে যখন এক নগরী অন্য নগরীকে জয় করে নিচ্ছিল, তখন তাদের দেবতারাও বদলে যাচ্ছিল বা নতুন নামকরণ হচ্ছিল, তবে আকৃতি ও পূজার রীতিনীতি অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল। আসলে প্রকৃতিগত তেমন পরিবর্তন হয়নি। স্বপ্নের মূর্তিগুলি পরিবর্তন হলো, স্বপ্ন চলল অবিরাম, আর সে স্বপ্ন ধারাও একই। সেমিটিক বিজেতারা সুমেরীয়া জয় করার পর বিজিতদের ধর্ম অবিকৃতই রেখে দিলো। মিশর কখনও ধর্ম বিপ্লবের কাছে মাথা নত করেনি। টলেমীয় সিজারীয় আমলে মন্দির, বেদী ও পুরোহিততন্ত্র মূলত মিশরীয়ই রয়ে গিয়েছিল।

যখন একই সামাজিক ও ধর্মবিশ্বাসী জাতি অন্যের ওপর বিজয় লাভ করে, তখন এক জাতির দেবদেবী অন্যের ওপর প্রাধান্য লাভ করে বা পরস্পর মিশে যায়। দুই দেবতা একই প্রকৃতির হলে মিলিত হয়, আসলে একই দেবতা অন্য নাম ধারণ করে। এ ধরনের দেবদেবীর সংমিশ্রণকে বলে ধর্মতন্ত্র। খ্রিষ্টজন্মের পূর্বে হাজার বছর ধরে এমন ধর্মতন্ত্র বহাল ছিল। তাই যখন হিব্রু নবীরা ন্যায়পরায়ণ এক ঈশ্বরের ঘোষণা দিলো তখন মানব মন সহজেই তা গ্রহণ করেছিল।

তবে মাঝে মধ্যে দেবতারা এতটা ভিন্ন আদর্শের ছিল যে তাদের একীভূত করা সম্ভব ছিল না সেক্ষেত্রে কোনো নারী দেবীকে পুরুষ দেবতার সাথে বিয়ে দেওয়া হত; আর না হয় কোনো তারকা বা সর্পদেবতাকে অন্য দেবতার অলংকাররূপে প্রদর্শন করা হত। অথবা বিজিত জাতির দেবতা বিজয়ীদের দেবতার শত্রুতে পরিণত হত। ধর্মের ইতিহাস এ ধরনের অভিযোজন, আপসরফা আর যৌক্তিকীকরণে ভরপুর।

নগররাষ্ট্র থেকে মিশর যখন সম্মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন সেখানেও এ ধরনের ধর্মতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল। প্রধান দেবতা অসিরিস ছিল বলিগ্রাহী ফসলের দেবতা আর ফারাও ছিল তার জীবন্ত অবতার। অসিরিস বারবার মরত আবার বেঁচে উঠত, সে ছিল বীজ আর ফসলের প্রতীক, যার চিন্তা মানব-অমরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

www.nagorikpathagar.org

অসিরিসের প্রতীক ছিল স্ক্যারাবিউস (গুবরেপোকা), যা মাটিতে তার ডিম পুঁতে রাখত, যেখান থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসত আর জ্বলন্ত সূর্য যা অস্ত গিয়ে আবার উদিত হয়। পরবর্তীকালে ষণ্ডদেবতা এপিসের সাথে একাত্মীকরণ করা হয়। তার সাথে সম্পর্ক ছিল দেবী আইসিসের। আইসিসকে আবার গাভী দেবী হাথোরের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়, বাঁকা চাঁদ আর সমুদ্রে প্রতিফলিত তারাও ছিল তার প্রতীক। অসিরিসের মৃত্যু হয় আর আইসিস নিজ গর্ভে তার সন্তান ধারণ করে এই সন্তান হোরাস জন্ম নেয় বাজপাখি আর উষাদেবীরূপে, তারপর সে অসিরিসে রূপান্তরিত হয়। আইসিসের মূর্তি তৈরি করা হয় পুত্র হোরাসকে কোলে নিয়ে বাঁকা চাঁদের ওপর আসীন। এগুলি কোনো যৌক্তিক সম্পর্ক নয়, মানব মনের নিয়মতান্ত্রিক বিকাশের আগে স্বপ্নিল সঙ্গতিপূর্ণ কল্পনা। এছাড়াও ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দ দেবতা, যেমন কুকুর-মস্তক আনুবিস, অমানিশার অপদেবতা ইত্যাদি যারা ছিল গ্রাসকারী, প্রলোভন দাতা এবং দেবতা ও মানুষের শত্রু।

প্রত্যেক যুগের দেবতার আকার দেয়া হয়েছে মানব মনের সাথে খাপখাইয়ে। সন্দেহ নেই যে এসব অযৌক্তিক অসুন্দর অপদেবতার ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিকারের ভক্তি আর সান্ত্বনা খুঁজে ফিরত। অমরত্বের বাসনা মিশরীয়দের মনে শক্ত হয়ে বাসা বেঁধেছিল, আর এই বাসনাই ছিল মিশরীয়দের ধর্মকর্মের মূলে। মিশরীয় ধর্ম যে কোনো ধর্মের চেয়ে অনেক বেশি অমরত্ব পিপাসু। মিশর যখন বিদেশী আক্রামকের দ্বারা বিপর্যস্ত আর দেবতারা তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তখনও মিশরীয়দের অমরত্ব-পিপাসা আরো তীব্র হচ্ছে।

গ্রিকদের দ্বারা বিজিত হওয়ার পর আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে উঠল মিশরীয়দের ধর্মচর্চার কেন্দ্র আর সেই চিন্তাধারা সমগ্র হেলেনিক জগতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম টলেমি বিশাল এক মন্দির, সেরাপিয়াম মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, যেখানে এক ধরনের ত্রয়ী দেবতার পূজা প্রচলিত হলো। তারা হলো সেরাপিম (অসিরিস এপিশের নতুন সংস্করণ), আইসিস ও হোরাস। এরা স্বতন্ত্র দেবতা ছিল না, ছিল একই দেবতার তিন রূপ। সেরাপিয়াম একাত্ম করে দেয়া হয় গ্রিক জিউস, রোমান জুপিটার আর পারসিক সূর্যদেব। যেখানেই গ্রিক প্রভাব বিস্তার লাভ করল সেখানেই এই দেবতার আরাধনা প্রচলিত হলো। এমনকি ভারতবর্ষ ও পশ্চিম চীনেও অনুপ্রবেশ ঘটল। সাধারণের জীবন যেখানে ক্লিষ্ট সেখানে অমরত্বের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ ও সান্ত্বনা জোগানো হত। সেরাপিসকে বলা হত। "আত্মার ত্রাণকর্তা।" একটা স্তোত্রে বলা হয়েছে, "মৃত্যুর পরও আমরা তারই দৈব তত্ত্বাবধানে থাকব।" আইসিস অনেক ভক্তকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কুইন অব হেভেন মন্দিরে, তার কোলে ছিল শিশুপুত্র হোরাস। তার সামনে মোমবাতি প্রজ্বলিত হত, ভক্তিপূর্ণ নৈবেদ্য করা হত। মুণ্ডিত মস্তক ব্রহ্মচারী পূরোহিত তার পূজায় নিয়োজিত থাকত।

রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান পশ্চিম ইউরোপেও এই মতবাদ বিস্তৃত করল। সেরাপিস-আইসিসের মন্দির নির্মাণ, পুরোহিতের মন্ত্র আবৃত্তি, আর আত্মার

www.nagorikpathagar.org

অমরত্বের ধারণা স্কটল্যান্ড ও হল্যান্ডেও বিস্তার লাভ করল। তবে এই সেরাপিস আইসিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কম ছিল না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিথ্রেইজম। এই ধর্মতত্ত্বের মূল ছিল পারস্যে, আর এর কেন্দ্রে ছিল অতীতে মিথ্রান কর্তৃক এক রহস্যময় ষাঁড়বলি। এটা জটিল সেরাপিস আইসিস বিশ্বাসের চেয়ে বেশি প্রাচীন, এটা সরাসরি হেলিওলিথিক নরবলি প্রথার সাথে যুক্ত। মিথ্রাইয়ের মন্দিরে ষাঁড়ের পার্শ্বদেশে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা হত। আর বিশ্বাস করা হত, এই রক্ত থেকেই নতুন প্রাণের আবির্ভাব। মিথ্রিয়রা ষাঁড়ের রক্তে স্নান করত।

ওই উভয়-ধর্ম এবং পৃথিবীর অন্য অনেক ধর্ম সম্বন্ধেই একথা খাটে যে এসব ছিল মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যাতে করে সম্রাট তার প্রজা এবং কৃতদাসদের আনুগত্য লাভ করতে পারে। তারা চিন্তা করত নিজস্ব মুক্তি আর নিজের অমরত্ব। প্রাচীন ধর্মগুলি এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না। সেগুলির সামাজিক ভিত্তি ছিল। আগের দেব-দেবী প্রথমত, ছিল নগর বা রাষ্ট্রের, তারপর ব্যক্তির। বলি দেওয়া হত সর্বসাধারণের হিতার্থে, ব্যক্তিস্বার্থে নয়। তবে প্রথমে গ্রিক এবং পরে রোমানরা ধর্মকে রাজনীতির বাইরে নিয়ে আসে। মিশরীয়দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ধর্মকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যায়।

নব্য ব্যক্তি-অমরত্বের ধারণা ধর্ম থেকে সকল আন্তরিকতা ঝেড়ে ফেলে দেয়, যা আর কখনও প্রতিস্থাপন করতে পারেনি। প্রাথমিক রোমান সম্রাটদের অধীনে যে কোনো আদর্শ নগরীতে বিভিন্ন দেবতার অনেকগুলি মন্দির থাকত। যেমন রোমের মহান দেবতা জুপিটারের মন্দির, হয়তো সম্রাটের একটা নিজস্ব মন্দিরও থাকত। কারণ সম্রাটরা ফারাওদের কাছে থেকে শিখেছিল তারাও দেবতা হয়ে যেতে পারে। এ ধরনের মন্দিরে গুরুগম্ভীর রাষ্ট্রীয় প্রার্থনা চলত। প্রজারা সেখানে গিয়ে নৈবেদ্য নিবেদন করে আর ধূপ জ্বালিয়ে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করত। তবে কেবল স্বর্গের রানী আইসিস দেবীর মন্দিরেই নিজস্ব সুখদুঃখের কথা জানাতে পারত।

উদ্ভট স্থানীয় দেবতাও ছিল। যেমন সেভিলে প্রাচীন কার্থেজীয় দেবী ভিনাসের পূজা প্রচলিত ছিল। গুহা বা ভূনিম্নস্থ মিথ্রাসের মন্দিরে সৈনিক এবং কৃতদাসরা পূজা দিত। আর সম্ভবত সেখানে সিনাগগও ছিল যেখানে ইহুদিরা বাইবেল পাঠ করত, আর নিরাকার ঈশ্বরের প্রার্থনা করত। মাঝে মধ্যে রাষ্ট্রীয় ধর্মাচার নিয়ে ইহুদিদের সাথে গোলোযোগ বাধত। তারা প্রচার করত তাদের মহান ঈশ্বর দেবদেবীর মূর্তি পূজা সহ্য করে না, আর তারা সিজারের উদ্দেশ্যে বলিদান উৎসবে যোগ দিতেও অস্বীকার করত। তারা এমনকি পৌত্তলিকতার ভয়ে রোমের পতাকাকে স্যালুট করতেও অস্বীকার করত।

বুদ্ধের সময়ের বহু পূর্বেই ভারতে সাধুসন্ত ছিল যারা পার্থিব ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়েছিল। তারা বিবাহ ও পার্থিব সম্পদ পরিত্যাগ করে কঠোর জীবনাচরণ গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধ নিজে কঠোর সন্ন্যাস জীবন পছন্দ করেননি, তবে তার শিষ্যদের অনেকেই কঠোর সংযম পালন করত। কোনো কোনো অখ্যাত গ্রিক মতবাদেও এ ধরনের কঠোর জীবনাচরণ গ্রহণীয় ছিল, এমনকি তারা স্বেচ্ছায় অঙ্গহানি করত। জুডা ও আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদি সমাজেও কঠোর জীবনাচরণ দৃষ্টান্ত আছে। খ্রিষ্টীয়

www.nagorikpathagar.org

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এ ধরনের জীবন-বিমুখতা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। সময়ের বেড়াজাল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, পুরনো মন্দির, পূরোহিত, নিয়মরীতি এসব পেছনে পড়ে থাকছিল।

৩৭. যিশুর শিক্ষা

রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাস সিজার যখন রোমের অধীশ্বর তখন খ্রিষ্টধর্মের প্রেরিত পুরুষ যিশুখ্রিষ্টের জন্ম জুডা নগরে। তার নামে এক ধর্মের উত্থান হয়, যা সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়।

এখনকার মতো ইতিহাস ও ধর্মকে আলাদা রাখাই সুবিধা হবে। খ্রিষ্ট জগতের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে যিশু ছিলেন ঈশ্বরের অবতার, যাকে ইহুদিরাই প্রথম শনাক্ত করে। ঐতিহাসিক, যদি তাকে সত্যিকারের ঐতিহাসিক হতে হয়, তাহলে তার পক্ষে এ ধারণাটা পুরোপুরি গ্রহণ বা বর্জন কোনোটাই সম্ভব নয়। বাস্তব জগতে যিশু মানুষের আকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন, আর ঐতিহাসিকরা তাকে মানুষরূপেই বর্ণনা করবেন।

টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালে জুডিয়ায় তাঁর আবির্ভাব। তিনি ছিলেন নবী। পূর্ববর্তী ইহুদি নবীদের ধারাতেই তিনি তার মত প্রচার করতেন। ত্রিশ বছর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তার জীবন সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়।

যিশুর জীবন ও তার শিক্ষণ সম্বন্ধে জানার একমাত্র উৎস চারটি গস্পেল। চারটি গস্পেলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের একই চিহ্ন পাওয়া যায়। যে কেউ বলতে বাধ্য যে তিনি একজন ব্যক্তিপুরুষ ছিলেন, কোনো বানোয়াট কাহিনী নয়।

তবে গৌতম বুদ্ধের যেমন ধ্যানমগ্ন এক মূর্তি দেয়া যায়, পরবর্তীকালে বৌদ্ধমন্দিরে যে মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়, খ্রিষ্টধর্মে ভ্রান্ত শ্রদ্ধাভক্তির আতিশয্যে তার যে মূর্তি কল্পনা করা হয়, তা অনেকটাই বিকৃত। যিশু ছিলেন এক কপর্দকহীন শিক্ষক, যিনি জুডিয়ার বালুকাময় বিরল জনবসতিপূর্ণ গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। মানুষের দানকৃত সামান্য খাদ্যের ওপর তাকে নির্ভর করতে হত। তবু তাকে দেখানো হয় পরিচ্ছন্ন, চর্চিত, ঋজু, নির্মল বস্ত্র পরিহিত, তাঁর চারপাশে সব কিছু নিশ্চল, যেন তিনি বাতাসে ভর করে চলেছেন। অনেকের কাছেই এটাকে অবাস্তব নির্বোধ ভক্তের নিষ্ফল অলংকরণ বলেই মনে হয়।

এসব অলংকরণ খুলে ফেললে আমরা যা পাব তা হলো একজন পূর্ণ মানবিক, আন্তরিক ও আবেগপ্রবণ ব্যক্তি, যিনি সহজেই ক্রুদ্ধ হতে সক্ষম, যিনি প্রচারে রত ছিলেন অত্যন্ত সরল ও গভীর তত্ত্ব; যার মূলে ছিল সার্বজনীন ঈশ্বর পিতৃত্ব এবং স্বর্গীয় রাজত্ব কায়েম। পরিষ্কারভাবে তিনি ছিলেন একজন মানুষ, সরল কথায়

www.nagorikpathagar.org

বলতে গেলে একজন উদার ব্যক্তিত্বের মানুষ। তিনি অনেক ভক্ত অনুসারীদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন, এবং তাদেরকে প্রেম ও সাহসিকতায় উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর উপস্থিতি অসুস্থ ও দুর্বল মানুষদের সুস্থ ও উজ্জীবিত করত। তবে তিনি ছিলেন এক ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের লোক, যা বোঝা যায় ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তার দ্রুত প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়ে। কথিত আছে যে ক্রুশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তিন বছর গ্রামাঞ্চলে তার মতবাদ প্রচার করে তিনি জেরুজালেমে ফিরে আসেন এবং অদ্ভুত এক রাজত্ব কায়েম করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এই অভিযোগে তার বিচার হয় এবং দুজন চোরের সাথে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তার সহযাত্রীদের মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায়।

যিশুর মূল তত্ত্ব ঈশ্বরের রাজত্ব নিশ্চয়ই এক মহান তত্ত্ব ছিল, যা সারা পৃথিবীকে নাড়া দিয়েছিল। এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই যে তৎকালীন বিশ্ব এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। যিশু যে ঈশ্বরের রাজ্যের তত্ত্ব প্রচার করেন তা ছিল তৎকালীন বিবাদবিক্ষুব্ধ বিশ্বে এক আপসহীন দাবি যা দিয়ে বিশ্বকে কলুষমুক্ত করা যায়।

ইহুদিরা প্রচার করত ন্যায়পরায়ণ একমাত্র ঈশ্বরই জগতের প্রভু, তবে সে ঈশ্বর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিরও ছিল যিনি পিতা আব্রাহামের সাথে দরকষাকষিতে নেমেছিলেন, বেশ ভালো সওদাই ছিল তাদের জন্য, তা হলো পৃথিবীতে তাদের প্রাধান্য এনে দেওয়া, হতাশা আর ক্রোধ নিয়ে তারা দেখল যিশু তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। তিনি শেখাচ্ছেন ঈশ্বর সওদা করার ব্যক্তি নন, স্বর্গীয় রাজ্যে তাঁর কোনো পছন্দের জাতি নেই। ঈশ্বর সফল প্রাণীর জীবন, পিতা, পূর্বের মতোই তিনি কারো প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখান না। সকল মানুষ ভাই ভাই, তিনি পাপীদের পিতা, সবাই তার আদরের পুত্র। গুড সামারিটান রূপকে দেখা যায় মানুষের সেই প্রবৃত্তির প্রতি যিশু ব্যঙ্গ করছেন যাতে নিজেদের লোকদের গৌরবান্বিত করা হচ্ছে আর অপর জাতির ভালো কাজকে ছোট করে দেখা হচ্ছে। শ্রমিকদের রূপকে তিনি ইহুদিদের ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ দাবি প্রত্যাখ্যান করছেন। ঈশ্বর যাদের স্বর্গরাজ্যে গ্রহণ করেন, তিনি তাদের সেবাও করেন, তাঁর আচরণে বৈষম্যের অবকাশ নেই, কারণ তার করুণার কোনো মাপজোক নেই। তার কাছে কারো অগ্রাধিকার নেই, নেই কোন অজুহাত। ঈশ্বরের প্রেমের বন্যায় সংকীর্ণ পারিবারিক আনুগত্য ভেসে যায়। গোটা স্বর্গরাজ্য তার পরিবার। বলা হয় যে যখন তিনি লোকদের প্রতি বাণী প্রচার করছেন, তার মাতা ও তার ভ্রাতারা তার সাথে কথা বলার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি উত্তর করলেন, 'কে আমার মা? আর কেই বা ভ্রাতা?' এই বলে তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলেন আর বললেন, 'ঐ দেখ আমার মা আর ভাইয়েরা।'*

---

* ম্যাথু XII.46.50

www.nagorikpathagar.org

ঈশ্বরের সার্বজনীন পিতৃত্ব আর সব মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের নামে যিশু শুধু যে দেশপ্রেমের প্রতি আঘাত হেনেছেন, তা-ই নয়, পারিবারিক আনুগত্যের প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। তবে এটা বেশ পরিষ্কার যে, তিনি সকল প্রকার অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের নিন্দা করেছেন, সকল ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জন ও বিশেষ সুযোগ প্রদানের বিরোধিতা করেছেন। সকল মানুষ ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা, আর সকল সম্পদ ঈশ্বরের সম্পত্তি। সৎ জীবনযাপনই উত্তম জীবন, আমাদের যা কিছু আছে তা ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত। ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তির জন্য বিশেষ সুযোগ সংরক্ষণের বিপক্ষে ছিলেন তিনি।

"একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে চলছেন, একজন দৌড়ে এসে তার সামনে নতজানু হয়ে, বলল, প্রিয় প্রভু, অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমি কী করতে পারি? যিশু তাকে বললেন তুমি আমাকে প্রিয় কেন বললে? ঈশ্বর ছাড়া কেউ মহান নেই, তুমি ঈশ্বরের নির্দেশ জান, ব্যভিচার করো না, হত্যা করো না, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করো। সেই ব্যক্তি উত্তর দিলো, প্রভু, আমি শৈশব থেকেই এসব পালন করছি। তখন যিশু তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার মধ্যে একটা জিনিসের অভাব আছে, সোজা চলে যাও, যা কিছু আছে বিক্রি করে দাও, আর দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দাও, তা হলে স্বর্গে সব কিছু ফিরে পাবে; এখন আসো। এই ক্রুশটা তুলে নাও, আর আমাকে অনুসরণ কর।একথা শুনে সে বিষণ্ন হল; দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে চলে গেল। কারণ তার ছিল বিশাল সম্পদ।"

আর যিশু চারদিকে তাকিয়ে তার শিষ্যদের বললেন, যাদের অঢেল সম্পদ আছে, স্বর্গে প্রবেশ তাদের জন্য কত কঠিন হবে! তাঁর কথা শুনে শিষ্যরা অবাক। তবে যিশু আবার উত্তর করলেন, বাছারা, অঢেল সম্পদের মালিকদের স্বর্গে প্রবেশ সত্যিই কঠিন হবে। সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের পার হয়ে যাওয়া সহজ কিন্তু ধনীদের স্বর্গে প্রবেশ তার চেয়েও শক্ত।*

অধিকন্তু ঈশ্বরের রাজ্য, যেখানে সকল মানুষ প্রভুর সাথে একত্রিত হবে, যে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে যিশু ছিলেন আপসহীন। আর একটা বিষয়ে তার যে বাণী সংরক্ষিত আছে তা হলো কঠোর ধার্মিক জীবনযাপন। কারিমি (নিষ্ঠাবান ইহুদি) আর স্ক্রাইবরা (ইহুদিদের দলিল লেখক) তাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তোমার শিষ্যরা জ্যেষ্ঠদের পদাংক অনুসরণ করে না কেন? আর অধৌত হাতে খাবার খায়? তাদেরকে তিনি উত্তর দেন, বেশ তোমরা ভণ্ডদের প্রতি ইসাইয়া ঠিকই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

'এসব লোকের ঠোঁটেই শুধু আমার প্রতি সম্মান, তাদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে; যাহোক তারা বৃথাই আমার আরাধনা করে। মানুষের আদেশ নির্দেশ তাদের কাছে অকাট্য, কারণ ঈশ্বরের নির্দেশের চেয়ে মানুষের আদেশ তাদের কাছে বেশি গ্রহণীয়, যেমন পাত্র, পেয়ালা ইত্যাদি মার্জনা করা। তিনি তাদের বলেন, বেশ ভালোভাবেই তোমরা ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য কর, যাতে তোমরা তোমাদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে পার।*

---

* মার্ক X. ১৭.২৫

* মার্ক VII ৫-৯

www.nagorikpathagar.org

যিশু শুধুমাত্র নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই বিপ্লব এনেছিলেন; তা-ই নয়, বেশ পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এক ধরনের সাদাসিধা রাজনৈতিক ধ্যানধারণা তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সত্য যে তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর রাজত্ব এই পৃথিবীতে নয়, এটা রয়েছে মানুষের হৃদয়ে, সিংহাসেন নয়। তবে এটা বেশ পরিষ্কার যে, মানুষের হৃদয়ে তার রাজত্ব যতই বিস্তার লাভ করুক না কেন, বাইরের পৃথিবীতেও তা আলোড়ন তুলতে পেরেছিল।

অনেকে হয়তো অন্ধ বধির হয়ে তাঁর বাণীর অন্তর্নিহিত অনেক কিছু গ্রহণ করতে ব্যর্থ হতে পারে, তবে পৃথিবীতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়নে তাঁর সংকল্প অজ্ঞাত থাকে না। তার শিক্ষার বিরোধিতা, তার বিচার ও দণ্ডাদেশ দেখে বোঝা যায় তার সমসাময়িকীদের কাছে তাঁর বিপ্লব্রাত্মক পরিবর্তনের ধারা কতটা বিপজ্জনক মনে হতে পারে। তিনি মানুষের চিন্তা ও মননে একটা আমূল পরিবর্তনের সূচনা করতে চেয়েছিলেন।

তিনি সাদামাটাভাবে যে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ধনী আর সমৃদ্ধ লোকেরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে হয়তো তারা কোণঠাসা হয়ে পড়বে। তিনি ছিলেন এক ভয়ংকর নৈতিক শিকারি যিনি এ যাবৎ গর্তের মধ্যে আরামে ঘুমিয়ে থাকা মানবজাতিকে টেনে বের করে আনবেন। তার উজ্জ্বল আলোকছটাময় সাম্রাজ্যে সম্পত্তি থাকবে না, সুযোগ-সুবিধা থাকবে না, অহংকার থাকবে না, থাকবে না অগ্রাধিকার। কোনো মতলব টিকবে না, প্রেম ছাড়া আর কোনো পুরস্কার নেই। কাজেই অবাক হওয়ার কী আছে যে মানুষের চোখ সেই আলোকছটায় ঝলসে গিয়েছিল আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে তারস্বরে চিৎকার করেছিল? এমনকি তাঁর শিষ্যরাও চেঁচাতে শুরু করেছিল। পুরোহিতরা মরিয়া হয়ে ভাবতে শুরু করেছিল, হয় এই লোকটা টিকে থাকবে নয়তো তারা টিকে যাবে। রোমান সৈন্যরা ভাবতে শুরু করেছিল তাদের নিয়ম শৃংখলা হয়তো হাস্যকর মনে হবে।

৩৮. আদর্শিক খ্রিষ্টীয় মতবাদের বিকাশ

চার গস্পেলের মধ্যে আমরা যিশুর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার পরিচয় পাই, তবে তার মধ্যে খ্রিষ্টীয় গির্জার কট্টোরবাদের দেখা মেলেনা। খ্রিষ্টের প্রত্যক্ষ কিছু অনুসারীর লেখা এপিস্টলের মধ্যেই কেবল মোটা দাগে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

খ্রিষ্টীয় মতবাদের ধারকদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে আছেন সেন্ট পল। তিনি কখনও যিশুখ্রিষ্টকে দেখেন নি বা তাঁর কথাও শোনেননি। পলের আসল নাম ছিল সল, আর প্রথম দিকে তিনি খ্রিষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরে মুষ্টিমেয় খ্রিষ্টভক্তদের যথেষ্ট পীড়ন করেছিলেন। তারপর হঠাৎ করেই একসময় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়ে

www.nagorikpathagar.org

নিজের নাম পলে বদলে ফেলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ আর তৎকালীন ধর্মীয় আন্দোলনে গভীরভাবে আগ্রহী। সে সময়কার ইহুদিবাদ, মিথ্রীয়বাদ ও আলেকজান্দ্রীয় মতবাদ আত্মস্থ করেছিলেন। এসব তত্ত্বের বহু পরিভাষা ও ধ্যানধারণা তিনি খ্রিষ্টবাদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। খ্রিষ্টের মূল শিক্ষা বা তাঁর স্বর্গরাজ্যের ধারণা নিয়ে তার খুব কমই আগ্রহ ছিল। তবে তিনি প্রচার করেছিলেন যিশু শুধুমাত্র ইহুদিদের প্রতিশ্রুত পরিত্রাতা ছিলেন না, বরং তার মৃত্যু ছিল এক মহান আত্মত্যাগ, মানবজাতির মুক্তির জন্য এক মহান বলি।

যখন একাধিক ধর্ম পাশাপাশি চলতে থাকে, তখন একে অপরের কিছু আনুষ্ঠানিকতা এবং বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে থাকে। যেমন চীনের বৌদ্ধমন্দিরগুলি অবিকল তাওবাদীদের মন্দিরের আদলে তৈরি, যদিও তাওবাদ আর বৌদ্ধবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। খ্রিষ্টধর্মের জন্য এটা নিশ্চয়ই অগৌরবের যে শুধু যে এটা মিথ্রীয় ও আলেকজান্দ্রীয় মতবাদের বহিরাঙ্গিক বিষয় যেমন মুণ্ডিতমস্তক পুরোহিত, নৈবেদ্য-নিবেদন, বেদীতে প্রদীপ প্রজ্বলন, তাদের মতো করে মন্ত্রোচ্চারণই নয় তাদের কিছু ধর্মীয় বাক্যবন্ধ এমনকি ধ্যানধারণা গ্রহণ করেছে। এসব ধর্মবিশ্বাসের আশেপাশে কিছু ক্ষুদ্রতর মতবাদও প্রচলিত ছিল। তারাও মানুষকে তাদের বিশ্বাসের দিকে আকর্ষণ করছিল আর ধর্মান্তর প্রক্রিয়াও চলছিল অহরহ। মাঝে মধ্যে কোনো কোনোটা রাজানুকূল্য লাভ করত। তবে খ্রিষ্ট মতবাদকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে বেশি সন্দেহের চোখে দেখা হত, কারণ ইহুদিদের মতো খ্রিষ্টানরা সিজারকে ঈশ্বর বলে পূজা করতে চায়নি। এ কারণে এটা বিদ্রোহী ধর্ম বলে পরিগণিত হয়।

সেন্ট পল তার শিষ্যদের এই ধারণা দিয়েছিল যে অসিরিসের মতো যিশুও মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠে তাঁর ভক্তদের অমরত্ব প্রদান করবে। খ্রিষ্টধর্মের বিস্তৃতির সাথে খ্রিষ্টধর্মের মধ্যেও তত্ত্বগত বিরোধ শুরু হলো, যা রূপ নিলো যিশুর ঈশ্বরীকরণ আর মানবজাতির পিতা ঈশ্বর এই দুই মতবাদের দ্বন্দ্বে। এরিয়ানরা প্রচার করছিল যে যিশুর মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি ছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের সমকক্ষ ছিলেন না। স্যাবেলীয়রা প্রচার করত যিশু ছিলেন ঈশ্বরের একটা রূপমাত্র আর ঈশ্বর ছিলেন একাধারে যিশু ও পিতা, যেমন একজন মানুষ পিতাও হতে পারেন আবার নির্মাতাও হতে পারেন; ত্রিত্ববাদীরা আরো সুচতুর এক মতবাদ পোষণ করত যে ঈশ্বর একাধারে তিনের সমষ্টি: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। এক সময় মনে হয়েছিল এরিয়ানরাই বুঝি প্রাধান্য লাভ করবে তারপর বিবাদ, হানাহানি এবং অবশেষে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টীয় জগতে ত্রিত্ববাদই প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

এসব বাদ বিসম্বাদের মধ্যে আমরা কোনো মন্তব্য করতে চাই না। এগুলি ইতিহাসকে দোলা দিতে পারেনি, যেমনটা দোলা দিয়েছিল যিশুর শিক্ষা। যিশুর ব্যক্তিগত শিক্ষা বোধ হয় আমাদের জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে নতুন এক যুগের সূচনা করেছিল। ঈশ্বরের সার্বজনীন পিতৃত্ব এবং তদর্থে বিশ্বভ্রাতৃত্ব পরবর্তীকালে মানব জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব

www.nagorikpathagar.org

ফেলেছিল। যিশুর শিক্ষার ফলে মানুষ মানুষরূপে মর্যাদা পেতে শুরু করে। কথিত আছে, সেন্ট পলের শিক্ষায় কৃতদাসদের আনুগত্যের কথা বলা আছে, তবে গস্পেলে যিশুর যে শিক্ষার কথা বিবৃত, তাতে খ্রিষ্টধর্ম মানুষকে পদানত করে রাখার বিরোধী। গ্লাডিয়েটরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো নিষ্ঠুরতা যে খ্রিষ্টধর্মে নিষিদ্ধ হয়েছিল, তা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ।

যিশুখ্রিষ্টের মৃত্যুর পর দুই শতাব্দী ধরে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটছিল। কোনো কোনো রোমান সম্রাট শত্রুভাবাপন্ন ছিল আবার কেউ কেউ সহানুভূতিশীলও ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এই নতুন বিশ্বাস দমিয়ে রাখার চেষ্টা ছিল, তারপর, ৩০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে ডায়োক্লিশিয়ানের আমলে খ্রিষ্টানদের প্রবল অত্যাচার চলে। গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলে। বাইবেল ও ধর্মীয় লেখাগুলি বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করে ফেলা হয়, খ্রিষ্টানদের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার হরণ করা হয় এবং অনেকের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। গ্রন্থ ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়াই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। এতে বোঝা যায় কর্তৃপক্ষ অনুমান করতে পেরেছিল লিখিত শব্দ নতুন ধর্ম বিশ্বাসকে কতটা শক্ত করে ধরে রাখতে পারে। এই গ্রন্থনির্ভর ধর্ম খ্রিষ্টধর্ম ও ইহুদিবাদ উভয়েই মানুষকে শিক্ষাদান করে। তাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে লোকে এর মর্মকথা পাঠ করে বুঝতে পারে। প্রাচীন ধর্মগুলির মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে আবেদন ছিল না।

ডায়োক্লিশিয়ান নিপীড়ন খ্রিষ্টসমাজকে পুরোপুরি দমিয়ে রাখতে পারেনি। কোনো কোনো প্রদেশে এর কোনোই প্রভাব পড়েনি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ ও বেশ কিছু সরকারি কর্মচারী খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। ৩১১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট গ্যালেরিয়াস সহনশীলতার এক অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। ৩২৪ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিন রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। তিনি পতাকা ও বর্মে খ্রিষ্টীয় প্রতীক অংকন করান।

কয়েক বছরের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম সরকারি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মগুলি নিঃশেষ হয়ে যায় অথবা নতুন ধর্মের মধ্যে মিশে যায়, আর ৩৯০ খ্রিষ্টাব্দে থিয়োডসিয়াস দ্য গ্রেট আলেকজান্দ্রিয়ায় জুপিটার সেরাপিসের মূর্তি ধ্বংস করান। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের শুরুতে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র মন্দির বলতে কেবল খ্রিষ্টীয় গির্জা আর পুরোহিত বলতে খ্রিষ্টান পুরোহিতকেই বোঝাত।

৩৯. বর্বররা সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম দুভাগে ভাগ করে

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের পুরোটা সময় ধরেই রোমান সাম্রাজ্যে সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক বিভক্তি চলছিল আর তা ঘটছিল বর্বরদের মোকাবিলা করতে গিয়েও।

www.nagorikpathagar.org

সম্রাটদের সামলাতে হচ্ছিল সেনাধ্যক্ষদের স্বেচ্ছাচারিতা আর সামরিক প্রয়োজনেই রাজধানী স্থানান্তর। রাজকীয় হেডকোয়ার্টার করতে হয়েছে উত্তর ইতালির মিলানে, আবার কখনও সার্বিয়াম সির্মিয়াম বা নিশে, আবার সেখান থেকে সরিয়ে এশিয়া মাইনরের নিকোমেডিয়ায়, ইতালির মাঝামাঝি রোম থেকে সাম্রাজ্য সামলানো সুবিধাজনক মনে হচ্ছিল না। তখন অবধি সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে শান্তি বিরাজিত ছিল, লোকে নিরস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করতে পারছিল। সেনাবাহিনী তখন পর্যন্ত ক্ষমতার ভিত্তি ছিল। সম্রাট সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করতেন, তবে ধীরে ধীরে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছিল। ডাইওক্লিশিয়ান নিজে প্রাচ্য পোশাক পরিধান করে রাজদণ্ড ধারণ করেন।

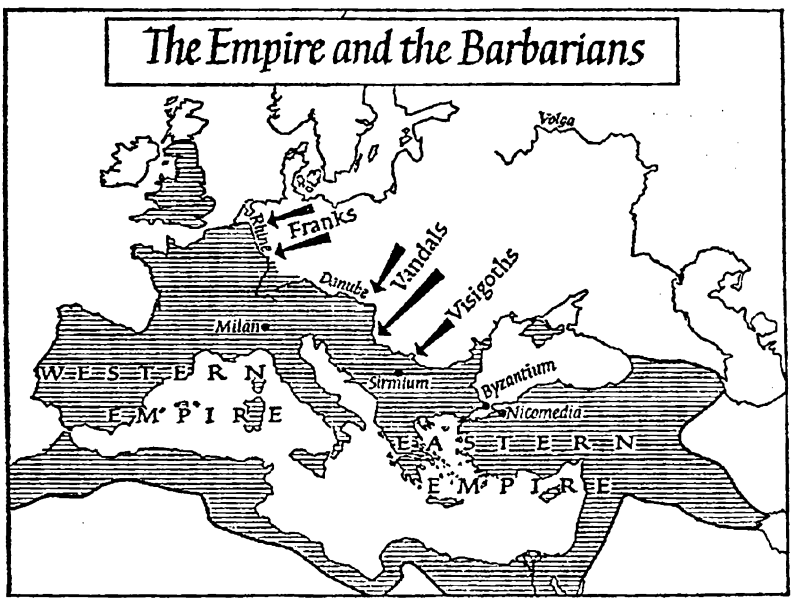

৭. সাম্রাজ্য ও বর্বর জাতিসমূহ

রাইন ও দানিয়ুবের কূল বরাবর সাম্রাজ্য সীমান্তে শত্রুরা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফ্রাংক ও অন্যান্য জার্মান উপজাতীয়রা রাইন পর্যন্ত এগিয়ে আসে। উত্তর হাঙ্গেরিতে ভ্যান্ডালরা আর ডেসিয়া অর্থাৎ বর্তমান রুমেনিয়ায় ভিসিগথরা শক্তি সঞ্চয় করে। তাদের পেছনে দক্ষিণ রাশিয়ায় অস্ট্রোগথ, আর তারও বাইরে ভল্গা এলাকায় এলানরা। তবে ইতিমধ্যে মঙ্গোলীয়রাও ইউরোপের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। হুনরা ইতিমধ্যে অ্যালান এবং অস্ট্রোগথদের কাছ থেকে কর আদায় করতে আর তাদেরকে পশ্চিমে হটিয়ে দিতে শুরু করেছে।

www.nagorikpathagar.org

এশিয়ায় নবজাগ্রত ইরানের চাপে রোম সীমান্ত ভেঙে পড়ার অবস্থা। সাসানীয় রাজাদের এই নবজাগ্রত পারস্য পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে রোম সাম্রাজ্যের এক শক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

ইউরোপের ম্যাপের দিকে তাকালেই পাঠকরা রোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। দানিয়ুব নদী আড্রিয়াটিক সাগরের দু'শ মাইলের মধ্যে বর্তমান বসনিয়া ও সার্বিয়ার দিকে এগিয়ে আসে। রোমানরা কখনও তাদের নৌযোগাযোগ সঠিক অবস্থায় রাখতে পারেনি আর এই দু'শ মাইল চওড়া ভূখণ্ডই কেবল তাদের পশ্চিমের লাতিনভাষী ও পূর্বের গ্রিকভাষী অংশের যোগসূত্র। এ ক্ষেত্রের বাইরে বর্বরদের চাপ ছিল তীব্র।

একটা শক্ত সাম্রাজ্য হলে হয়তো সামনে এগিয়ে গিয়ে ডেসিয়া পুনরুদ্ধার করতে পারত, তবে রোমান সাম্রাজ্যে সে তেজস্বিতার অভাব। মহান কনস্টান্টিনের সে তেজ বুদ্ধি ছিল, তিনি ঠিক এই বল্কান অঞ্চল থেকেই গথদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তবে দানিয়ুবের ওপারে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না তাঁর। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই তাকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হত। খ্রিষ্টবাদের মাধ্যমে তিনি ঐক্য ও নৈতিক শক্তির আমদানি করতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, এজন্য তিনি বাইজান্টিয়ামে স্থায়ী রাজধানী নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এই নবনির্মিত বাইজান্টিয়াম, তার সম্মানার্থে যার নতুন নাম দেওয়া হয় কনস্টান্টিনোপল, তাঁর মৃত্যুকালেও যা নির্মাণাধীন ছিল। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে একটা অদ্ভুত রফা হয়। গথদের চাপের মুখে ভ্যান্ডালরা রোমানদের সাথে মিলিত হতে চায়। তাদের জন্য প্যানোনিয়া ভূখণ্ডটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, বর্তমানে দানিয়ুবের পশ্চিমে হাঙ্গেরির অংশ, আর তাদের যোদ্ধারা রোমান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। তবে এ বাহিনী তাদের সেনানায়কদের অধীনেই থেকে যায়। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই কনস্টান্টিন প্রাণত্যাগ করেন, আর তাঁর মৃত্যুর পরেই ভিসিগথরা কন্সটান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে এসে পড়ে। তারা আদ্রিয়ানোপলে সম্রাট ভ্যালেন্সকে পরাজিত করে বর্তমান বুলগেরিয়াতে বসতি গড়ে তোলে, ঠিক যেমনটা ভ্যান্ডালরা করে প্যানোনিয়াতে। নামত সম্রাটের প্রজা হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল বিজেতা।

৩৭৯ থেকে ৩৯৫ পর্যন্ত ছিল সম্রাট থিয়োডোসিয়াস দ্য গ্রেটের রাজত্বকাল আর তাঁর শাসনকালে আকারগত দিক থেকে সাম্রাজ্য অখণ্ডই থাকে। ইতালি আর প্যানোনিয়াতে সেনাবাহিনীর আধিপত্যে ছিল স্টিলিকো নামের এক ভ্যাণ্ডাল, আর বল্কান উপদ্বীপের সৈন্যাধিপত্য ন্যস্ত হয় আলারিক নামে এক গথের ওপর। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ দিকে থিয়োডসিয়াস মারা যান দুই পুত্র রেখে। আলারিক তাদের মধ্যে একজন আর্কেডিয়াসকে সমর্থন করে কনস্টান্টিনোপলে, আর মিটলিকো অন্য আর একজন হনোরিয়াসকে সমর্থন করে ইতালিতে। অন্যভাবে বলতে গেলে আলারিক ও স্টিলিকো দুই পুতুল রাজপুত্রের হয়ে সিংহাসনের জন্য

www.nagorikpathagar.org

লড়াই করে। এসব সংঘর্ষের একপর্যায়ে আলারিক ইতালিতে ঢুকে পড়ে এবং রোম দখল করে নেয় (৪১০ খ্রিষ্টাব্দ)।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমগ্র রোম সাম্রাজ্য বর্বর লুটেরাদের শিকারে পরিণত হয়। সেই সময়কার পৃথিবীর অবস্থা বোঝা বেশ কষ্টকর। রোম সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও বল্কান উপদ্বীপে যেসব সমৃদ্ধ নগরী গড়ে উঠেছিল, তা তখন টিকে ছিল দরিদ্র, শ্রীহীন ও সংখ্যাল্প জনবসতি নিয়ে। জীবন সেখানে হয়ে উঠেছিল হালকা, নিম্নমান ও অনিশ্চয়তায় ভরা। রাজকর্মচারী দূরস্থিত সম্রাটের নামে নিজেরা ইচ্ছামতো রাজ্য চালাতে শুরু করে। গির্জাগুলি তখনও টিকে ছিল, তবে অশিক্ষিত পুরোহিতদের দ্বারা পরিচালিত। বিদ্যাচর্চা ছিল সামান্য আর কুসংস্কার আর ভীতির প্রাধান্য ছিল। তবে লুটেরারা যেখানে ধ্বংস করেনি সেখানে বই, ছবি আর মূর্তি দেখা যেত।

গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রাও ছিল নিম্নমুখী। রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্রই ছিল অপরিচ্ছন্নতা আর আগাছাময়। কোনো কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ আর মহামারী দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। রাস্তাঘাট আর বনবাদাড়ে লুটেরাদের আখড়া। এসব জায়গায় বর্বররা তাদের নিজস্ব নেতাকে প্রতিষ্ঠিত করে কোনো বাধা ছাড়াই, মাঝে মধ্যে তারা রোমের সরকারি পদবিও গ্রহণ করত। তাদের মধ্যে যারা অর্ধবর্বর, তারা সহজ শর্তে রাজ্য শাসন করত। তারা শহর দখল করত, জনগণের সাথে মিশত, আন্তঃবিবাহ চালু করত আর ভাঙা ভাঙা ইতালীয় ভাষাও বলতে পারত; তবে ব্রিটেনের যেসব অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, সেখানকার অধিবাসী জুট, অ্যাংগল ও স্যাক্সনরা ছিল কৃষিজীবী, তারা শহরের ধার ধারত না। তারা রোমান এলাকা ছেড়ে দক্ষিণ ব্রিটেনে চলে গিয়ে টিউটনিক উপভাষায় কথা বলত যা পরবর্তীকালে ইংরেজিতে রূপ নেয়।

বিভিন্ন জার্মান ও শ্লাভনিক গোত্রের সব ধরনের লোকের গতিবিধি বর্ণনা করার তেমন সুযোগ নেই, যেহেতু তারা বিশৃঙ্খলভাবে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে লুটপাটের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। ভ্যান্ডালদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। তারা ইতিহাসে উঠে আসে পূর্ব জার্মানি থেকে। তারা প্যানোনিয়ায় বসবাস শুরু করে। তারপর তারা ৪২৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়ে স্পেনের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে গিয়ে তারা দেখল ইতিমধ্যেই ভিসিগথরা তাদের ডিউক আর রাজার অধীনে বসবাস করছে। স্পেন থেকে ভ্যান্ডালরা তাদের নেতা জেনসেরিকের নেতৃত্বে জলপথে উত্তর আফ্রিকায় গিয়ে কার্থেজ দখল করে নেয় (৪৫৬ খ্রি:), যা প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে আলেরিক বাহিনীর লুটপাট, ধ্বংসলীলা থেকে সবে কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এরপর ভ্যান্ডালরা অধিকাংশ পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ যেমন সিসিলি, কর্সিকা, সার্দিনিয়া ইত্যাদির কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। তারা একটা সমুদ্র সাম্রাজ্য স্থাপন করে, যেমনটা করেছিল ৭০০ বছর আগে কার্থেজীয়রা। ৪৭৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তারা ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে। অল্পকিছু

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যক বিজেতা বিশাল এলাকার মালিক হয়ে বসে। পরবর্তী শতাব্দীতে প্রথম জাস্টিনিয়ানের নেতৃত্বে তাদের পুরো এলাকা আবার রোমান দখলে চলে যায়।

৪০. হুনদের অভ্যুদয় এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের সমাপ্তি

ইউরোপে বিজয়ী হুন আবির্ভাব মানব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী অবধি মঙ্গোল ও নর্ডিকরা কাছাকাছি হয়নি। উত্তরের বরফাচ্ছন্ন অঞ্চল থেকে মঙ্গোলীয়দের এক উপজাতি ল্যাপরা পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসে, তবে তারা ইতিহাসে তেমন বড় কোনো ভূমিকা পালন করেনি। হাজার বছর ধরে পশ্চিমা জগতে আর্য, সেমিটিক আর কিছু বাদামি জাতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে, তবে দূরপ্রাচ্যের মঙ্গোলীয় হস্তক্ষেপ ছিল না বললেই চলে।

যাযাবর মঙ্গোলীয়দের পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়ার দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথম কারণ মহান চীন সাম্রাজ্যের সংহত হওয়া, উত্তর দিকে এর সম্প্রসারণ, আর হ্যান বংশের রাজত্বকালে এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দ্বিতীয় কারণ, জলবায়ুর পরিবর্তন, বৃষ্টিপাতের স্বল্পতায় জলাভূমি ও অরণ্য অঞ্চলের বিলোপ, আর অন্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির ফলে স্তেপভূমির সম্প্রসারণ এসবই তাদেরকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। ছোটখাটো যেসব কারণ ছিল সেগুলি হলো অর্থনৈতিক সংকট, অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়, আর রোমান সাম্রাজ্যে জনসংখ্যা হ্রাস। পরবর্তী রোমান রিপাবলিকে বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয় আর সেনা শাসকরা অতিরিক্ত কর আদায়ের ফলে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত। পূর্ব দিকের চাপ পশ্চিমের পচন আর রাস্তাঘাটের উন্নতি, এসবই মঙ্গল আগমনের কারণ।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই হুনরা ইউরোপীয় রাশিয়ার সীমান্তে হানা দেয়, তবে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর আগে এই অশ্বারোহীরা স্তেপভূমিতে প্রাধান্য অর্জন করতে পারেনি। পঞ্চম শতাব্দী ছিল হুনদের শতাব্দী। প্রথম যে হুন দলটি ইতালি পর্যন্ত এসেছিল তারা ছিল ভ্যাণ্ডাল স্টেলিকোর ভাড়াটিয়া। শিগগিরই তারা ভ্যান্ডালদের, পরিত্যক্ত নীড় প্যানোনিয়া দখল করে নেয়।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে এক মহাপরাক্রমশালী হুন সর্দার অ্যাটিলার আবির্ভাব ঘটে। তার ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা শুধু অস্পষ্ট ধোঁয়াশে ধারণাই লাভ করতে পারি। তিনি শুধু হুনদের ওপরই কর্তৃত্ব করেননি, মিশ্রিত জার্মান জাতির ওপরও আধিপত্য করেন। তাঁর সাম্রাজ্য রাইন নদী থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি চীনের সাথেও দূতবিনিময় করেন। তার মূল ঘাঁটি ছিল দানিয়ুবের পূর্ব পাড়ে হাঙ্গেরিতে। সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করে প্রিস্কাস নামে কনস্টান্টিনোপলের এক বিশেষ দূত যিনি আমাদের জন্য তার (অ্যাটিলা) একটা বিবরণ রেখে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মঙ্গোলদের জীবন যাত্রা অনেকটা প্রাচীন আর্যদের মতো। সাধারণ হুনরা শিকার করত ও তাঁবুতে বাস করত; প্রবীণরা বাস করত কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা বিশাল হলঘরে। ওখানে চলত পানভোজন আর চারণ কবিদের সঙ্গীত। হোমারের কাব্যের নায়করা এমনকি আলেকজান্ডারের সঙ্গীরাও অ্যাটিলার ধাঁচে নির্মিত কাঠের দুর্গে বাস করতে আরাম বোধ করতেন।

কিছু সময়ের জন্য এমনটা ধারণা জন্মে যে অ্যাটিলার নেতৃত্বে হুনরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রেকো-রোমানদের বিরুদ্ধে একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, যেমনটা করেছিল বহুকাল পূর্বে গ্রিক বর্বররা ঈজিয়ান সভ্যতার প্রতি। এটা যেন বৃহত্তর পটভূমিতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। তবে গ্রিকদের চেয়ে হুনদের যাযাবর জীবনের সম্পর্ক অধিকতর নিবিড় ছিল। যারা যাযাবরের চেয়ে অধিকমাত্রায় পশুপালক ছিল। হুনরা আক্রমণ করে লুটপাট করেছে, তবে স্থায়ী বসতি গড়ার চেষ্টা করে নি।

কিছুকাল যাবৎ অ্যাটিলা থিয়োডসিয়াসকে ভয় দেখিয়ে ইচ্ছামতো ফায়দা হাসিল করেছে। তার বাহিনীর লোকেরা কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের কাছ পর্যন্ত ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাট চালিয়েছে। গীবন লিখেছেন, তিনি বল্কান উপদ্বীপে সত্তরটির মতো শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিলেন। থিওডোসিয়াস তাকে কর দিয়ে তুষ্ট করেছিলেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছিলেন। ৪৫১ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাটিলা লাতিন ভাষাভাষী সাম্রাজ্যের অর্ধেক গলদের আক্রমণ করেন। উত্তর গলের প্রায় সব শহরই ধ্বংস করে ফেলা হয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রাংক, ভিসিগথ ও রাজকীয় বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে ট্রয়েসের এক মহাযুদ্ধে তাকে পরাজিত করে। বলা হয়, সেই যুদ্ধে দেড় লাখ থেকে তিন লাখ লোকের মৃত্যু হয়। গলে তাকে ঠেকিয়ে দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু তার বিশাল বাহিনী এখানেই শেষ হয়ে যায় না। পরের বছর তিনি ভেনেসিয়ার পথে ইতালি ঢুকে পড়েন, একুইলিয়া ও পাদুয়া জ্বালিয়ে দেন আর মিলানে চালান লুটতরাজ।

উত্তর ইতালির এসব শহর বিশেষ করে পাদুয়া থেকে কিছু লোক পালিয়ে গিয়ে আড্রিয়াটিক সাগরের মধ্যে অবস্থিত লেগুনের মধ্যের কিছু দ্বীপে আশ্রয় নেয় আর ওখানেই গড়ে তোলে ভেনিস নগরী, যা মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য বন্দর হয়ে ওঠে।

৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে একটা মেয়েকে বিয়ে করে তার বিয়ের ভোজের অনুষ্ঠানে আমোদ ফূর্তি করতে গিয়ে এটিলা হঠাৎ মারা যান। তার মৃত্যুর সাথে সাথেই তার লুটেরা বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সত্যিকারের হুনরা ইতিহাস থেকে মুছে যায়। আর তাদের অধিকাংশ লোকই আর্যভাষী লোকদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তবে এসব হুন আক্রমণে প্রকৃতপক্ষে লাতিন রোমান সাম্রাজ্যের সমাপ্তি নিয়ে আসে। তার মৃত্যুর পর দশজন বিভিন্ন রোমান সম্রাট, বিশ বছর টিকে ছিল বিশেষ করে ভ্যান্ডাল বা অন্যান্য ভাড়াটিয়া বাহিনীর সহায়তায়। কার্থেজ থেকে ভ্যান্ডালরা রোম লুটপাট করে ৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।

www.nagorikpathagar.org

অবশেষে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্বর বাহিনীর সর্দার যে রসুলাম অগাস্টালাস নাম ধারণ করে প্যানোনিয়ানদের দমন করে আর কনস্টান্টিনোপলে সংবাদ পাঠান যে পশ্চিমে আর কোনো সম্রাট নেই। এভাবেই অগৌরবজনকভাবে লাতিন রোমান সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গথ থিওডরিক রোমের রাজা হয়ে বসেন।

ইতিমধ্যে সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ বর্বর সর্দারদের শাসনাধীনে চলে আসে যারা রাজা, ডিউক ইত্যাদি উপাধি নিয়ে শাসনকার্য চালাতে থাকে, যদিও নামমাত্র সম্রাটের আনুগত্য প্রদর্শন করে, প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল স্বাধীন। শত শত এমনকি হাজার হাজার এ ধরনের বর্বর শাসক ছিল। গল, ইতালি, ডেসিয়াতে লাতিন ভাষা বিভিন্ন বিকৃত আকারে প্রচলিত ছিল, তবে ব্রিটেন ও রাইনের পূর্বপাড়ে জার্মান গ্রুপের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা হত (বোহেমিয়ায় স্লাভেনিক চেক ভাষা প্রচলিত ছিল)। উচ্চপদস্থ পুরোহিত শ্রেণী ও স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক লাতিন ভাষার চর্চা করত। সর্বত্রই জীবন ছিল অনিশ্চিত আর সম্পত্তির মালিকানা ছিল শক্তিমানদের হাতে। দুর্গের সংখ্যা বাড়ছিল আর রাস্তাঘাটের দশা হচ্ছিল বেহাল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ ছিল পশ্চিমা জগতে বিভক্তি আর বুদ্ধিবৃত্তির অবক্ষয়ের যুগ। সন্ত ও খ্রিষ্টীয় মিশনারিরা যদি ধরে না রাখত তাহলে লাতিন শিক্ষা পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যেত।

রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান কেন ঘটল আর কেনই বা বিলুপ্ত হয়ে গেল? এর উত্থান হয়েছিল নাগরিকত্বের অধিকার সুনিশ্চিত করে। প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগে এমনকি সাম্রাজ্যের প্রথম দিকেও রোমানদের নাগরিকত্বের অধিকার ছিল এবং বেশ কিছু ব্যক্তি নাগরিকত্বের অধিকার রক্ষায় নিশ্চিত ছিল এবং আইনের আশ্রয় লাভ করত। আইনের রক্ষক হিসেবে রোমের মর্যাদা রোমের সীমানা অতিক্রম করে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে কিছুদিন পূর্ব থেকেই পিউনিক যুদ্ধের শুরুতে নাগরিকত্ব চেতনার অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। সম্পদ বৃদ্ধি ও কৃতদাস প্রথার প্রসারের মধ্য দিয়ে নাগরিকত্বের পরিধি বাড়ছিল তবে নাগরিকত্ব বোধ সংকুচিত হচ্ছিল।

রোমান সাম্রাজ্য আসলে ছিল একটা প্রাচীন সংগঠন; এতে শিক্ষার প্রসার ছিল না; নাগরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে নাগরিকত্ব বোদের প্রসার ঘটানো হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাগরিকদের সহায়তা চাওয়া হয়নি। সার্বজনীন বোধের নিশ্চয়তার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়নি; সংঘবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের জন্য ভাবের আদান-প্রদান ছিল না। মেরিয়াস ও সুলার আমল থেকে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টায় রত ছিল, তারা সাম্রাজ্যের ভালোমন্দের ব্যাপারে জনগণের মতামত আহ্বান করেনি। নাগরিকত্ব বোধ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেদিকে কারো খেয়াল ছিল না। সব সাম্রাজ্য সব সংগঠন এবং মানব সমাজ বোঝাপড়ার সংগঠন। রোমান সাম্রাজ্যে সাধারণের ইচ্ছা লোপ পায় বলে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

যদিও পঞ্চম শতাব্দীতে লাতিন ভাষাভাষী রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, এর মধ্যে অন্য কিছুর জন্ম নেয়, যা তার সম্মান ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখে, আর তা হলো লাতিনভাষী ক্যাথলিক চার্চ। সাম্রাজ্যের অপমৃত্যুর পরও এটা টিকে থাকে, কারণ এটা

www.nagorikpathagar.org

মানুষের মনন ও ইচ্ছার কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, কারণ এর ছিল গ্রন্থ, ছিল শিক্ষক, আর ছিল মিশনারি যা ছিল আইন ও সৈন্যবাহিনীর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর পুরোটা সময় ধরেই যখন সাম্রাজ্য পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন সারা ইউরোপে খ্রিষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ছে। এটা তার বিজয়ী বর্বরদেরও জয় করতে সক্ষম হয়। অ্যাটিলা যখন রোমের দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন ধর্মপিতারা কেবল নৈতিক বলের দ্বারা তাকে ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

প্যাট্রিয়ার্ক বা পোপ সমগ্র খ্রিষ্টীয় চার্চের প্রধান হিসেবে দাবি করেন। যেহেতু এ সময় কোনো সম্রাট ছিল না, তারাই সম্রাটের ক্ষমতা ও পদবি নিয়ে নেয়। তিনি পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস, (রোমান সাম্রাজ্রের প্রধান পুরোহিত) হয়ে বসেন।

৪১. বায়জেন্টীয় ও সাসানীয় সাম্রাজ্য

গ্রিক ভাষাভাষী পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিমার্ধের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। এটা পঞ্চম শতাব্দীর বিপর্যয় সামাল দিতে পেরেছিল, যা আদি লাতিন রোম সাম্রাজ্যকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। এ্যাটিলা সর্বদাই সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসকে আতংকগ্রস্ত করে রাখত আর একেবারে কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের কাছ পর্যন্ত আক্রমণ চালাত আর লুটপাট করত, তবে নগরটি রয়ে যায় অক্ষত। নুবিয়ানরা নীল নদ বেয়ে নিচে নেমে মিশরের সীমান্তে লুটপাট চালায়, তবে মিশরের অভ্যন্তর ভাগ আর আলেকজান্দ্রিয়া সমৃদ্ধই রয়ে যায়। এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ এলাকা সাসানীয় পারসিকদের আক্রমণ রুখতে পেরেছিল।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পশ্চিমের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকার যুগ যেখানে গ্রিক শক্তির পুনরুত্থান ঘটছিল। প্রথম জাস্টিনিয়ান ছিলেন (৫২৭-৫৬৫) একজন শক্তিমান উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্রাট। তিনি বিয়ে করেছিলেন সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরাকে যিনি নিজেও ছিলেন এক সমর্থ মহিলা, পূর্বে যিনি ছিলেন একজন অভিনেত্রী। জাস্টিনিয়ান ভ্যান্ডালদের কাছ থেকে উত্তর আফ্রিকা আর গথদের কাছ থেকে ইতালির অধিকাংশ এলাকা জয় করে নেন। তিনি এমনকি স্পেনের দক্ষিণাংশও অধিকার করে নেন। তিনি তার সামর্থ্যকে শুধুমাত্র নৌ ও পদাতিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, কনস্টান্টিনোপলে বিশাল সোফিয়া গির্জা নির্মাণ এবং রোমান আইনকে গ্রন্থিত করেন। তবে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎখাতের জন্য তিনি এথেন্সের দর্শন বিদ্যালয়কে বন্ধ করে দেন, যা প্লেটোর আমল থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে পারস্য সাম্রাজ্য বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যের শক্ত প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়ে যায়। এই দুই সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব এশিয়া মাইনর, সিরিয়া

www.nagorikpathagar.org

আর মিশরকে সব সময় অস্থির করে রেখেছিল। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে বসতিপূর্ণ, তবে অবিরাম সৈন্যদের আনাগোনা, ধ্বংসলীলা, লুটপাট এবং উচ্চহারে সামরিক কর আদায় এসব অঞ্চলকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত শহর ভেঙে গিয়ে কৃষকদের গ্রামে পরিণত হলো। দারিদ্রীকরণ ও বিশৃংখলার এই যুগে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের চেয়ে মিশর বরং কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের মতো আলেকজান্দ্রিয়াও প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের মধ্যে নড়বড়ে বাণিজ্য টিকিয়ে রেখেছিল।

বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক দর্শন এই দুই ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যে এখন মৃত। এথেন্সের সর্বশেষ দার্শনিকরা পরিপূর্ণ দমিত হওয়ার আগপর্যন্ত অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল। তবে যেসব দার্শনিক সাহিত্যে সাহসিক স্বাধীন চিন্তা বিধৃত ছিল তার খুব কমই চর্চা হত। এই শ্রেণীর লোপ পাওয়াই ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার মূলে। তবে এ যুগে মানব মেধাচর্চার বন্ধ্যাত্বের আরও একটা কারণ ছিল পারস্য ও বাইজেন্টাইন উভয় স্থানেই চলছিল অসহিষ্ণুতার যুগ। উভয় সাম্রাজ্যই ছিল নতুনরূপে এক ধর্মীয় সাম্রাজ্য, যা মানব মনে স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ খর্ব করছিল।

অবশ্য সর্বপ্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোও ধর্মীয় সাম্রাজ্য ছিল যার কেন্দ্রে ছিল হয় একজন দেবতা নয়তো দেবতা-রাজা। আলেকজান্ডারের ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল আর সিজারদের নামে মন্দির ও বেদী নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তাদের সম্মানে বলি দেওয়া হত আর ধুপ জ্বালানো হতো তবে এসব প্রাচীন ধর্ম ছিল কাজ ও বাস্তবতার ধর্ম। তারা মানুষের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। যদি কোনো লোক নৈবেদ্য দিত আর দেবতার প্রতি মাথা নোয়াত, তাহলে ইচ্ছামতো তার ভাষার ও নিজের কাজকর্ম করার অধিকার ছিল। তবে নতুন যে ধরনের ধর্ম এলো পৃথিবীতে বিশেষ করে খ্রিষ্টধর্ম, মানুষের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিত। এসব বিশ্বাস মানুষের আনুগত্য নিয়েই খুশি থাকত না, তাদের বোধ ও বিশ্বাসের ওপরও চড়াও হয়েছিল। তাই তাদের বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ কী তা নিয়ে তীব্র বিবাদের আবির্ভাব ঘটে। এসব ধর্ম মতবাদের ধর্ম। পৃথিবীতে নতুন কথা রক্ষণশীলতার আগমন ঘটে, তাই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার মধ্যে ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনাকেও আবদ্ধ রাখতে হত। কাজেই কোনো ভুল মতামত লালন করা এবং অন্যের কাছে তা ব্যক্ত করা ছিল মহা অপরাধ এবং তার জন্য অনন্ত অধঃপতন অবধারিত ছিল।

তবে প্রথম আর্দাশীর, যিনি তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর কনস্টান্টিন যিনি চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করেছিলেন, তারা সাহায্যের জন্য ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, কারণ তারা বুঝেছিলেন এসব সংগঠনের মধ্য দিয়েই তারা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। ইতিমধ্যে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বাধীন আলোচনা ও ধর্মীয় ব্যাপারে নতুনত্বের অনিয়ম কঠোরভাবে দমন করা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পারস্যের আর্দাশীর প্রাচীন জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের পুনরুদ্ধার ঘটান, যেখানে ছিল পুরোহিত, মন্দির আর বেদীতে অনির্বাণ অগ্নি প্রজ্বলন, যাকে প্রস্তুত করা হয়েছিল রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে। তৃতীয়

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দীর আগেই জরথুষ্ট্ররা খ্রিষ্টধর্মীয়দের পীড়ন করা শুরু করেছিল, আর ২৭৭ অব্দে ম্যানিকীয় মতবাদের প্রবক্তা ম্যানিকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে কনস্টান্টিনোপলে খ্রিষ্টবিরোধীদের ওপর নির্মমতা চলছিল, ম্যানিকীয় চিন্তাধারা খ্রিষ্টধর্মকে কলুষিত করছিল, আর চরম নিষ্ঠুরতার সাথে তাকে দমন করা হচ্ছিল। অন্যদিকে খ্রিষ্টবাদও জরথুষ্ট্রীয় মতবাদকে প্রভাবিত করছিল, নতুন যে কোন ধারণাকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল। বিজ্ঞান, যা মানুষের মুক্ত মনের সহজ অভিব্যক্তি দাবি করে, এই রাহুগ্রস্ত যুগে তার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

খ্রিষ্টধর্মীয় কট্টোরবাদ, আর কলুষিত মানব মন বাইজেন্টীয় জীবনযাত্রার সাধারণ অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বাইজেন্টিয়াম আর পারস্যের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলে, উত্তরের বর্বররা ধ্বংসলীলা চালায় এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ায়। এমনকি এই দুই শক্তি একত্র হয়েও বর্বরদের সামাল দিতে পারছিল না। তুর্কি বা তাতাররা প্রথমে কোনো এক পক্ষের সাথে মিত্রতা করে তারপর অন্যপক্ষের সাথে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ ছিল জাস্টিনিয়ান ও প্রথম কোস্রোজ। আর সপ্তম শতাব্দীতে প্রথম দিকে হেরাক্লিয়াস দ্বিতীয় কোস্রোজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। বাইজেন্টিয়াম ও পারস্য শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, তখন পর্যন্ত কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে এক প্রবল মরুঝঞ্ঝার উদয় হচ্ছে, যা এই চিরশত্রুতার চির অবসান ঘটাবে।

হেরাক্লিয়াস যখন সিরিয়ায় শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত তখন তাঁর কাছে এক বার্তা এলো। এটা পৌঁছে দেওয়া হলো দামেস্কের দক্ষিণে বসরা চৌকিতে। এটা আরবিতে লেখা ছিল, আর দোভাষী এটা তাকে ব্যাখ্যা করে শোনাল। এটা ছিল সেই ব্যক্তির কাছ থেকে যিনি নিজেকে দাবি করেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদরূপে। তিনি সম্রাটকে আহ্বান জানালেন এক আল্লাহকে স্বীকার করতে এবং তার সেবা করতে। সম্রাট কী উত্তর দিয়েছিল, তা নথিভুক্ত নেই।

একই ধরনের এক বার্তা তেসিফনে কাবাধের কাছেও এসেছিল। তিনি বিরক্ত হয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন আর দূতকে বের করে দিয়েছিলেন। এই মোহাম্মদ ছিলেন একজন বেদুইন নেতা, যার প্রধান কেন্দ্র ছিল ছোট্ট এক শহর মদিনায়। তিনি এক নতুন ধর্ম সত্য এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের ধর্ম। তিনি বলেছিলেন, "হে প্রভু যদি তাই হয় তাহলে কাবাধ থেকে তার রাজ্য ধ্বংস করে দাও।"

৪২. চীনে তাং এবং সুই রাজবংশ

পঞ্চম, ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মঙ্গোলীয়রা ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছিল। এটিলার নেতৃত্বে মঙ্গোলীয়রা ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া ও হাঙ্গেরিতে

www.nagorikpathagar.org

পৌঁছেছিল; তাদের বংশধর তুর্কিভাষী অধিবাসীরা এখনও ওখানে বর্তমান আছে। বুলগেরীয়রা আসলে তুর্কি, যদিও তারা আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল। ইউরোপ পারস্য এবং ভারতে আর্য সভ্যতার ওপরে মঙ্গোলীয়রা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল, যেমনটা বহুকাল পূর্বে আর্যরা করেছিল ঈজিয়ান ও সেমিটিক সভ্যতার ওপর।

মধ্য এশিয়ায় তুর্কি জাতির লোকেরা শিকড় গেড়েছিল, যেমন পশ্চিম তুর্কিস্তান ও পারস্যে অনেক তুর্কি সরকারি কর্মচারী ও ভাড়াটিয়া সৈনিক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। পার্থিয়ানরা ইতিহাস থেকে মুছে গিয়েছিল, তারা পারস্যের সাধারণ জনগণের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসে আর্য যাযাবরের আর কোনো চিহ্ন রইল না, তাদের জায়গা নিয়েছিল মঙ্গোলীয়রা। চীন থেকে ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত এলাকায় তুর্কিরা প্রভু হয়ে বসল।

যে মহামারী দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড করে দেয়, সেই একই রকমের মহামারী চীনে হ্যান রাজবংশের পতন ঘটায়। তারপর এলো এক বিভক্তির ও হুন বিজয়ের যুগ, যা থেকে চীন ইউরোপীয়দের চেয়ে অধিক দ্রুততায় বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে চীন সুই রাজবংশের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল, আর তারা হেরাক্লিয়াসের সময়ে তাং বংশের কাছে জায়গা ছেড়ে দেয়, যাদের অধীনে চীনে আর একটা সমৃদ্ধির যুগের সূচনা হয়।

সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চীন ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত ও সভ্য দেশ। হ্যান বংশ এর সীমান্ত উত্তরে প্রসারিত করেছিল, সুই আর তাং বংশবিস্তার লাভ করেছিল দক্ষিণে, আর এ সময়ে চীন তার আকার লাভ করে আজ আমরা যেমনটা দেখি। মধ্য এশিয়ায় পারস্য ও ক্যাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত ছিল তার করদরাজ্যসমূহ।

নতুন যে চীন ভূখণ্ডের আবির্ভাব হলো তা হ্যান আমলের থেকে স্বতন্ত্র। নতুন ও উন্নত এক শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়, এক কাব্যিক যুগের পুনর্জন্ম ঘটে। বৌদ্ধবাদ, দর্শন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায়, শিল্পকর্মেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। প্রযুক্তিগত কুশলতা ও বিনোদনের ক্ষেত্রেও উন্নতি আসে। চায়ের প্রচলন শুরু হয়, কাগজ তৈরি হয়, কাঠের ব্লকে ছাপার প্রচলন হয়। কোটি কোটি লোক সুশৃঙ্খল, সুন্দর, নির্বিরোধ জীবনযাপনের সুযোগ পায়, যখন ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার জনগণ জীর্ণশীর্ণ কুটিরে দুঃসহ জীবনযাপন করছে। ইউরোপের মানুষ যখন ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন, তখন চীনের মানসিকতা উন্মুক্ত, সহনশীল ও অনুসন্ধিৎসু।

তাং রাজবংশের প্রথম দিকের একজন রাজা ছিলেন তাই-ৎসুঙ, ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে যিনি শাসন ক্ষমতায় আসেন, যে বছরটা ছিল নিনেভে হেরাক্লিয়াসের জয়লাভ। হেরাক্লিয়াস তার কাছে এক দূত পাঠিয়েছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল পারস্যের বিরুদ্ধে এক মিত্র লাভ করা। পারস্য থেকে এক খ্রিষ্টান মিশনারি দল এসেছিল (৬৩৫ খ্রি:)। তাই-ৎসুঙের কাছে তাদের ধর্ম মত ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল আর তাদের ধর্মগ্রন্থের একটা চৈনিক অনুবাদ তাকে দেওয়া হয়েছিল। এই ধর্মকে তিনি

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং একটা গির্জা ও মনাস্টেরী নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন।

এই সম্রাটের কাছে মোহাম্মদের কাছ থেকেও দূত এসেছিল (৬২৮ খ্রি:)। তারা একটা বাণিজ্যিক জাহাজে করে এসেছিল ক্যান্টনে। তারা আরব থেকে ভারতের উপকূল দিয়ে নৌপথে এসেছিল। হেরাক্লিয়াস ও কাবাধ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাই-ৎসুঙ। তাদের ধর্মের প্রতি তিনি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং ক্যান্টনে একটা মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। বলা হয় মসজিদটা এখনও টিকে আছে, পৃথিবীর প্রাচীনতম মসজিদগুলির মধ্যে অন্যতম।

৪৩. মুহাম্মদ (স:) এবং ইসলাম

ইতিহাসের যে কোনো শিক্ষানবিশ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত যে মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ইউরোপও এশিয়া মঙ্গোলদের কব্জায় এসে যাবে। সমগ্র ইউরোপে শৃংখলা বা ঐক্যের কোনো লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না আর বাইজেন্টীয় ও পারস্য সাম্রাজ্য পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। ভারতবর্ষও বিভক্ত ও ক্ষয়িষ্ণু। অপরপক্ষে চীন সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছিল, সম্ভবত সে সময় চীনের জনসংখ্যা সমগ্র ইউরোপের জনসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর যে তুর্কিরা মধ্য এশিয়ায় শক্তি সঞ্চয় করছিল, তারা চীনের সাথে একযোগে কাজ করতে সম্মত ছিল, কাজেই এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী নিরর্থক ছিল না। একটা সময় আসার কথা যখন একজন মঙ্গোলীয় দলপতি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দানিয়ুব থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এলাকায় আধিপত্য করবেন। আর তুর্কি বংশের হাতে চলে যাবে বাইজেন্টীয় ও পারস্য সাম্রাজ্য, মিশর ও ভারত।

ভবিষ্যদ্বক্তাটি যে ভুল ধারণা করতেন তা হলো ইউরোপের লাতিন এলাকার পুনরায় শক্তি সঞ্চয় আর আরব মরুতে নতুন শক্তির উত্থান। হয়তো আরবের মরুভূমিতে আজ যেমনটা আবহমানকাল তেমনটাই দেখাত, ছোট যাযাবর দলের আশ্রয়কেন্দ্র। গত এক হাজার বছর ধরে কোনো আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

তারপর হঠাৎ করে বেদুইনরা ঝলসে উঠল সংক্ষিপ্ত এক শতাব্দীর জন্য। তাদের শাসন ও তাদের ভাষা বিস্তার লাভ করল স্পেন থেকে চীনের সীমা পর্যন্ত। তারা পৃথিবীকে উপহার দিলো এক নতুন সংস্কৃতির। তারা ধর্ম নিয়ে এলো, যা আজ অবধি পৃথিবীকে এক নতুন শক্তি জোগাচ্ছে।

মোহাম্মদ নামের যে মানুষটি এ আরব শিখা জ্বালিয়েছিলেন, তাঁর আবির্ভাব মক্কার এক ধনী-ব্যবসায়ী বিধবার স্বামীরূপে। চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে তাঁর কোনো পরিচিতি ছিল না। ধর্মীয় আলোচনায় তাঁর গভীর

www.nagorikpathagar.org

আগ্রহ ছিল। সেই সময় মক্কা ছিল এক পৌত্তলিক শহর, বিশেষ করে কাবাঘরে এক কালো পাথরের পূজা করা হত, সমগ্র আরব জগতে যার ছিল প্রবল খ্যাতি; আর কাবা ছিল এক মহান তীর্থকেন্দ্র; তবে দেশে ইহুদির সংখ্যাও কম ছিল না– প্রকৃতপক্ষে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে ছিল ইহুদিদের প্রাধান্য– আর সিরিয়ায় ছিল খ্রিষ্টানদের গির্জা।

চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমে মোহাম্মদের মধ্যে নবীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে, ঠিক যেমনটা হয়েছিল বারশ' বছর পূর্বে হিব্রু নবীদের ক্ষেত্রে। সর্বপ্রথমে তিনি তার স্ত্রীকে বলেন সত্য একক আল্লাহর কথা, সেই সাথে পুণ্যের পুরস্কার আর পাপের শাস্তির কথা। সন্দেহ নেই যে তাঁর চিন্তাধারা ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাঁর চারপাশে ক্ষুদ্র এক শিষ্যদল গড়ে ওঠে যারা শহরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন; কারণ কাবার তীর্থযাত্রাই ছিল মক্কার সমৃদ্ধির মূল উৎস। তাঁর শিক্ষা প্রচারে তিনি আরো সাহসী এবং আরো সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠলেন, তিনি নিজেকে সর্বশেষ নবী হিসেবে ঘোষণা করলেন। তিনি আরো ঘোষণা করলেন ইব্রাহিম ও যিশু তার পূর্বসূরি ছিল। তাঁকে নির্ধারিত করা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য।

তিনি এক ছন্দময় বাণী প্রচার করলেন, যা তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে এক ফেরেশতার মাধ্যমে, আর এক অদ্ভুত স্বপ্নযাত্রায় তাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁর করণীয় সম্বন্ধে অবহিত করা হয়।

তাঁর ধর্মপ্রচার শক্তি যত বাড়তে থাকে তাঁর শহরের বিরোধিতা ততই জোরালো হতে থাকে। অবশেষে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়, তবে তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী আবুবকরকে নিয়ে তিনি বন্ধুভাবাপন্ন শহর মদিনায় গমন করেন; যেখানে তাঁর মতবাদ সাদরে গ্রহণ করা হয়। মক্কা ও মদিনার মধ্যে শত্রুতা বাড়তে থাকে, অবশেষে এক সন্ধির মধ্য দিয়ে যার পরিসমাপ্তি ঘটে। মক্কা এক সত্য আল্লাহ্ ও মোহাম্মদকে নবী হিসেবে মেনে নেয়। তবে এই নতুন বিশ্বাসের ধারকরা আগের মতোই মক্কায় তীর্থযাত্রা বহাল রাখে। যেমন তারা করত পৌত্তলিকদের আমলে। কাজেই মোহাম্মদ একক সত্য আল্লাহর ধর্মের প্রতিষ্ঠিত-করতে পারলেন, তীর্থযাত্রার ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেও। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কায় ফিরে এর কর্তৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেন, আর এক বছর পরে তিনি হেরাক্লিয়াস, তাই-ৎসুঙ ও কাবাধের কাছে দূত প্রেরণ এবং সেই সাথে পৃথিবীর সব শাসকদের কাছেই দূত প্রেরণ করেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চার বছর ধরে আরবের সকল অংশের ওপর তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জীবনের শেষ দিকে তিনি বেশ কিছু বিবাহ করেন। তিনি বিধিনিষেধ ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ কুরআন লিপিবদ্ধ করান, যাকে তিনি দাবি করেন আল্লাহর প্রেরিত অধ্যাদেশরূপে।

মোহাম্মদের ইসলাম আরব জাতিকে যথেষ্ট শক্তি জুগিয়েছিল। এর বৈশিষ্ট্য হলো আপসহীন একেশ্বরবাদ, আল্লাহর প্রভুত্বে অবিচল বিশ্বাস, আর ধর্মতাত্ত্বিক জটিলতা পরিহার। আর একটি বৈশিষ্ট্য পুরোহিততন্ত্র ও মন্দির পরিহার। ইসলাম প্রত্যাদেশ

www.nagorikpathagar.org

নির্ভর ধর্ম ও বলিপ্রথামুক্ত। কুরআনে মক্কায় হজের সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত নির্দেশনামা আছে, আর মোহাম্মদ সবরকম সতর্কতা নিয়েছিলেন যেন তার মৃত্যুর পর তার ওপর দেবত্ব আরোপ না করা হয়। ইসলামের শক্তির তৃতীয় উৎসটি হলো বর্ণ, বংশ বা পদাধিকার নির্বিশেষে আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান আর সকল বিশ্বাসী একে অপরের ভাই।

এসব বিষয়ই ইসলামকে মানব ইতিহাসে এক মহান শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা প্রদান করে। বলা হয় যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যতটা না মোহাম্মদ তার চেয়ে বেশি তাঁর বন্ধু আবুবকর। মোহাম্মদ আদি ইসলামের মন ও কল্পনা হয়ে থাকলে আবুবকর তাঁর বিবেক ও ইচ্ছাশক্তি। মোহাম্মদের মধ্যে কোনো দোদুল্যমানতা দেখা গেলে আবুবকরই তাঁকে শক্ত করে ধরে রাখতেন, মোহাম্মদের মৃত্যুর পর আবুবকর খলিফা হলেন। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে নবীর যেসব পত্র পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন রাজা বাদশার কাছে মাত্র তিন চার হাজার আরব সৈন্য নিয়ে আবুবকর তাঁর বাস্তবায়নে পর্বত-কঠিন সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হন।

৪৪. আরবদের গৌরবোজ্জ্বল দিন

এবার এলো মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিজয়ের কাহিনী। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে বাইজেন্টীয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়। ইতিপূর্বে পারস্যের যুদ্ধে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের শক্তি নিঃশেষিত হয় আর তার বিজিত সিরিয়া, দামেস্ক, পালমিরা এন্টিয়ক, জেরুজালেম এবং অন্যান্য অঞ্চল প্রায় বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনীর কাছে নুয়ে পড়ে। এরপর মুসলমানরা পূর্ব দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। পারসিকরা রুস্তমের মতো একজন যোগ্য সেনানায়ক পেয়েছিল; তাদের ছিল হস্তিবহরসহ এক বিশাল সেনাবাহিনী। কাদিসিয়ার যুদ্ধে তারা তিন দিন ধরে মুসলিম বাহিনীকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, আর অবশেষে সম্মুখযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

এরপর সমগ্র পারস্য মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে গেল। তারপর তুর্কিস্তান দখল শেষে তারা চীনের মুখোমুখি হলো। মিশর প্রায় বিনা বাধায় নব্য বিজেতাদের কাছে নতি স্বীকার করল। কুরআনের পর্যাপ্ততায় অতিবিশ্বাসী হয়ে তারা আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির বই কপি করা শিল্প সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়। তাদের বিজয় তরঙ্গ উত্তর আফ্রিকার উপকূল বেয়ে জিব্রালটার প্রণালীর কাছে পৌঁছে যায়। স্পেন বিজিত হয় ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে, আর ৭২০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তারা পিরেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আরব বাহিনী পৌঁছে যায় মধ্য ফ্রান্সে। তবে এখানে পয়টিয়ার্সের যুদ্ধে তাদের শুধু ঠেকিয়ে দেওয়া হয়; তা-ই নয়, তাদের আবার পিরেনিজ পর্বত পর্যন্ত পিছু হটিয়ে দেওয়া হয়। মিশর বিজয়ের ফলে

www.nagorikpathagar.org

৮. ২৫ বছরে মুসলিম সাম্রাজ্য

www.nagorikpathagar.org

আরবদের হাতে নৌবহর চলে আসে, আর এক সময় মনে হয় তারা কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেবে। ৬৭২ থেকে ৭১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বারবার আক্রমণ চালায়, তবে এই মহান নগরী তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

আরবদের রাজনৈতিক প্রবৃত্তি বা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল খুব সামান্যই আর এই বিশাল সাম্রাজ্য, যা স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত; যার রাজধানী দামেস্ক, তাতে শিগগিরই ভাঙন শুরু হলো। শুরু থেকে তাত্ত্বিক মতভেদে ঐক্য বিনষ্ট করতে থাকে। তবে এখন আমাদের আগ্রহ যতটা না রাজনৈতিক বিভেদ, তার চেয়ে বেশি মানব জীবনে এর প্রভাব এবং মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারণে এর ভূমিকা নিয়ে। হাজার বছর আগে গ্রিক চিন্তাধারা যত দ্রুত পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল আরব চিন্তাধারা তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ছড়িয়েছিল পৃথিবীময়।

পারস্যে এই আরব মনন যে শুধু ম্যানিকীয়, জরথুষ্ট্রীয় আর খ্রিষ্টীয় মতবাদের সংস্পর্শে এসেছিল; তা-ই নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রিক সাহিত্যের সংস্পর্শেও এসেছিল সিরীয় অনুবাদের মাধ্যমে। তারা মিশরেও গ্রিক জ্ঞানচর্চার সন্ধান পায়। সর্বত্রই, বিশেষ করে স্পেনে তারা ইহুদি ধ্যানধারণা ও আলোচনার আবিষ্কার করে। মধ্য এশিয়ায় তারা বৌদ্ধ ভাবনা ও চীনাদের জাগতিক অর্জনের সন্ধান পায়। তারা চীনাদের কাছে কাগজ তৈরির কৌশল আয়ত্ত করে, যা বই ছাপার কাজ সম্ভব করে দেয়। আর শেষ পর্যন্ত তারা ভারতীয় গণিত ও দর্শনের সাথে পরিচিত হয়।

শিগগিরই তারা কুরআননির্ভর অসহিষ্ণু, স্বয়ংসম্পূর্ণ ধারণা বাদ দিতে সক্ষম হয়। আরব বিজেতাদের পদাংক অনুসরণ করে বিদ্যাচর্চারও প্রসার ঘটতে থাকে। অষ্টম শতকের দিকে সমগ্র আরব অধিকৃত অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। নবম শতকে স্পেনের কর্দোভার শিক্ষিত পণ্ডিতেরা কায়রো, বাগদাদ, বোখারা ও সমরখন্দের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় করে। ইহুদি মননশীলতা শিগগিরই আরব মননের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, শিগগিরই এই দুটি সেমিটিক জাতি আরবি ভাষার মাধ্যমে একসাথে কাজ করতে থাকে। আরবদের রাজনৈতিক বিভক্তি ও দুর্বল হয়ে পড়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত আরবি ভাষাভাষী বিদ্বৎসমাজ টিকে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এটা যথেষ্ট ফলদায়ী প্রমাণিত হয়েছিল।

চলমান ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ যা গ্রিকরা শুরু করেছিল সেমিটিক জগতেও তা গৃহীত হয় ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। অ্যারিস্টটল ও আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে যে বীজ বপন করা হয় এবং দীর্ঘদিন, যা সুপ্ত ও অবহেলিত ছিল তা আবার অংকুরোদগম ও ফলবান হতে শুরু করে। অংকশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। বিদঘুটে রোমান সংখ্যা পদ্ধতির বদলে সরল আরবীয় পদ্ধতির প্রচলন হয়; যা আজ পৃথিবীর সর্বত্র অনুসৃত হয় আর সেই সাথে শূন্যের প্রচলন হয়, এলজেব্রা কথাটাও আরবি ভাষার, তেমনি কেমিস্ট্রি শব্দটাও। আলগোল আলদেব্রান এবং বুতিস এই নামগুলি আরবদের আকাশ জয়ের সাথে যুক্ত। মধ্যযুগীয় ফ্রান্স, ইতালি ও সমগ্র খ্রিষ্টান জগতের দর্শনচর্চা আরবদের দ্বারা উজ্জীবিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

৯. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শক্তির বিকাশ

www.nagorikpathagar.org

আরবদের পরীক্ষণধর্মী রসায়নবিদদের বলা হত আলকেমিস্ট আর তারা তাদের পরীক্ষা প্রণালী ও ফলাফল কঠোর গোপনীয়তায় সংরক্ষণ করত। প্রথম থেকেই তারা অনুধাবন করতে পেরেছিল, তাদের সম্ভাব্য আবিষ্কারসমূহ কী বিশাল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে, আর মানব জীবনে তার কী সুদূর প্রভাব পড়বে। তারা নিয়ে এসেছিল বিভিন্ন ধাতব ও প্রকৌশলগত আবিষ্কার যা ছিল অসাধারণ সম্ভাবনাময়। এসবের মধ্যে ছিল সংকরধাতু, ছাঁচ, পাতন, ভেষজ নির্যাস, আরক, চশমার কাচ, তবে তাদের দুটি প্রচেষ্টা সফল হয়নি, তার মধ্যে একটি হলো "ফিলসোফার্স স্টোন" বা পরশ পাথর যার স্পর্শে সাধারণ ধাতু মূল্যবান সোনায় পরিবর্তিত হতে পারে আর একটা "ইলিক্সার ভাইটা" বা সঞ্জীবনী সুধা যা পান করলে যৌবন ধরে রাখা যাবে, জীবনকে দীর্ঘায়িত করা যাবে। আরব আলকেমিস্টদের এসব অনিশ্চিত প্রলম্বিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং খ্রিষ্টীয় জগতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে আলকেমিস্টদের এসব তথ্যানুসন্ধানের সামাজিকীকরণ হয়। ধীরে ধীরে তারা বুঝতে পারে এসব অনুসন্ধানের আলোচনা ও ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা।

পরশপাথর ও সঞ্জীবনী সুধার অনুসন্ধান অবশেষে গবেষণামূলক বিজ্ঞানে রূপলাভ করে যা মানুষের সামনে অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

৪৫. লাতিনীয় খ্রিষ্টবাদের অগ্রগতি

এটা লক্ষ করা প্রয়োজন যে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের পৃথিবীতে আর্য নিয়ন্ত্রণ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এর আগে হাজার বছর ধরে চীনের পশ্চিম প্রান্ত থেকে শুরু করে সমগ্র সভ্য জগতে আর্য ভাষাভাষী জাতির প্রাধান্য ছিল। এর পর মঙ্গোলরা এগিয়ে এল হাঙ্গেরি পর্যন্ত, এশিয়া মাইনরে বাইজেন্টীয় আধিপত্য বাদ দিলে গোটা এশিয়ায় আর্য শাসনের অস্তিত্ব রইল না। সমগ্র আফ্রিকা এমনকি স্পেনেও তারা কর্তৃত্ব হারাল। বিশেষত হেলেনিক জগৎ সীমিত হয়ে পড়ল একমাত্র বাণিজ্যনগরী কনস্টান্টিনোপলে লাতিনীয় খ্রিষ্টীয় পুরোহিতরাই শুধু রোমান জগতের স্মৃতি ধরে রইল। হাজার বছরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সেমিটিকরা উজ্জ্বল আলোয় চলে এলো।

তবু কিন্তু নর্ডিক জাতির প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে আবদ্ধ থেকে এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক তালগোলের মধ্যে থেকেও তারা ক্রমান্বয়ে স্থির লক্ষ্যে এক নতুন সমাজব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছিল। তাদের ছিল আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি কীভাবে ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিম ইউরোপে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল না। সেই জগৎ ছিল অনেক শাসকের মধ্যে বিভক্ত। আর যার যেমন খুশি তিনি তেমন করেই দেশ চালাতেন। এ ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী

www.nagorikpathagar.org

হতে পারে না। এই বিশৃংখল অবস্থার মধ্যেও একধরনের সহযোগিতা ও সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যাকে বলা হয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ইউরোপে যার রেশ আজ পর্যন্ত টিকে আছে। এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল ক্ষমতার চারপাশে দানা বেঁধে ওঠা সমাজ। সর্বত্রই ব্যষ্টি ছিল এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আর তার সহায়তা ও সুরক্ষার বিনিময়ে স্বাধীনতার কিছুটা ছাড় দিতে হয়েছিল। তারা প্রভু আর রক্ষক হিসেবে একজন শক্তিমান লোক খুঁজত। তাকে সে সামরিক সেবা আর কর দিত, তার বিনিময়ে সে নিজস্ব সম্পত্তির অধিকারী হত। তার প্রভু আবার সন্ধান করত তার চেয়েও বড় একজন মালিক। নগরগুলিও খুঁজত একজন সামন্ত ত্রাণকর্তা, মঠ আর গির্জাও একই ধরনের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইত। সন্দেহ নেই আনুগত্য প্রদানের পূর্বেই আনুগত্য সন্ধান করা হত, ব্যবস্থাটি ছিল ওপর থেকে নিচে তেমনি নিচ থেকে ওপরে। কাজেই এটা ছিল এক ধরনের পিরামিড পদ্ধতি। অঞ্চলভেদে যার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। প্রথম দিকে এতে প্রচুর সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহ থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন ধরনের আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পিরামিডগুলি বাড়তে বাড়তে অবশেষে এক ধরনের রাজত্বের রূপ নেয়। ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটা ফ্রাংক রাজত্ব গঠন হয়; যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ক্লভিস। সেটা ছিল আজকের ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস অঞ্চলে, আর অনতিবিলম্বে ভিসিগথ, লম্বার্ড ও গথিক রাজ্য অস্তিত্বশীল হয়।

৭২০ খ্রিষ্টাব্দে যখন মুসলমানরা পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে, তখন সেখানে ক্লভিসের এক অক্ষম উত্তরাধিকারীর অধীনে চার্লস মার্টেল ছিলেন রাজধানীর মেয়র, আর তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক। ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে তার হাতে পয়টিয়ার্সের চূড়ান্ত পতন হয়। আল্পসের উত্তরে পিরেনিজ থেকে হাঙ্গেরি পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের তিনি ছিলেন প্রকৃত অধিরাজ। তিনি ফরাসি, লাতিন ও জার্মান ভাষাভাষী অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের ওপর প্রভুত্ব করতেন। তার পুত্র পেপিন, ক্লভিসের শেষ বংশধরকে উচ্ছেদ করে রাজ্য ও রাজপদবি গ্রহণ করেন। তার প্রপৌত্র শার্লামেন, যিনি ৭৬৮-তে রাজক্ষমতায় আসেন, তিনি এত বড় এক ভূখণ্ডের অধীশ্বর হয়ে বসেন যে নিজেকে লাতিন সম্রাটেরই সমকক্ষ ভাবতে শুরু করেন। তিনি উত্তর ইতালি জয় করে রোমের প্রভু হয়ে বসেন।

বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষিতে যদি আমরা ইউরোপের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে স্পষ্টভাবে লক্ষ করতে পারি এই ল্যাতিন রোমান ঐতিহ্য কতটা বিকৃত আর হতাশাব্যঞ্জক ছিল। প্রায় এক হাজার বছর ধরে প্রাধান্য টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত সংগ্রাম ইউরোপের প্রাণশক্তিকে গ্রাস করে রেখেছিল। সমস্ত সময়টা জুড়েই এক অনির্বাণ বিসংবাদ দৃষ্টিগোচর হয়। একটা বিকৃত মানসিকতা সমগ্র ইউরোপের মননশীলতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। একটি মাত্র তাড়না কাজ করছিল, আর তা হলো সফল শাসক হতে পারা, যা রূপলাভ করেছিল শার্লামেনের (চার্লস দ্য গ্রেট) মধ্য দিয়ে, যিনি হতে চেয়েছিলেন সিজার। শার্লামেনের রাজত্বের মধ্যে ছিল বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

বর্বর জার্মান রাষ্ট্র। রাইন নদীর পশ্চিমে জার্মান বাসিন্দারা ভিন্ন ভিন্ন ল্যাতিন উপভাষায় কথা বলতে শিখেছিল, পরে যা মিশ্রিত আকারে ফরাসি ভাষায় রূপলাভ করে। রাইনের পূর্বপাড়ের একই জার্মান জাতিসত্তার লোক তাদের জার্মান ভাষা ত্যাগ করেনি। এ কারণে এই দুই বর্বর বিজেতাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা বেশ কষ্টকর ছিল, আর সহজেই তাদের মধ্যে বিভক্তি এসেছিল। এ বিভক্তি আরো ত্বরান্বিত হয় শার্লামেনের মৃত্যুর পর তার ছেলেদের আমলে। শার্লামেন পরবর্তী ইউরোপের ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য হলো রাজা, রাজপুত্র, বিশপ, আর নগরসমূহের মধ্যে প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম, আর এই হট্টগোলের মধ্যে ফরাসি আর জার্মান ভাষাভাষীর পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্রাটদের এক ধরনের আনুষ্ঠানিক নির্বাচন হত, তবে তাদের মূল লক্ষ্য থাকত ক্ষয়িষ্ণু রাজধানী রোম দখল করে সেখানে রাজমুকুট ধারণ করা।

ইউরোপের রাজনৈতিক বিশৃংখলার আর একটি অনুসঙ্গ ছিল কোনো পার্থিব রাজাকে স্বীকৃতি না দিয়ে পোপ কর্তৃক নিজেকে সম্রাটের অভিধায় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ক্ষয়িষ্ণু নগরীকে ধরে রেখেছিলেন। যদিও তার সেনাবাহিনী ছিল না তবু এক বিশাল যাজক বাহিনী যারা ইউরোপে তার পক্ষে প্রচারণা চালাত মানুষের দেহের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও তাদের হাতে ছিল স্বর্গ ও নরকের চাবি, তাই মানুষের আত্মার ওপর তারা শিকড় গাড়তে পেরেছিল। কাজেই সারা মধ্যযুগব্যাপী একজন রাজার প্রথম চেষ্টা ছিল প্রথমে অন্য রাজাদের সমকক্ষতা, তারপর প্রাধান্য, অবশেষে রোমের পোপত্ব অর্জন, কখনও সাহসিকতার দ্বারা, কখনোও ধূর্ততার সাথে আবার কখনও দুর্বলভাবে; কারণ পোপ হতেন একজন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি আর তাদের রাজত্বকাল দুই বছরের বেশি টিকত না– তবু গোটা খ্রিষ্টজগতের অধিশ্বর হওয়ার স্বপ্ন এক বিরাট স্বপ্ন।

তবে রাজার বিরুদ্ধে রাজার আর পোপের বিরুদ্ধে সম্রাটের অবস্থানই ইউরোপের বিশৃংখলার একমাত্র কারণ নয়। কনস্টান্টিনোপল তখনও একজন গ্রিকভাষী এবং সমগ্র ইউরোপের দাবিদার একজন সম্রাট ছিলেন। শার্লামেন যে সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছিলেন তা ছিল সাম্রাজ্যের লাতিন প্রান্ত কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক লাতিন সাম্রাজ্য আর গ্রিক সাম্রাজ্যের মাঝে একটা দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকবে। আর এটাও স্বাভাবিক যে খ্রিষ্টীয় সমাজের মধ্যেও লাতিন আর গ্রিক বিরোধ মাথাচাড়া দেবে। রোমের পোপের দাবি ছিল খ্রিষ্টের প্রধান বার্তাবাহক সেন্ট পিটারের উত্তরসূরি হিসেবে তিনিই খ্রিষ্টজগতের প্রধান। সম্রাট ও কন্সটান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক কেউই এই দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বন্দ্বটা কেন্দ্রীভূত ছিল হলি ট্রিনিটি নিয়ে আর দীর্ঘদিন ঝগড়া বিবাদের পর অবশেষে বিস্ফোরণ ঘটে ১০৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। লাতিন চার্চ আর গ্রিক চার্চের মধ্যে মতভেদ রয়েই যায় আর এ নিয়ে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে লাতিন মধ্যযুগের খ্রিষ্টজগতকে দুর্বল করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

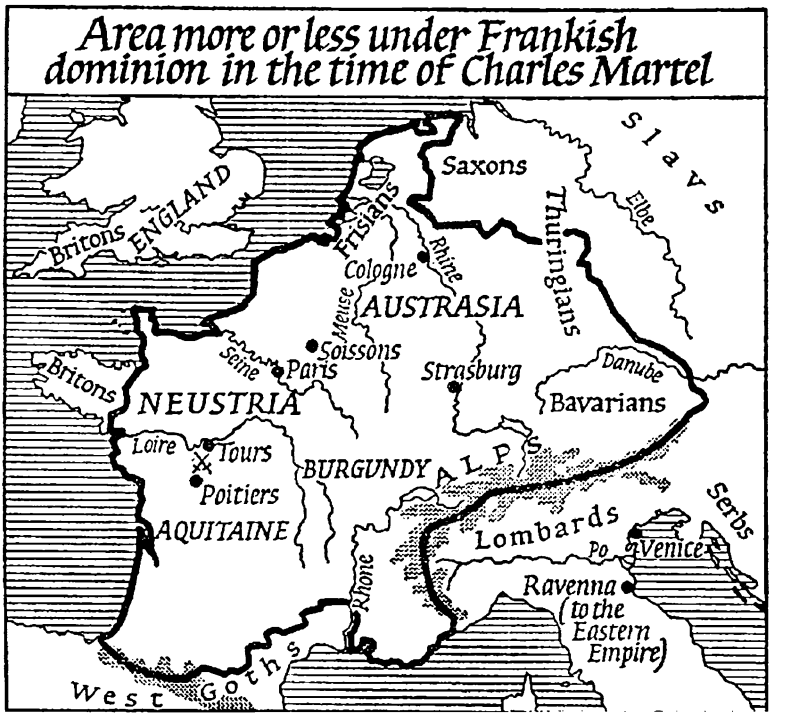

১০. চার্লস মার্টেলের আমলে ফ্র্যাংক আধিপত্য

এই বিভক্ত খ্রিষ্টজগতের ওপর তিন ধরনের শত্রুতার ঝড় বয়ে যায়। বাল্টিক ও উত্তরের নর্ডিক গোত্রের লোকেরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে অত্যন্ত ধীরগতিতে ও অনিচ্ছায়। এরা ছিল মূলত সমুদ্রে জলদস্যু; তারা স্পেন পর্যন্ত সমগ্র খ্রিষ্টজগতে লুটপাট চালায়। তারা নদীপথে রাশিয়া পর্যন্ত এগিয়েছিল আর ক্যাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরেও জলদস্যুতা চালিয়েছিল। তারা রাশিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিল, এরাই হলো আজকের রাশিয়ান। উত্তরের রাশিয়ানরা কনস্টান্টিনোপলের দোরগোড়ায় চলে এসেছিল। নবম শতাব্দীর শুরুর দিকে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী এক জার্মান রাজা এগবার্টের অধীনে আসে যিনি ছিলেন শার্লামেনের অনুগ্রহভাজন শিষ্য: নর্মানরা তার উত্তরাধিকারী আলফ্রেড দ্য গ্রেটের কাছ থেকে রাজত্বের অর্ধেকটাই ছিনিয়ে নেয় (৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ), আর অবশেষে ক্যানিউটের নেতৃত্বে সমগ্র ভূখণ্ডের মালিক হয়ে বসে (১০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) রক্ষ ও গ্যাঞ্জারের নেতৃত্বে আর এক নর্মান দল উত্তর ফ্রান্স দখল করে নেয়, যা নর্মান্ডী নাম গ্রহণ করে।

ক্যানিউট যে শুধু ইংল্যান্ড শাসন করে; তা-ই নয়, নরওয়ে ও ডেনমার্কও তার শাসনাধীনে চলে আসে, তবে তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার স্বল্পকালীন সাম্রাজ্য

www.nagorikpathagar.org

টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এসব বর্বরজাতির প্রধান রাজনৈতিক দৌর্বল্য ছিল তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ। এটা কল্পনা করা বেশ চিত্তাকর্ষক, এসব উত্তরের সাম্রাজ্য টিকে থাকলে কী ঘটত। তারা বিস্ময়কর সাহসী জাতি। তাদের গ্যালি নৌকা আইসল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডে অভিযান চালিয়েছে। তার ছিল প্রথম ইউরোপীয় যারা আমেরিকার বুকে পা রেখেছিল। পরবর্তীকালে নর্মান অভিযান, সিসিলি পুনরুদ্ধার ও রোম দখল করতে পেরেছিল। এটা কল্পনা করা দারুণ চিত্তাকর্ষক কিভাবে উত্তরের এসব সমুদ্রচারী জাতির পদচারণা রাশিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

জার্মান ও লাতিনীয় ইউরোপের পূর্বদিকে ছিল শ্লাভ ও তুর্কি জাতির মিশ্রণ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ম্যাগিয়ার্স বা হাঙ্গেরিয়রা যারা পশ্চিমে এগিয়ে এসেছিল অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে। শার্লামেন কিছু সময়ের জন্য তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তবে তার মৃত্যুর পর তারা বর্তমানে যেখানে হাঙ্গেরি, সেই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল; আর তাদের সমগোত্রীয় পূর্বপুরুষদের ধারায় প্রতি গ্রীষ্মকালে ইউরোপের স্থায়ী বাসভূমিতে আক্রমণ চালাত। ৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা জার্মানির মধ্য দিয়ে ফ্রান্স পর্যন্ত এগিয়ে যায়, আল্পস পার হয়ে ইতালিতে পৌঁছে, আর এভাবেই তারা জ্বালাও, পোড়াও, লুটপাট আর ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়।

রোমান সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নের ওপর সর্বশেষ আঘাত আসে আরব মুসলমানদের দিক থেকে, তারা মূলত সমুদ্রের আধিপত্য অর্জন করে, সমুদ্রে তাদের একমাত্র দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল নর্মানরা। এসব বহুমুখী চাপের মধ্যে থেকে শার্লামেন এবং তার অক্ষম উত্তরসূরিরা হলি রোমান সাম্রাজ্য রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা করে। শার্লামেন এবং তার পরবর্তী শাসকদের এই ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখে অন্যদিকে রোমান সাম্রাজ্যের গ্রিক পূর্বপ্রান্ত অবক্ষয়ে নড়বড় করছিল, অবশেষে পূর্বের জৌলুষ বলতে আর কিছুই রইল না, শুধু টিকে রইল ক্ষয়িষ্ণু কনস্টান্টিনোপল আর তাকে ঘিরে ছোট্ট এক ভূখণ্ড। রাজনৈতিকভাবে শার্লামেন পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে ইউরোপ রয়ে গেল সৃজনশীলতাবিহীন গতানুগতিক ভূখণ্ড হিসেবে।

ইউরোপের ইতিহাসে শার্লামেনের নাম বেশ উজ্জ্বল হলেও তার ব্যক্তিত্ব অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তিনি লিখতে পড়তে পারতেন না, তবে লেখাপড়ার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তার আহারের সময় উচ্চস্বরে বই পড়ে শোনাতে হত আর ধর্মীয় আলোচনার প্রতি গভীর আসক্তি ছিল। তার শীতকালীন আবাস এক্স-লা-শাপেল বা মেয়েন্সে একদল পণ্ডিত বেষ্টিত হয়ে থাকতেন আর তাদের আলোচনা থেকে নিজেকে লাভবান মনে করতেন। গ্রীষ্মকালে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন স্পেনের মুসলমানদের বিরুদ্ধে, ম্যাগিয়ার্সদের বিরুদ্ধে, শ্লাভদের বিরদ্ধে আর জার্মান বিধর্মী জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এটা অনিশ্চিত উত্তর ইতালি দখল করার পূর্বে তার মনে রোম সাম্রাজ্যের সিজার হওয়ার বাসনা জেগেছিল কি না অথবা পোপ তৃতীয় লিও তার মধ্যে এই চিন্তা ঢুকিয়েছিল কি না, যে পোপের ইচ্ছা ছিল ল্যাতিন চার্চকে কন্সটান্টিনোপলের প্রভাব মুক্ত করা।

www.nagorikpathagar.org

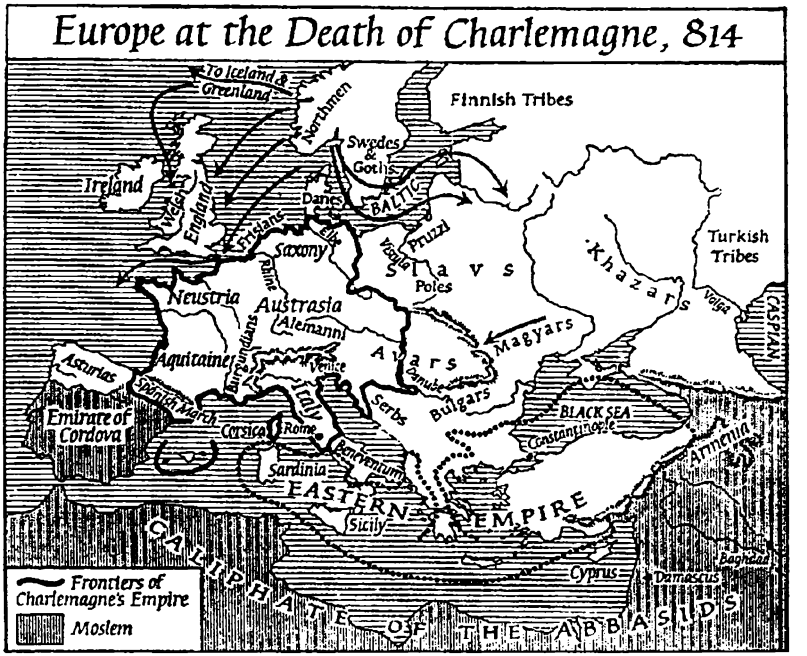

১১. শার্লামেনের মৃত্যুকালে (৮১৪ খ্রি:) ইউরোপ

রোমে পোপ আর সম্ভাব্য সম্রাটের মধ্যে এক বিরোধ সব সময় ছিল যে রোম সম্রাটের মাথার মুকুট পোপের স্বীকৃত অবদান কি না, ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে সেন্টপিটার্সে ক্রিসমাস ডেতে পোপ সম্রাটের মাথায় মুকুট তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পোপ নিজে একটা মুকুট বানিয়ে শার্লামেনের মাথায় তুলে দিয়ে তাকে সিজার এবং অগাস্টাসরূপে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। জনগণের মাঝে বিপুল প্রশংসাধ্বনি উঠেছিল। তবে কাজটা যেভাবে হয়েছিল তাতে শার্লামেন মোটেই খুশি হতে পারেননি, এটা তার মনে পরাজয়ের কাঁটা হয়ে রয়ে যায়; আর তিনি তার পুত্রকে সাবধান করে যান সে যেন পোপের হাতে মুকুট না পরেন। তিনি উপদেশ দেন যেন সে মুকুটটা মাথায় বসাবার সময় তার নিজের হাতে ধরে। এর পরও সাম্রাজ্য আর পোপের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে যুগ যুগ ধরে। তবে শার্লামেনের পুত্র লুই দ্য পায়াস তার বাবার আদেশ অমান্য করে পোপের অনুগত হয়ে থাকেন।

লুই দ্য পায়াসের মৃত্যুর পর শার্লামেনের রাজ্য ফরাসি ভাষী ফ্রাংক এবং জার্মান ভাষীদের মধ্যে ফারাক বেড়ে যায়। পরবর্তী সম্রাট ছিলেন কোনো এক হেনরি ফাউলারের পুত্র অটো দ্য স্যাক্সন, যিনি জার্মান রাজন্যদের দ্বারা জার্মানির রাজা নির্বাচিত হন ৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে। ৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে রোমের ওপর চড়াও হয়ে সম্রাট হয়ে

www.nagorikpathagar.org

বসেন। একাদশ শতকে এই জার্মান রাজবংশের পরিসমাপ্তি ঘটে, তার স্থলে অন্য জার্মান বংশ ক্ষমতায় চলে আসে। ফরাসি ভাষাভাষী বিভিন্ন সামন্ত রাজা আর অভিজাত এসব জার্মান সম্রাটদের অধীনে আসে নি আর ব্রিটেন কখনোই হলি রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে আসেনি। নর্মান্ডীর ডিউক, ফ্রান্সের রাজা আরও অনেক সামন্ত শাসক এর বাইরেই রয়ে যায়।

৯৮৭ সালে ফরাসি রাজ্য কার্লোভিনিয়ান রাজবংশের হস্তচ্যুত হয়ে হিউ হাতে চলে যায়, যার বংশধররা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। হিউ ক্যাপেটের আমলে ফ্রান্সের রাজ্য প্যারিসের চারদিকে ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১০৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড একই সাথে আক্রান্ত হয় নরওয়েজীয় রাজা হ্যারল্ড হার্দাদা আর ডিউক অব নর্মান্ডীর দ্বারা। ইংল্যান্ডের রাজা হ্যারল্ড, হার্দাদাকে পরাজিত করেন স্ট্যাফোর্ড ব্রিজের যুদ্ধে, আর নর্মান্ডীর ডিউকের হাতে নিজে পরাজিত হন হেস্টিংসের যুদ্ধে। ইংল্যান্ড বিজিত হয় নর্মানদের দ্বারা আর স্ক্যান্ডিনেভিয়া, টিউটনিক আর রাশিয়ার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, আর ফ্রান্সের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী চার শতাব্দী ধরে ইংরেজরা ফ্রান্সের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে আর ফ্রান্সের মুক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে।

৪৬. ক্রুসেড এবং পোপের প্রাধান্য

ব্যাপারটা বেশ চিত্তাকর্ষক যে শার্লামেন খলিফা হারুন-আল-রশিদের সাথে পত্রবিনিময় করেছিলেন, আরব্য উপন্যাসের সেই হারুন-আল-রশিদ। নথিভুক্ত আছে যে হারুন-আল-রশিদ বাগদাদ থেকে দূত পাঠিয়েছিলেন; ইতিমধ্যে দামেস্কের বদলে বাগদাদ মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কথিত আছে যে, দূতের মাধ্যমে তিনি পাঠিয়েছিলেন একটা চমৎকার তাঁবু, একটা জলঘড়ি আর যিশুর পবিত্র সমাধি মন্দিরের চাবি। এই সর্বশেষ উপহারটি বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্য ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছিল।

এই উপহারগুলি স্মরণ করিয়ে দেয় যে নবম শতকে ইউরোপ বিশৃংখলা, যুদ্ধ আর লুটতরাজে টালমাটাল হচ্ছিল, আর এই সুযোগে মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় এক মহান আরব সাম্রাজ্য গড়ে উঠছিল, যা ছিল ইউরোপের চেয়ে সভ্যতায় অনেক অগ্রগামী। এখানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান ছিল জীবন্ত, শিল্পকলা বিকশিত, আর মানুষের মন ছিল ভীতি ও কুসংস্কারমুক্ত। এমনকি স্পেন ও উত্তর আফ্রিকাতেও আরব আধিপত্য ক্ষীণ হয়ে আসছিল, সেখানে বলিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা চলছিল। ইউরোপের অন্ধকার যুগেও ইহুদি ও আরবরা অ্যারিস্টটল পাঠ ও আলোচনা করছিল। অবহেলিত বিজ্ঞান ও দর্শনের বীজকে তারা আগলে রেখেছিল।

www.nagorikpathagar.org

খলিফার সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্বাংশে ছিল অনেকগুলি উপজাতির বাস। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দক্ষিণের আরব ও পারস্যের আলোকিত মুসলিমদের চেয়ে বেশি কঠোরভাবে ইসলামী অনুশাসন অনুসরণ করত। দশম শতাব্দীতে তুর্কিরা অধিকতর শক্তিশালী ও তেজস্বী হয়ে উঠছিল, আর আরব শক্তি বিভক্ত আর ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছিল। খলিফার সাথে তুর্কিদের সম্পর্ক অনেকটা তেমনই হয়ে উঠছিল যেমনটা ছিল চৌদ্দশ' বছর আগে ব্যাবিলনের সাথে মেডিসের সম্পর্ক। একাদশ শতাব্দীতে সেলজুক তুর্কিরা মেসোপটেমিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে খলিফাকে নামমাত্র অধিপতি স্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে খলিফা হয়ে পড়েছিল তাদের হাতের পুতুল। তারা আর্মেনিয়া জয় করে নিয়েছিল। তারপর তারা এশিয়ায় বাইজেন্টীয় শক্তির ওপর আঘাত হেনেছিল। ১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে মেলাসগার্ডের যুদ্ধে বাইজেন্টীয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে যায়। এরপর তুর্কি বাহিনী এশিয়ায় বাইজেন্টীয় শক্তির শেষ চিহ্ন মুছে দেয়। তারা নিকিয়া দুর্গ দখল করে কনস্টান্টিনোপল নগরের ওপর আঘাত হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

বাইজেন্টীয় সম্রাট সপ্তম মাইকেল ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যেই তিনি উত্তরের নর্মান আক্রমণে বিপর্যস্ত ছিলেন। বেকায়দায় পড়ে তিনি যার তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা শুরু করলেন। লক্ষণীয় যে পশ্চিমের শাসকদের সাহায্য না চেয়ে তিনি রোমের পোপের সাহায্য চাইলেন। তিনি পোপ সপ্তম গ্রেগরী ও তার উত্তরসূরি দ্বিতীয় আর্বানের কাছে আকুল আবেদন জানান।

এ ঘটনাটি লাতিন ও গ্রিক চার্চের বিভক্তির পঁচিশ বছরের বেশি আগের কথা নয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। বাইজেন্টীয়ামের এই বিপর্যয় গ্রিক চার্চের ওপর লাতিন চার্চের আধিপত্য অর্জনের এক অপূর্ব সুযোগরূপে গ্রহণ করেন। তাছাড়া ঘটনাটি গোলোযোগপূর্ণ পশ্চিমা খ্রিষ্টজগতের আরো দুটি বিষয় নিষ্পত্তির সুযোগ হিসেবেও দেখা দেয়। একটি হলো বেসরকারি যুদ্ধ আর একটি নব্য খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত উত্তরের জার্মান ও নর্মান জাতির যুদ্ধংদেহী মনোবলকে কাজে লাগানো। একটি ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেড অর্থাৎ ক্রুশ রক্ষার যুদ্ধের ডাক দেয়া হয় তুর্কি আক্রমকদের হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষার আর এই অজুহাতে সমগ্র খ্রিষ্টজগৎকে ঐক্যবদ্ধ করা। পিটার দ্য হারমিট নামে এক ব্যক্তি ফ্রান্স ও জার্মানিতে একধরনের জনপ্রিয় প্রচারণা চালান, যা ছিল মোটামুটি গণতান্ত্রিক ধারার। তিনি মোটা কাপড় পরে খালি পায়ে গাধার পিঠে চড়ে একটা মস্তবড় ক্রুশ ঘাড়ে নিয়ে রাস্তাঘাট, হাটবাজার আর গির্জায় জনসমাবেশে অনলবর্ষী বক্তৃতা করে বেড়াতেন। তিনি তুর্কিদের দ্বারা খ্রিষ্ট তীর্থযাত্রীদের নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ জানাতেন আর পবিত্র সমাধি খ্রিষ্টদের হাতে আনার তাগিদ দিতেন। শতাব্দীব্যাপী খ্রিষ্টীয় শিক্ষা এতে নতুন উদ্দীপনা লাভ করে। এই উৎসাহের ঢেউ সাধারণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

কোনো একটি বিশেষ আবেগকে কেন্দ্র করে এমন গণমানুষের উত্থান মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা। প্রাচীন রোম অথবা ভারত অথবা চীনে এর

www.nagorikpathagar.org

সমান্তরাল কোনো ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় না। ছোট মাত্রায় হলেও ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ইহুদি জনগণের মধ্যে এমন আবেগের আভাস পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে ইসলামের মধ্যে সমবেত আবেগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা গেছে। এই নতুন উজ্জীবনের সাথে মিশনারিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। হিব্রু নবীগণ, যিশু, মানি, মোহাম্মদ মানুষের ব্যক্তি আত্মার গুরুত্ব দিয়েছেন। তারা মানুষের ব্যক্তিগত বিবেককে ঈশ্বরের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। এর আগে ধর্মের ভিত্তি ছিল অন্ধ বিশ্বাস বা ভ্রান্ত বিজ্ঞান; বিবেক নয়। আগের ধর্ম ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক, পুরোহিতনির্ভর আর রহস্যময় বলির মাধ্যমে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে। নতুন ধর্মে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়।

প্রথম ক্রুসেডের শিক্ষা হলো ইউরোপের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের জাগরণ। হয়তো এটাকে গণতন্ত্রের জন্মলাভ বলাটা অতিশয়োক্তি হয়ে যাবে, তবে এ সময়েই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ সঞ্চার ঘটছিল। অল্পদিন পরেই আমরা এর নড়াচড়া লক্ষ করব, যার সাথে জড়িত রয়েছে অনেক গোলমেলে সামাজিক ও ধর্মীয় ইসু।

শিগগিরই গণতন্ত্রের এই নড়াচড়ার অত্যন্ত করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে, সাধারণ মানুষের এক বিশৃংখল দঙ্গল পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় ফ্রান্স, রাইনল্যান্ড ও মধ্য ইউরোপ থেকে পবিত্র সমাধি উদ্ধারের জন্য, তাদের না ছিল যোগ্য নেতৃত্ব, না ছিল প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা। এটাই ছিল জনতার ক্রুসেড। দুটি বিশাল জনতার দঙ্গল ঢুকে পড়ে হাঙ্গেরিতে আর সেখানে নবদীক্ষিত ম্যাগিয়ার্সদের বিধর্মী ভুল করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। তৃতীয় অনুরূপ এক দঙ্গল রাইনল্যান্ডে ইহুদিদের ওপর হত্যা-লুটপাট চালিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় আর হাঙ্গেরিতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আরো দুটি বিশাল লটবহর স্বয়ং পিটার দ্য হারমিটের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল পৌঁছায়, আর বস্ফোরাস পার হয়ে সেলজুক তুর্কিদের হাতে শুধু পরাজিতই নয়, নিঃশেষ হয়ে যায়। এভাবে ইউরোপে প্রথম জনযুদ্ধের শুরু আর শেষ।

পরের বছর (১০৯৭) প্রকৃত যোদ্ধারা বস্ফোরাস প্রণালী পার হলো। মূলত তারা ছিল নেতৃত্ব ও মনোবলের দিক দিয়ে নর্মান। তারা নিকিয়া আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করে অগ্রসর হয় এন্টিয়কের পথে, যে পথ ধরে আলেকজান্ডার এগিয়েছিলেন চৌদ্দ শ' বছর আগে। এন্টিয়ক অবরোধে তাদের এক বছর কেটে যায়, আর তারা জেরুজালেম আক্রমণ করে ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে, এক মাস অবরোধের পরে এটা দখল করে নেওয়া হয়। ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চলে। রাস্তাঘাট রক্তে কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ১৫ জুলাই রাতে ক্রুসেডাররা পবিত্র সমাধির গির্জায় ঢুকে পড়ে, আর সেখানকার সব বাধা গুঁড়িয়ে দেয়। রক্তরঞ্জিত হয়ে তারা প্রার্থনায় বসে।

অনতিবিলম্বেই আবার লাতিন ও গ্রিক বিরোধ শুরু হয়ে যায়। ক্রুসেডাররা ছিল লাতিন চার্চের অনুগত আর জেরুজালেমের গ্রিক পুরোহিতদের অবস্থা তুর্কিদের অধীনে থাকার চেয়েও দুর্বিষহ। ক্রুসেডাররা নিজেদের দেখতে পেল

www.nagorikpathagar.org

দুই যুদ্ধরত পরাশক্তি বাইজেন্টাইন ও তুর্কিদের মাঝখানে। এশিয়া মাইনরের অনেকটাই বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যের দখলে চলে গিয়েছিল, আর লাতিন রাজারা তুর্কি ও গ্রিকদের মাঝে জেরুজালেম ও আশপাশের সামান্য কিছু ছোট ছোট রাজ্যে, যার মধ্যে সিরিয়ার এদেসা ছিল প্রধান। এসব জায়গাতেও তাদের দখল ছিল নড়বড়ে, আর ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দে এদেসা মুসলমানদের হাতে চলে যায়, যা ছিল অকার্যকর দ্বিতীয় ক্রুসেডের সূত্রপাত, যা এদেসা উদ্ধারে ব্যর্থ হলেও এন্টিয়ক কোনোমতে রক্ষা পায়।

১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শক্তি সংগঠিত হয় এক দুঃসাহসী কুর্দি যোদ্ধা সালাদিনের নেতৃত্বে, যিনি মিশরের প্রভু হয়ে বসেন। তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম পুনর্দখল করে নেন, আর এখান থেকেই শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেডের। তবে খ্রিষ্টানরা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। চতুর্থ ক্রুসেডে (১২০২-৪) লাতিন ধর্মযোদ্ধারা সরাসরি গ্রিক সাম্রাজ্য আক্রমণ করে বসে, যেখানে তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনো ভণিতাও ছিল না। ভেনিস থেকে যাত্রা শুরু করে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল দখল করে। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্যনগরী ভেনিস, আর বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ উপকূল ও দ্বীপসমূহ ভেনিসের দখলে চলে যায়। একজন লাতিন সম্রাট বল্ডুইন ফ্লেন্ডার্স কন্সটান্টিনোপলের সিংহাসনে বসে লাতিন ও গ্রিক চার্চের ঐক্য ঘোষণা করেন। লাতিন সম্রাটরা কনস্টান্টিনোপলে বসে সাম্রাজ্য শাসন করে ১২০৪ থেকে ১২৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, এরপর গ্রিকরা রোমান আধিপত্য ঝেড়ে ফেলে।

দ্বাদশ শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ছিল পোপের আধিপত্য, যেমনটা একাদশ শতাব্দী ছিল সেলজুক তুর্কিদের আধিপত্য, আর দশম শতাব্দী ছিল নর্মানদের। পোপের আধিপত্যে এক ঐক্যবদ্ধ খ্রিষ্টযুগের আবির্ভাব লক্ষ করা যায় ইতিপূর্বে বা পরবর্তীকালে যেমনটা কখনোই দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এই সময়ে এক সরল খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। রোমও কিছুটা অন্ধকার ও অমর্যাদাকর সময় অতিক্রম করেছে। দশম শতাব্দীতে পোপ একাদশ জন ও দ্বাদশ জনের জীবনযাত্রাকে নমনীয় দৃষ্টিতে দেখার মতো লেখক খুঁজে পাওয়া শক্ত; তারা ছিল জঘন্য প্রাণী; তবে লাতিন খ্রিষ্টজগতের আত্মা নির্মল ও সরলই রয়ে যায়। সাধারণভাবে খ্রিষ্টান পুরোহিত এবং সন্ন্যাসিনীরা দৃষ্টান্তমূলক বিশ্বাসী জীবনযাপন করত। এদের আস্থার সম্পদের ওপরই খ্রিষ্টীয় চার্চ নির্ভরশীল ছিল। অতীতে মহান পোপ প্রথম গ্রেগরী (৫৯০-৬০৪) ও তৃতীয় লিও (৭৯৫-৮১৬) যিনি নিজে না পরে শার্লামেনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সিজারের মুকুট পরিয়ে দেন। একাদশ শতকের শেষ দিকে এক মহান পুরোহিত রাজনীতিক হিল্ডেব্রান্ডের অভ্যুদয় ঘটে, যিনি পোপ ৭ম গ্রেগরীরূপে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন (১০৭৩-১০৮৫), প্রথম ক্রুসেডের সময়কালে ইনিই ছিলেন

www.nagorikpathagar.org

পোপ। এই দুই মহান পোপ সম্রাটের ওপর পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। বুলগেরিয়া থেকে আয়ারল্যান্ড আর নরওয়ে থেকে সিসিলি ও জেরুজালেম পর্যন্ত খ্রিষ্টজগতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সপ্তম গ্রেগরী সম্রাট চতুর্থ হেনরীকে তাঁর কাছে এসে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে আর এজন্য সম্রাটকে তিন দিন তিন রাত দুর্গের বাইরে অপেক্ষা করতে হয় চটের কাপড় পরে, খালি পায়ে। ১১৭৬ সালে ভেনিসে সম্রাট ফ্রেডারিক পোপ তৃতীয় আলেকজান্ডারের কাছে নতজানু হয়ে আনুগত্য স্বীকার করেন।

একাদশ শতাব্দীতে চার্চের এই বিশাল ক্ষমতার উৎস ছিল জনগণের ইচ্ছাশক্তি ও বিবেক। এটা তার নৈতিক মর্যাদা ধরে রাখতে পারেনি। চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে দেখা গেল যে পোপের ক্ষমতা উবে যেতে শুরু করেছে। এমন কী ঘটেছিল যাতে গির্জার শক্তির ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা হ্রাস পেয়েছিল, যাতে তারা আর গির্জার ডাকে সাড়া দিয়ে তার উদ্দেশ্য সাধনে অনীহা দেখায়?

প্রথম যে সমস্যাটি দেখা দিলো তা হলো গির্জার সম্পদ স্তূপীকরণ, একটা প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নিঃসন্তান ব্যক্তিদের সম্পদ গির্জার অধিকারে চলে যাওয়া। পাপ স্বীকারকারীদের তাদের সম্পদ গির্জায় দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হত। এতে করে কোনো কোনো ইউরোপীয় রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ সম্পদ গির্জায় সঞ্চিত হত। আহার্য বাড়ার সাথে সাথে গির্জার ক্ষুধাও বেড়ে চলছিল। ইতিমধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লোকে বলাবলি শুরু করেছিল পুরোহিতরা ভালো লোক নয়, তারা সব সময় সম্পদ আর অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকত।

রাজা ও রাজপুত্ররা এই সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাওয়াটা ভালো চোখে নেয়নি। তারা দেখল যেসব সামন্ত তাদের সৈন্য দিয়ে সহায়তা করবে, দেশের লোকজন তাঁদের সাহায্য সমর্থন না দিয়ে গির্জার পুরোহিত ও সাধুসন্ন্যাসীদের সমর্থন দিচ্ছে। আর এসব রাজ্য বিদেশীদের অধিকারে চলে যাচ্ছে। এমনকি পোপ সপ্তম গ্রেগরীর পূর্বে বিশপদেরকে নিয়োগ দেবে এমন একটা বিতর্ক শুরু হয়েছিল। যদি এই ক্ষমতা রাজার হাত থেকে পোপের হাতে চলে যায়, তাহলে রাজা যে জনতার বিবেকের ওপরেই নিয়ন্ত্রণ হারান। তা-ই নয়, তার রাজত্বের অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে যায়। কারণ পুরোহিতরা কর অবমুক্তি দাবি উত্থাপন করে। তারা তাদের কর পরিশোধ করত রোমের কাছে। তাছাড়া গির্জা সাধারণ জনগণের কাছে থেকেও এক দশমাংশ লেভি আদায় করত, যা ছিল রাজাকে দেয় করের অতিরিক্ত।

লাতিন খ্রিষ্টজগতের প্রায় সকল দেশেই রাজা আর পোপের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল আর এতে পোপের জয় হয়। তিনি রাজাকে সমাজচ্যুত করতে পারতেন, রাজার আনুগত্য থেকে প্রজাদের মুক্ত ঘোষণা করতে পারতেন এবং উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি দিতে পারতেন। তিনি দাবি করতেন তিনি যে কোনো জাতিকে ধর্মচ্যুত করতে পারেন আর সকল ধর্মীয় কাজে বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন, শুধুমাত্র শুদ্ধিকরণ, ব্যাপ্টিজম ও প্রায়শ্চিত্তের অধিকার টিকে থাকত,

www.nagorikpathagar.org

পুরোহিতরা সাধারণ ধর্মকর্ম করা, বিয়ে পড়ানো বা মৃতকে কবর দিতে পারত না। এই দুটি অস্ত্রের সাহায্যে বিদ্রোহী রাজাদের বাগে আনতে ও জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে দ্বাদশ শতাব্দীর পোপরা সক্ষম হয়েছিল। এই শক্তি প্রচণ্ড শক্তি, আর প্রচণ্ড শক্তি অসাধারণ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তবে পোপরা যখন তখন আর যেখানে সেখানে প্রয়োগ করায় এর ধার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। ত্রিশ বছরের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পর্যায়ক্রমে স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ধর্মচ্যুতির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। আর পোপরাও এসব অবাধ্য রাজাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করার লোভ সামলাতে পারেনি, যত দিন পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধের যোশ নিস্প্রভ হয়ে না যায়।

যদি রোমান চার্চ শুধু রাজাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ থাকত আর সাধারণ জনগণের হৃদয়ের কাছাকাছি আসতে পারত, তাহলে হয়তো সমগ্র খ্রিষ্টজগতের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারত। তবে পোপের পর্বতপ্রমাণ দাবি পুরোহিত সমাজকেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। একাদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত রোমান পুরোহিতরা বিবাহ করতে পারত; জনগণের সাথে তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে পারত; প্রকৃতপক্ষে তারা জনগণেরই একটা অংশ ছিল। সপ্তম গ্রেগরী তাদের কৌমার্য অবলম্বনে বাধ্য করেন, জনগণের থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নেন, এভাবেই তিনি গির্জা আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করেন। চার্চের নিজস্ব আদালত ছিল। এবং শুধু পুরোহিতই নয়, সন্ন্যাসী, ছাত্র, ক্রুসেডার, বিধবা, এতিম ও অসহায়দের বিচারও সংরক্ষিত রাখা হয় এসব ধর্মীয় আদালতে। তাছাড়াও ইচ্ছাপত্র, বিবাহ, শপথ, এবং সকল রকম জাদুটোনা, ধর্মদ্রোহ ও ঈশ্বর নিন্দার বিষয়ও এসব আদালতের আওতায় নিয়ে আসা হয়। সাধারণ কোনো মানুষের পুরোহিতের সাথে বিবাদ ঘটলে সে মামলা ধর্মীয় আদালতের আওতায় চলে যেত। এটা অস্বাভাবিক নয় যে পুরোহিত সমাজের মধ্যে ঈর্ষা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

রোম কখনও এটা বুঝতে চায়নি যে তাদের ক্ষমতার উৎস ছিল সাধারণ মানুষের বিবেক। গির্জা যখন নৈতিকতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত তখন সাধারণ মানুষকে তারা সঙ্গে পেত, তবে ধর্মীয় বিধিবিধানের ব্যাপারে নয়। দক্ষিণ ফ্রান্সে ওয়াল্ডো যখন যিশুর সরল বিশ্বাস ও সরল জীবনযাপনের তত্ত্ব প্রচার করেন, তখন তৃতীয় ইন্নোসেন্ট তার বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দেন, যা ওয়াল্ডোর অনুসারীদের বিরুদ্ধে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ধর্ষণ ও চরম নিষ্ঠুরতায় রূপ নেয়। আবার যখন আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস (১১৮১-১২২৬) খ্রিষ্টের জীবনের দারিদ্র্য ও সেবার আদর্শ প্রচার করেন, তার অনুসারী ফ্রান্সিস্কানদের অত্যাচার, নিপীড়ন, বেত্রাঘাত, কারাবাসের সম্মুখীন হতে হয়। ১৩১৮ খ্রিষ্টাব্দে এদের চারজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয় মার্সেইতে। অপরপক্ষে কঠোর গোঁড়া সেন্ট ডমিনিককে (১১৭০-১২২১) সমর্থন দেন তৃতীয় ইন্নোসেন্ট, যে ডমিনিক ধর্মদ্রোহ ও স্বাধীন চিন্তা দমনের জন্য "ইনকুইজিশন" নামে এক কঠোর আইন প্রচলন করেন। এভাবেই অতিরিক্ত দাবি,

www.nagorikpathagar.org

অন্যায় সুযোগ, অযৌক্তিক, অসহিষ্ণুতার দ্বারা মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে। কাজেই গির্জার অধঃপতন বাইরের কোনো শত্রুর দ্বারা ঘটেনি বরং অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই এর কারণ।

৪৭. বিদ্রোহী রাজন্য এবং বিশাল বিভক্তি

সমগ্র খ্রিষ্টজগতের প্রভুত্ব অর্জনের পথে রোমের যে প্রধান দুর্বলতা তা হলো কীভাবে পোপ নির্বাচিত হবেন, তা নিয়ে। খ্রিষ্টজগতের একছত্র আধিপত্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ, স্থায়ী এবং ধারাবাহিক দিকনির্দেশনা। চার্চের সামনে যখন মহান সুযোগ এসেছিল, তখন উচিত ছিল যোগ্য লোককে পোপের পদে বসানোর সুস্পষ্ট নীতিমালা, যেমন– উত্তরাধিকার ও যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয়। দুর্ভাগ্যবশত এর কোনোটাই ছিল না। এমনকি পোপের নির্বাচক কারা হবে সে নিয়মও ছিল না, এ ব্যাপারে বাইজেন্টীয় নাকি হলি রোমান সাম্রাজ্যের মতামত গুরুত্ব পাবে, তাও নির্ণীত ছিল না।

মহান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিল্ডেব্রান্ড (পোপ সপ্তম গ্রেগরী, ১০৭৩-৮৫) নির্বাচন প্রণালী কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক করতে পেরেছিলেন। তিনি রোমান কার্ডিনালদের মধ্যে নির্বাচন সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং সম্রাটের স্বীকৃতির বিষয়টি শিথিল করেছিলেন। তবে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট না থাকায় প্রায়ই কার্ডিনালদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হতো এবং মাঝে মধ্যে কিছুদিনের জন্য পোপের পদ শূন্য থেকে যেত। কোনো কোনো সময় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে।

এই সঠিক সিদ্ধান্তহীনতার ফলাফল পোপের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। মোটামুটি প্রথম থেকেই বিতর্কিত নির্বাচন চলতে থাকে, সব সময় দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে পোপের দাবিদার দেখা যায়। আর এই বিবাদ নিরসনের জন্য চার্চকে প্রায়ই রাজা বা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির দ্বারস্থ হতে হতো। আর অধিকাংশ মহান পোপদের জীবনাবসান হয় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে। তার মৃত্যুতে চার্চ পরিণত হতো মস্তকহীন দেহে অথবা পদলোভী কোনো বৃদ্ধ পোপের পদে সমাসীন হয়ে পোপ পদের বদনাম নিয়ে আসত। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই দুর্বলতার সুযোগে কোনো জার্মান বা ফরাসি রাজা হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসত, যাদের চেষ্টা থাকত তাদের অনুগত কোনো ব্যক্তিকে পোপের আসনে বসানো। আর ইউরোপীয় ব্যাপারে পোপ যতই ক্ষমতাশালী আর গুরুত্বপূর্ণ হতো, হস্তক্ষেপও ততই জরুরি হয়ে দেখা দিত। এ পরিস্থিতিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে পোপরা দুর্বল ও নিষ্ফল হয়ে পড়ত। তবে আশ্চর্যের বিষয় এর মাঝেও কেউ কেউ বেশ সক্ষম ও সাহসী হয়ে উঠত।

www.nagorikpathagar.org

এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিমান ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট (১১৯৮-১২১৬)। তিনি যথেষ্ট ভাগ্যবান ছিলেন যে ৩৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি পোপের পদে আসীন হন। তবে তার ও তার উত্তরসূরিদের দুর্ভাগ্য যে সে সময়ের ইতিহাসে আরো এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে; সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, যাকে বলা হতো *স্টুপরমান্ডি* বা বিশ্বের বিস্ময়। রোমের বিরুদ্ধে সম্রাটের সংগ্রাম ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল। শেষ পর্যন্ত রোম তাকে পরাস্ত করে তার বংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়; তবে এতে করে রোমান চার্চ ও পোপের মর্যাদা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত করে যে চার্চের মধ্যে পচনক্রিয়া শুরু হয়।

ফ্রেডারিক ছিলেন সম্রাট চতুর্থ হেনরির পুত্র, আর তার মা ছিলেন সিসিলির নর্মান রাজা প্রথম রজারের কন্যা। মাত্র ৪ বছর বয়সে ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন। পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট তার অভিভাবক হন। সাম্প্রতিককালে সিসিলি নর্মানদের দ্বারা বিজিত হয়েছে, তার দরবারে ছিল অনেক উচ্চশিক্ষিত আরব। আর তাদের মধ্যে অনেকেই বালক রাজার শিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। সন্দেহ নেই শিক্ষণীয় বিষয় পরিষ্কার করতে তাদের অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়। তিনি মুসলমানের দৃষ্টিতে খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিতে ইসলাম দেখতে শিখেছিলেন। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীল যুগে এ ধরনের শিক্ষা ছিল অনভিপ্রেত, যার ফলে মনে হতো সব ধর্মই একধরনের ভণ্ডামি। তিনি স্পষ্টভাবেই তার ধর্মে আস্থাহীনতার কথা প্রকাশ করতেন।

বয়ঃবৃদ্ধির সাথে এই যুবক তার অভিভাবকদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তৃতীয় ইন্নোসেন্ট তার শিষ্যের কাছে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছিলেন। ফ্রেডারিকের যখন সিংহাসনে আরোহণের সময় এলো তখন পোপ তার সামনে অনেকগুলি শর্ত নিয়ে হাজির। ফ্রেডারিককে কঠোর হাতে জার্মানির ধর্মদ্রোহিতা দমন করতে হবে। তাছাড়া সিসিলি ও ইতালির রাজমুকুট পরিত্যাগ করতে হবে, কারণ তা না হলে পোপের জন্য তাকে সামলানো কঠিন হবে। সকল জার্মান পুরোহিত সম্প্রদায়কে করমুক্ত রাখতে হবে। আপাতত মেনে নিলেও তার কথা রাখার কোনো ইচ্ছা ছিল না ফ্রেডারিকের। পোপ ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের রাজাকে উসকে দিয়েছিলেন তার প্রজাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য, ভ্যান্ডেন্সদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড ঘোষণার জন্য। জার্মানদের বিরুদ্ধে অনুরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করতে, তবে ফ্রেডারিক ততটা কট্টোর ধর্মধ্বজী না হওয়ায় এর বিরুদ্ধে ছিলেন। আর ইন্নোসেন্ট জেরুজালেম উদ্ধারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার তাগিদ দিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাতে সম্মতি দিলেও যথারীতি গড়িমসি করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় ফ্রেডারিক সিংহাসনে আরোহণ করে সিসিলিতেই থেকে গেলেন, কারণ জার্মানির চেয়ে সিসিলিতে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন, আর তৃতীয় ইন্নোসেন্টকে দেয়া কোনো প্রতিশ্রুতিই পালন করেননি, যেজন্য ১২১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হতাশায় মৃত্যুবরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইন্নোসেন্টের উত্তরসূরি তৃতীয় অনোরিয়াসও ফ্রেডারিকের কাছ থেকে বেশি কিছু আদায় করতে পারেননি, আর ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে নবম গ্রেগরী পোপের আসনে বসে এই যুবকের সাথে সব হিসাব চুকাবার সংকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি তাকে এক্সকম্যুনিকেট অর্থাৎ গির্জার আশ্রয়চ্যুত করলেন। ধর্মের সকল সুযোগ বঞ্চিত হলেন ফ্রেডারিক। সিসিলির আধা-আরবীয় রাজদরবারে এর প্রভাব খুব সামান্যই ছিল। সম্রাটের পাপকর্ম, তার ধর্মদ্রোহ আর সাধারণ অসদাচরণ লিপিবদ্ধ করে পোপ তাকে এক চিঠি পাঠালেন। ফ্রেডারিক তার জবাব দিয়ে যে চিঠি পাঠালেন তাকে বলা যায় দানবীয় শক্তি প্রদর্শনের এক অনন্য দলিল। এই চিঠির অনুলিপি ইউরোপের সব রাজার কাছে পাঠানো হয়, যাতে পোপ আর রাজন্যদের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সমগ্র ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার পোপের দুরভিসন্ধির কথা এতে স্পষ্ট হয়। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সকল ইউরোপীয় রাজাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন তিনি। তিনি পোপের অঢেল সম্পদ সংগ্রহের দিকেও ইঙ্গিত করেন।

এই সাংঘাতিক মিসাইল ছোড়ার পর ফ্রেডারিক ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা ছিল ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২২৮)। ছিল হাস্যকর ক্রুসেড। ফ্রেডারিক মিশরে গিয়ে সুলতানের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই দুই সংশয়বাদী ভদ্রলোক খোশ মেজাজে মতবিনিময় করলেন, নিজেদের সুবিধাজনক এক বাণিজ্যিক চুক্তি করলেন আর ফ্রেডারিকের হাতে জেরুজালেম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ক্রুসেড। এখানে কোনো রক্ত ঝরানো বিজেতা ছিল না, আনন্দাশ্রুও ছিল না। যেহেতু এই বিস্ময়কর ক্রুসেডার ছিলেন একজন ধর্মচ্যুত ব্যক্তি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ উপায়েই তাকে জেরুজালেমের রাজমুকুট পরানো হলো, তিনি বেদী থেকে নিজের হাতে মুকুট তুলে নিলেন– যেহেতু সব পুরোহিত তাকে বয়কট করেছিল। আর তিনি ইতালিতে ফিরে এসে পোপের সব সৈন্যকে তাড়িয়ে দিলেন, যারা তার রাজ্য দখল করে বসেছিল, আর তার বিরুদ্ধে ধর্মচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে পোপকে বাধ্য করলেন।

১২৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুনরুজ্জীবন করে দ্বিতীয়বারের মতো তাকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল জনমনে পোপের হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধার। গ্রেগরীর মৃত্যুর পর চতুর্থ ইন্নোসেন্টের আমলে আবার বিবাদ শুরু হয়। আবার এক সাংঘাতিক চিঠি পাঠালেন ফ্রেডারিক পোপের বিরুদ্ধে। তিনি যাজক শ্রেণীর ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপ আর দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ আহরণের কথা ফাঁস করে দেন। তিনি তার সমমনা রাজাদের আহ্বান জানান চার্চের অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার, এতে চার্চেরই কল্যাণ হবে। এই পরামর্শটি পরবর্তী ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ কখনও বিস্মৃত হন নি।

তার শেষ জীবনের কথা বলতে চাই না। সার্বিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিপরীতে তার ব্যক্তিগত জীবন অনুজ্জ্বল। সিসিলিতে তার দরবারি জীবনের কিছু উল্লেখ করা যেতে

www.nagorikpathagar.org

পারে। তার জীবন যাপন ছিল বিলাসবহুল, তিনি সুন্দরের ভক্ত ছিলেন। কিছুটা স্বেচ্ছাচারীও ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতির। তার দরবারে ইহুদি, মুসলমান ও খ্রিষ্টান দার্শনিকদের সমাবেশ ঘটেছিল। আর তিনি ইতালীয় মনোজগতে আরবীয় বারিসিঞ্চন করেছিলেন। তার উৎসাহেই খ্রিষ্টীয় ছাত্রদের মধ্যে আরবীয় সংখ্যাপদ্ধতি ও অ্যালজেব্রা প্রচলিত হয়। তার দরবারে ছিল মাইকেল স্কটের মতো দার্শনিক যিনি এরিস্টটলের আংশিক অনুবাদ করেছিলেন, যার ওপর টিকাটিপ্পনি করেছিলেন কর্ডোবার আরব দার্শনিক অ্যাভেরোজ (আবুরুশদ)। ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রেডারিক ন্যাপলস্ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন আর সালের্নো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাখার প্রভূত সমৃদ্ধি সাধন করেন। তিনি একটা প্রাণী সংরক্ষণ উদ্যানেরও প্রতিষ্ঠা করেন। তার ছিল প্রবল পক্ষীপ্রেম ও তিনি ইতালীয় কবিতাও লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তার দরবারেই ইতালীয় কবিতার জন্ম, একজন বিখ্যাত লেখক তাকে অভিহিত করে প্রথম আধুনিক মানুষ হিসেবে।

প্রোপতন্ত্রের অবক্ষয়ের চিত্র আরো স্পষ্ট হয় যখন পাই কিভাবে পোপ ফ্রান্সের উদীয়মান শক্তির সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের জীবৎকালেই জার্মানি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, আর ফ্রান্সের রাজা হয়ে বসেন পোপের রক্ষক, সমর্থক আর প্রতিদ্বন্দ্বী-যা ইতিপূর্বে ছিল হোহেনস্টফেন সম্রাটদের আয়ত্তে। পরপর অনেক কজন পোপ ফরাসি সম্রাটকে সমর্থন দানের নীতি গ্রহণ করেন। সিসিলি ও ন্যাপ্‌লসে ফ্রান্সের অধিকার দৃঢ় হয়, এতে রোমের সমর্থন ও অনুমোদন ছিল আর ফরাসি রাজার সম্ভাবনা দেখতে পায় শার্লামেনের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করার। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মৃত্যুর সাথে সাথে হোহেনস্টফেন বংশের শাসন শেষ হয় আর তৎস্থলে হ্যাবসবার্গ বংশের রুডল্‌ফ্ সম্রাট নির্বাচিত হন (১২৭৩), আর তখন থেকে রোমের সমর্থন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে দোলাচলে নিপতিত হয়। পূর্ব দিকে গ্রিকরা লাতিনদের কাছ থেকে কনস্টান্টিনোপলের অধিকার ছিনিয়ে নেয়, আর গ্রিক বংশের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল প্যালিওলোগাস, অষ্টম মাইকেল, কিছুকাল রোমের সাথে মিটমাটের চেষ্টা করার পর অবশেষে রোমের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে ফেলে, এর সাথে সাথেই এশিয়ায় রোমান পোপের আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন নিঃশেষ হয়ে যায়।

১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বনিফেস পোপ নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন ইতালিয়ান ও ফ্রান্সের প্রতি বিরূপ। তিনি ছিলেন রোমের আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। প্রথম দিকে তিনি কঠোরতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন। ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এক জুবিলি উৎসব পালন করেন, আর সেখানে বিপুলসংখ্যক তীর্থযাত্রী সমবেত হয়। এত বিশাল অংকের দর্শনী প্রদান করা হয় যে তা জড়ো করার জন্য আঁচড়া নিয়ে দুজন সাহায্যকারী নিয়োগ করা হয়। এই বিপুল সম্পদ জমা রাখা হয় সেন্ট পিটারের সমাধিগৃহে। তবে উৎসবটি ছিল বিভ্রান্তকারী। পোপ বনিফেস ১৩০২ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি সম্রাটের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। আর ১৩০৩ সালে যখন

www.nagorikpathagar.org

রাজার বিরুদ্ধে ধর্মচ্যুতি আনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই নিজ প্রাসাদ অ্যানানীতে গুইলোম দ্য নগারেটের দ্বারা বন্দি হন। রাজার আজ্ঞাবাহী এই সৈনিক পোপের প্রাসাদে ঢুকে সোজা পোপের শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ে– তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন, হাতে একটা ক্রুশ, আর ভীতসন্ত্রস্ত পোপের ওপর হুমকি ও অবজ্ঞাসূচক বাক্যবর্ষণ করে। একদিন পরে জনগণ এসে পোপকে মুক্ত করে দেয়; তবে সেখানেও অর্সিনী পরিবারের হাতে বন্দি হন আর ভগ্ন হৃদয় মোহমুক্ত বৃদ্ধ লোকটি বন্দি দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অ্যানানীর জনগণ এই নিষ্ঠুরতা পছন্দ করেনি, আর নগারেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বনিফেসকে মুক্ত করে দেয়, তবে অ্যানানী ছিল পোপের নিজের শহর। এখানে লক্ষণীয় বিষয় ফরাসি রাজা তার জনগণের পূর্ণ সমর্থন নিয়েই খ্রিষ্টজগতের প্রধান ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন; তিনি ফ্রান্সের তিনটি সংস্থার (লর্ডস্, চার্চ ও কমন্স) কাউন্সিল আহ্বান করেছিলেন, আর চরম পন্থা অবলম্বনের পূর্বে তাদের অনুমোদন নিয়েছিলেন। এই সার্বভৌম ধর্মাধিকরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্স, জার্মানি বা ইংল্যান্ড কোথাও কোনো বিরোধিতার আভাস ছিল না, খ্রিষ্টীয় ধর্মজগতের প্রভাব ক্ষীয়মান হয়ে পড়েছিল সাধারণ জনগণের কাছে তার আবেদন কমার সাথে সাথে।

সমগ্র চতুর্দশ শতাব্দীব্যাপী পোপতন্ত্র তার ক্ষমতা উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই করেনি, পরবর্তী পোপ নির্বাচিত হয়েছিলেন পঞ্চম ক্লেমেন্ট, যিনি ছিলেন এক ফরাসি, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের পছন্দের লোক। তিনি কখনও রোমে আসেননি। ফ্রান্সের এভিননে তিনি তার দরবার বসিয়েছিলেন, যেটা ফ্রান্সের সীমার মধ্যে হলেও পোপের অধিভুক্ত ছিল, আর সেখানেই তার উত্তরসূরিরা অবস্থান করে ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এরপর পোপ একাদশ গ্রেগরী এসে ফ্রান্স থেকে রোমের ভ্যাটিকান প্রাসাদে তার অবস্থান দৃঢ় করেন। তবে গ্রেগরী সমগ্র খ্রিষ্ট জগতের সহানুভূতি অর্জন করতে পারেননি। কার্ডিনালদের অনেকেই ছিলেন ফরাসি বংশোদ্ভূত আর তাদের মানসিক শিকড় ফ্রান্সের এভিননেই প্রোথিত ছিল। ১৩৭৮ সালে একাদশ গ্রেগরীর মৃত্যুর পরে একজন ইতালীয় ষষ্ঠ আর্বান পোপের স্থলাভিসিক্ত হলেন, আর ভিন্ন মতাবলম্বী কার্ডিনালরা এই নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করল এবং আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী পোপ সপ্তম ক্লোমেন্টকে পোপ ঘোষণা করল। একে বলা হয় মহাবিভক্তি। দুজন পোপই রোমে অবস্থান নেয়, ফ্রান্সবিরোধী সকল শক্তি ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড আর উত্তর ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এই প্রতীপ পোপের সমর্থক ছিল। এক পোপ অপর পোপের অনুসারীদের ধর্মচ্যুত ঘোষণা করে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ইউরোপের প্রত্যেক মানুষ ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে।

এতে খ্রিষ্টজগতে ফ্রান্সিস্কান আর ডমিনিকান এই দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, আর দুই পক্ষই নিজেদের মতো করে খ্রিষ্টজগতেকে ভাঙতে আর গড়তে চাইল। এর দেড় শতাব্দী পরে অভ্যুত্থান হলো ওয়াইক্লিফের (১৩২০-৮৪) তিনি ছিলেন

www.nagorikpathagar.org

অক্সফোর্ডের এক বিজ্ঞ ডক্টর। জীবনের শেষদিকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় চার্চের দুর্নীতি ও খামখেয়ালিপনার সমালোচনা করতে লাগলেন। তিনি কিছু দরিদ্র পুরোহিত, যাদেরকে বলা হয় ওয়াইক্লিফীয়, তাদের সংগঠিত করলেন, তার মতবাদ সমগ্র ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে দিতে, আর যাতে জনগণ গির্জার রীতিনীতির সাথে তার মতবাদের পার্থক্য বুঝতে পারে, সে জন্য ইংরেজিতে বাইবেলের অনুবাদ করলেন। তিনি সেন্ট ফ্রান্সিস বা সেন্ট ডমিনিকের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ছিলেন। উচ্চমহলে তার যেমন সমর্থন ছিল জনগণের মাঝেও তার ভক্তের অভাব ছিল না। যদিও রোম তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বন্দি করার আদেশ দেয়, তবুও স্বাধীন ব্যক্তিরূপেই তার জীবনাবসান হয়। তবে ক্যাথলিক চার্চের দুরভিসন্ধি ও প্রাচীনপন্থী মনোভাব তার অস্থি করবে শান্তিতে শয়ন করতে দেয়নি। ১৪১৫ সালে কনস্ট্যান্সের ঘোষিত এক ডিক্রির বলে কবর খুঁড়ে তার অস্থি বের করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অপবিত্র অধার্মিক কাজটি শুধুমাত্র কিছু উগ্র ধর্মধ্বজীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তা-ই নয়, এটা ছিল চার্চের আদেশ।

৪৮. মঙ্গোল বিজয়

তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে যখন পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অদ্ভুত ও অকার্যকর প্রচেষ্টা চলছে, তখন এশিয়ার বৃহত্তর মঞ্চে এক শক্তিশালী নাটক মঞ্চায়নের প্রস্তুতি চলছে। চীনের উত্তরের এক তাতার জাতি হঠাৎ করে শক্তিমান হয়ে উঠে বিশ্ব ঘটনাবলিতে এক প্রবল ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে, আর এমন সব বিজয় অর্জন করতে থাকে, ইতিহাসে যার কোনো জুড়ি নেই। এরাই ছিল মঙ্গোল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তারা ছিল শুধুমাত্র এক অশ্বারোহী যাযাবর। তাদের জীবনযাত্রা ছিল তাদের পূর্বসূরি হুনদের মতোই। তারা মূলত মাংস আর ঘোড়ার দুধের ওপরই নির্ভর করত আর তাঁবু খাটিয়ে বাস করত। তারা চীনের কর্তৃত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অন্যান্য তুর্কি জনগোষ্ঠীর সাথে সামরিক জোট গঠন করেছিল। তাদের প্রধান ক্যাম্প ছিল সাইবেরিয়ার ওনন নদীর তীরে।

এ সময় চীন ছিল বহুধাবিভক্ত। দশম শতাব্দীতেই তাং বংশের অবক্ষয় শুরু হয়, তারপর নানামুখী সংঘাতের পর তিনটি প্রধান সাম্রাজ্য টিকে থাকে, উত্তরে কিনদের রাজধানী ছিল পিকিং আর দক্ষিণে সাঙদের রাজধানী ছিল নানকিং। আর মাঝখানে ছিল হ্সিয়া। মঙ্গোল জাতির দলনেতা চেঙ্গিস খান ১২১৪ সালে পিকিং আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। তারপর তিনি পশ্চিম দিকে তার অভিযান পরিচালনা করে এক এক করে তুর্কিস্তান, পারস্য, আর্মেনিয়া ও লাহোর পর্যন্ত ভারতবর্ষ দখল করে ফেলেন, আর দক্ষিণে তার অধিকারের বিস্তৃতি ছিল দক্ষিণ রাশিয়া-হাঙ্গেরি ও

www.nagorikpathagar.org

সাইলেসিয়া পর্যন্ত। তার মৃত্যুর সময় তার সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নীপার নদী পর্যন্ত।

তার উত্তরসূরি অগদাই খান মঙ্গোলিয়ার কারাকোরামে স্থায়ীভাবে তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, আর তার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তার সেনাবাহিনী অতি উচ্চস্তরে সুসংগঠিত ছিল; আর তাদের আয়ত্তে ছিল গান-পাউডার, যা তারা মেঠো কামানে ব্যবহার করেছিল। তিনি কিন সাম্রাজ্য জয় শেষ করেছিলেন, আর তার বিশাল বাহিনী শিগগিরই এশিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল (১২৩৫), অদ্ভুত এক বিজয় অভিযাত্রা। কিয়েভ ধ্বংস করা হয় ১২৪০ অব্দে, আর সমগ্র রাশিয়া মঙ্গোলদের করদরাজ্যে পরিণত হয়। এরপর আক্রান্ত হয় পোল্যান্ড, আর ১২৪১ অব্দে সাইলেসিয়ার লিয়েগনিৎসের যুদ্ধে সম্মিলিত পোল ও জার্মান বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এই স্রোতের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিরোধই গড়তে পেরেছিলেন।

গীবনের *ডিক্লাইন এন্ড ফল অফ রোমান এম্পায়ার* গ্রন্থের এক টীকা টিপ্পনিতে বেরী মন্তব্য করেছিলেন, "শুধুমাত্র অতি সম্প্রতি ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরা বুঝতে পারেন যে ১২৪১ অব্দে যে মঙ্গোলবাহিনী পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি দখল করেছিল, তাদের বিজয়ের পেছনে সংখ্যাধিক্যই একমাত্র কারণ ছিল না, মূল কারণ ছিল উন্নত রণকৌশল, তবে এত দিন লোকে জানত যে তাতাররা কেবলমাত্র বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণেই এমন সাফল্য লাভ করে।

এটা লক্ষ করা খুবই বিস্ময়কর, কত সুশৃঙ্খল পরিকল্পনায় অগ্রসর হয়ে ভিস্টুলা থেকে ট্রানসিলভানিয়া পর্যন্ত তারা করায়ত্ত করে ফেলে, যে কোনো ইউরোপীয় বাহিনীর কাছে যেটা ছিল কল্পনাতীত। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক পর্যন্ত ইউরোপের মহান সেনানায়করা সুবুতাইয়ের তুলনায় ছিল নেহাৎ অর্বাচীন। এটা লক্ষণীয় যে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি অভিযানের পূর্বে মঙ্গোলরা সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল; তাদের ছিল সুসংগঠিত গুপ্তচর বাহিনী; অপরপক্ষে হাঙ্গেরিয় এবং সমগ্র খ্রিষ্টীয় শক্তি তাদের শত্রুদের সম্বন্ধে কিছুই অবগত হতে পারেনি।

যদিও মঙ্গোলীয়রা লিগনিৎসের যুদ্ধে জয়ী হয়, তবু তারা আর পশ্চিম দিকে অগ্রগতি অব্যাহত রাখেনি। কৌশলগতভাবে তারা অরণ্য আর পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলে সুবিধা করতে পারছিল না। কাজেই তারা দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে হাঙ্গেরিতে স্থায়ী হয়ে বসার সিদ্ধান্ত নিলো, আর এজন্য সেখানকার ম্যাজিয়ারদের ধ্বংস করতে বা একীভূত করতে চেয়েছিল। হাঙ্গেরির সমভূমি থেকে তারা পশ্চিম ও দক্ষিণে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নেয় ইতিপূর্বে যেমনটা করেছিল হাঙ্গেরিয়রা নবম শতাব্দীতে আর আভাররা করেছিল সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী আর হুনরা করেছিল পঞ্চম শতাব্দীতে। তবে ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দে হঠাৎ করে অগদাইয়ের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে গোলযোগ বেধে ছিল, আর সেই ডামাডোলে বিপর্যস্ত মঙ্গোলরা পুব দিকে হটে যেতে শুরু করে।

www.nagorikpathagar.org

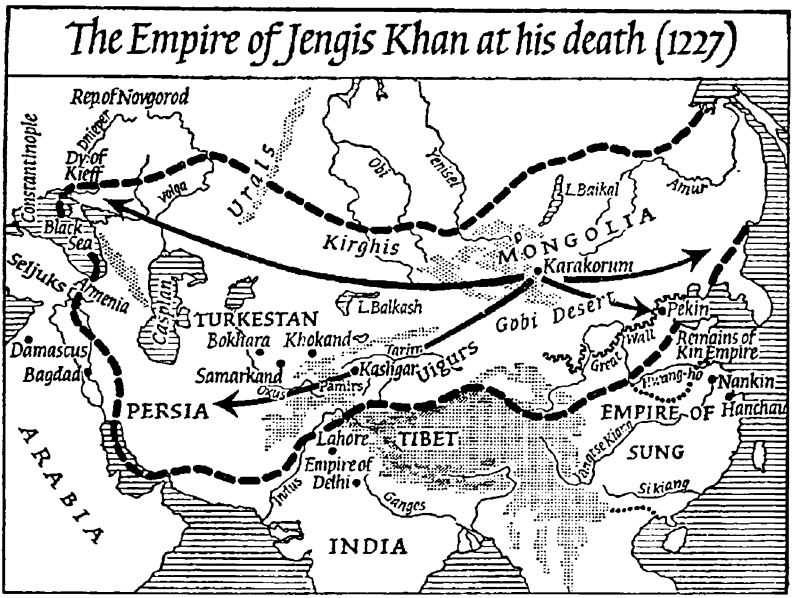

১২. চেঙ্গিস খানের মৃত্যুকালে তার সাম্রাজ্য (১২২৭ খ্রিঃ)

এরপর মঙ্গোলরা তাদের এশীয় বিজয়গুলি ধরে রাখার দিকে মনোনিবেশ করে। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি তারা সুঙ সাম্রাজ্য অধিকারে নেয়। ১২৫১ খ্রিষ্টাব্দে মাঙ্গু খান অগদাই খানের স্থলাভিষিক্ত হন, আর তার ভাই কুবলাই খানকে চীনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ১২৮০ সালে কুবলাই খান আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের সম্রাটরূপে স্বীকৃত হন, আর সেখানে ইউয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। চীনে যখন সুঙ রাজবংশ নিঃশেষ হতে চলেছে, তখন মাঙ্গু খানের আর এক ভাই হুলাগু খান পারস্য ও সিরিয়া জয়ে ব্যস্ত। এ সময় মঙ্গোলদের সাথে মুসলমানদের তিক্ত শত্রুতা শুরু হয়, আর সে সময় তারা বাগদাদ দখল করে যে শুধু ব্যাপক নরহত্যা চালিয়েছিল তাই নয়, সুমেরিয়া যুগ থেকে যে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলকে সমৃদ্ধ জনবহুল করে রেখেছিল, তাও ধ্বংস করে দেয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত মেসোপটেমিয়া আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি, আর বিরল বসতির এক মরু এলাকারূপেই রয়ে যায়। মঙ্গোলরা কখনোই মিশরে ঢুকতে পারেনি। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের সুলতান হুলাগুর বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন।

এই বিপর্যয়ের পরে মঙ্গোল বিজয়ে ভাটা পড়ে যায়। মহান খানের অধিকৃত বিশাল এলাকা অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব দিকের মঙ্গোলরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে চীনাদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, আর পশ্চিমে মঙ্গোলরা মুসলমান হয়ে যায়। ১৩৬৮ সালে চীনারা ইউয়ান রাজবংশকে প্রত্যাখ্যান করে মিঙ বংশের প্রতিষ্ঠা করে যারা ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ পর্যন্ত চীন শাসন করে। দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ার স্তেপ অঞ্চল ১৪৮০

www.nagorikpathagar.org

খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাতারদের করদরাজ্য হিসেবে রয়ে যায়, এরপর মস্কোর গ্র্যান্ড ডিউক তাতারদের অধীনতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আধুনিক রাশিয়ার পত্তন করে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খানের বংশধর তৈমুর লংয়ের মাধ্যমে মঙ্গোল মুক্তির স্বল্পকালীন পুনরুত্থান ঘটে। ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মহান খান হিসেবে তুর্কিস্থানে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আর সিরিয়া থেকে দিল্লি পর্যন্ত সাম্রাজ্যের অধিকারী হন, তবে তার মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য টিকে থাকেনি, তবে ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে তারই এক বংশধর বাবর ভারতের সমভূমিতে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তার বাহিনীর হাতে ছিল কামান বন্দুক। তার নাতি আকবর তার বিজয়কে পূর্ণতা প্রদান করেন, এই মঙ্গোল বংশ (আরবরা যাদের বলত মুঘল) দিল্লিতে রাজধানী করে ভারতের অধিকাংশ এলাকায় এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল অভিযানের একটা বড় পরিণাম ছিল অটোমান তুর্কিদের তুর্কিস্তান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত তাড়িয়ে দেওয়া। তারা এশিয়া মাইনরে তাদের অধিকার সুদৃঢ় করে সেখান থেকে দার্দানেলিস প্রণালী অতিক্রম করে মেসিডোনিয়া, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া আক্রমণ করে। অবশেষে অটোমান অধিকারের মধ্যে কনস্টান্টিনোপল রয়ে যায় দ্বীপের মতো। ১৪৫৩ সালে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ কনস্টান্টিনোপল অধিকার করে নেন। এ ঘটনাটি ইউরোপে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এছাড়া ক্রুসেডের কথাবার্তাও চলে তবে তত দিনে ক্রুসেডের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

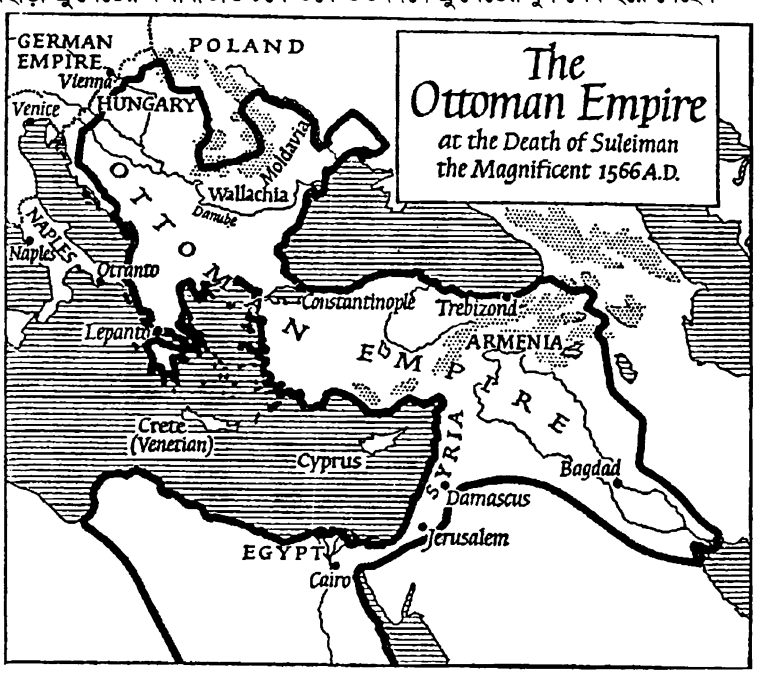

১৩. মহানুভব সুলেমানের মৃত্যুকালে অটোমান সাম্রাজ্য (১৫৬৬ খ্রি:)

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী অটোমান সুলতানরা একে একে বাগদাদ, হাঙ্গেরি, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে নেয়; আর তাদের নৌবহর ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব কায়েম করে বসে। তারা ভিয়েনা দখল করে সম্রাটের কাছ থেকে কর আদায় করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুটি ব্যাপারকে চিহ্নিত করা যায় খ্রিষ্টানদের ঘুরে দাঁড়ানোরূপে। একটা হলো মস্কোর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, আর অপরটি খ্রিষ্টানদের দ্বারা স্পেন পুনর্দখল। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে আরাগণের রাজা ফার্ডিনান্ড ও ক্যাস্টিলের রানী ইসাবেলা কর্তৃক উপদ্বীপের সর্বশেষ মুসলিম রাজ্যের পতন ঘটে।

অবশেষে ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে লে পান্তোর নৌযুদ্ধে ভূমধ্যসাগরে অটোমান শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় হয় আর খ্রিষ্টান শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

৪৯. ইউরোপে জ্ঞানচর্চার পুনর্জাগরণ

সমগ্র দ্বাদশ শতাব্দীব্যাপী লক্ষ করা যায় ইউরোপে প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানচর্চা ও ইতালির লুক্রেশীয় ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছে। এই পুনর্জাগরণের কারণ যেমন বহুবিধ তেমনি জটিল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক যুদ্ধের অবসান। ক্রুসেডের পরবর্তীকালে উন্নততর আয়েশ ও নিরাপত্তাবোধ, আর এসব অভিযানের ফলে মানুষের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন, নিঃসন্দেহে প্রাথমিক কারণরূপে গণ্য হতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নগরসমূহে জীবনযাত্রার সহজলভ্যতা আর নিরাপত্তাবোধ, গির্জাসমূহে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সাধারণ্যে সম্প্রসারণ। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন নগরের অভ্যুদয় ঘটছিল, যেমন ভেনিস, ফ্লোরেন্স, নুরেমবার্গ, নভগরদ, উইসবি, বার্গেন। এসব নগরী মূলত ছিল বাণিজ্যকেন্দ্রিক, যেখানে অনেক পর্যটকের আগমন ঘটত, আর পণ্যবিনিময়ের সাথে সাথে চিন্তা-চেতনারও সমন্বয় ঘটত। পোপ ও রাজন্যদের বাদানুবাদ, ধর্মদ্রোহীদের অমানবিক পীড়ন ও শাস্তি, জনমনে চার্চের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল আর তারা মৌলিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিল।

আমরা দেখেছি কীভাবে আরবরা অ্যারিস্টটলের ধারণাকে ইউরোপে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল আর কিভাবে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক আরবীয় দর্শন ও বিজ্ঞান ইউরোপের মানসিকতায় সঞ্চারে সহায়তা করেছিলেন। ইহুদি প্রভাবও মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাদের অস্তিত্বই খ্রিষ্টীয় চার্চের প্রতি এক প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত আলকেমিস্ট গোপন রহস্যময় তবে চিত্তাকর্ষক অনুসন্ধিৎসা ফলপ্রসূ বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহ প্রদান করেছিল। আর মানব মনের এই আলোড়ন শুধুমাত্র স্বাধীন সুশিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষ

www.nagorikpathagar.org

জাগ্রত হতে শুরু করে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে ইতিপূর্বে যার কোনো নজির নেই। খ্রিষ্টধর্মের গোঁড়ামি আর উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করে মানুষ এগিয়ে এসেছিল। এতে করে মানুষের বিবেকের সাথে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কাজেই রাজা, পুরোহিত ও তাত্ত্বিক ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠতে সাহস জুগিয়েছিল।

অনেক পূর্বে একাদশ শতকেই ইউরোপে পুনরায় দর্শন আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল আর ইতিমধ্যে প্যারিস, অক্সফোর্ড, বোলোনা এবং আরো অনেক বড় বড় শহরে মহান সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর সেখানে মধ্যযুগীয় তাত্ত্বিক ব্যক্তিরা কিছু ধারণার ওপর প্রশ্নচিহ্ন ছুড়ে দেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রস্তুতির জন্য যেগুলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন ছিল। আপন মেধা আর ক্ষুরধার চিন্তার অধিকারী রজার বেকন (আনু: ১২১০-১২৯৩), যিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের একজন ফ্রান্সিস্কান পণ্ডিত, যাকে বলা যায় আধুনিক নিরীক্ষাধর্মী বিজ্ঞানের জনক।

তাঁর লেখাগুলি ছিল অজ্ঞতার বিরুদ্ধে দীর্ঘ তিরস্কারপূর্ণ বক্তৃতা। তিনি বলেছিলেন সেই যুগটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর এটা বলা ছিল দারুণ এক সাহসিকতার কাজ। আজকের যুগে কেউ যদি বলে এ যুগের আচার-আচরণ, ক্রিয়াকলাপ সব বালখিল্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তবে তাকে তেমন কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে না, তবে মধ্যযুগের লোকেরা তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে অভ্রান্ত মনে করত, তার বিরুদ্ধাচরণকে অত্যন্ত তিক্ততার সাথে গ্রহণ করত। রজার বেকনের লেখা ছিল গভীর অন্ধকারে আলোর ঝলকানির মতো। তার সময়ের অভিজ্ঞতাকে তিনি যেমন আক্রমণ করেছিলেন, তেমনি তার লেখার মধ্যে ছিল জ্ঞানসম্পদে ঋদ্ধ হওয়ার পরামর্শ। জ্ঞানার্জন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি তার আবেগময় আগ্রহের আতিশয্যে অ্যারিস্টটলের আত্মা পুনর্জীবিত হয়েছিল। "পরীক্ষা" আর "গবেষণা"ই ছিল তার উদাত্ত আহ্বান, তবুও অ্যারিস্টটলের সাথে তার দ্বন্দ্ব ছিল। তার ভালো লাগত না মানুষ বাস্তবের মুখোমুখি না হয়ে ঘরে বসে শুধু লাতিন অনুবাদ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকুক। তার নিজস্ব তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে লেখেন : "যদি উপায় থাকত তাহলে অ্যারিস্টটলের সব বই পুড়িয়ে ফেলতাম, কারণ তার গ্রন্থ পাঠ শুধু সময়ের অপচয়, ভ্রান্তির উদ্ভব ঘটাবে, আর অজ্ঞতার প্রসার ঘটাবে।" যদি কখনো এমন এক পৃথিবীতে অ্যারিস্টটলের পুনর্জন্ম ঘটত যেখানে তার বই পড়া হয় না বা তার মতবাদের পূজা করা হয় না; তাহলে হয়তো তিনিও এমন কথাই বলতেন।

কোনো মাল্লামাঝি ছাড়াই যন্ত্রচালিত জাহাজ চালানো সহজতর হবে, শত শত মাল্লামাঝির দ্বারাও যা সম্ভব নয়। কোনো প্রাণীর দ্বারা বাহিত না হয়েও হয়তো শকট চলতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে হয়তো মানুষ পাখির মতো আকাশে উড়তে পারবে। এসব কথাই রজার বেকন লিখেছিলেন যার বাস্তবরূপ লাভ করতে মানব জাতিকে আরো তিন শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়।

আরব জগৎ খ্রিষ্টজগৎকে শুধু যে দার্শনিক ও আলকেমির ক্ষেত্রেই উদ্দীপনা জুগিয়েছিল তাই নয়, তারা কাগজের ব্যবহারও উপহার দিয়েছিল, যদি বলা হয়

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপে জ্ঞানচর্চার পুনরুত্থান সম্ভব হয়েছিল কাগজের প্রচলনের মধ্য দিয়ে, তাহলে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। কাগজের উদ্ভব ঘটেছিল চীনে, যার প্রচলন শুরু হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে চীনারা সমরখন্দে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়, আর বন্দিদের মধ্যে এমন কিছু চৈনিক ছিল যারা কাগজের ব্যবহার জানত আর তাদের কাছে থেকেই মুসলমানরা কাগজের ব্যবহার শেখে। নবম শতাব্দীর আরবীয় পাণ্ডুলিপি এখনও অক্ষত আছে। খ্রিষ্ট জগতে কাগজের অনুপ্রবেশ ঘটে গ্রিসের মধ্য দিয়ে বা খ্রিষ্টানদের মুরীয় স্পেন পুনর্বিজয়ের মধ্য দিয়ে, সেখানে তারা অনেকগুলি কাগজের কল হস্তগত করেছিল। তবে স্পেনীয় খ্রিষ্টানদের হাতে পড়ে কাগজের মান অনেকটা হ্রাস পেয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত ইউরোপে ভালো কাগজ পাওয়া যায়নি। আর উন্নত কাগজ উৎপাদনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ইতালি। চতুর্দশ শতকের আগে জার্মানিতে কাগজের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, আর সেই শতকের শেষ দিকে মাত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পুস্তক ছাপার কাজ শুরু হয়। এরপর স্বাভাবিকভাবেই ছাপার কাজ অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হয়। আর ছাপাখানার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চার এক নতুন পর্যায় শুরু হয়। এ যাবৎকাল জ্ঞানচর্চা যেমন ছিটেফোঁটা আকারে এক মন থেকে আর এক মনে সঞ্চার হতো। তা এখন প্লাবনের রূপ নিলো, যাতে লক্ষ লক্ষ মনের মধ্যে ভাববিনিময় শুরু হলো।

ছাপার কাজ শুরু হওয়ার একটা প্রত্যক্ষ ফসল হলো পৃথিবীব্যাপী প্রচুর বাইবেল গ্রন্থ ছড়িয়ে পড়া। আর একটা হলো সস্তায় পাঠ্যবইয়ের প্রাপ্যতা। লেখাপড়া দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। বইয়ের যে শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিই ঘটেছিল তাই নয়, সেগুলি সহজপাঠ্যও হচ্ছিল। বইগুলি এমন সহজভাবে লেখা হচ্ছিল যে সেগুলি পড়ার সাথে সাথে বোঝার কাজও চলছিল। বইয়ের সহজ প্রাপ্যতার কারণে পাঠক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বই এখন আর মূল্যবান অলংকার বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ রহস্য হয়ে রইল না, সাধারণ লোকের জন্যও বই লেখা শুরু হলো। বই লিখা শুরু হলো সাধারণের প্রচলিত ভাষায়, লাতিনে নয়। চতুর্দশ শতকের শুরুর সাথে ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসও শুরু হয়ে গেল।

এ পর্যন্ত আমরা ইউরোপের পুনর্জাগরণে আরবীয় প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এবার আলোচনা করব মঙ্গোল বিজয়ের প্রভাব নিয়ে। এটা ইউরোপীয় মানসিকতায় প্রবল ভূগোল চেতনার সঞ্চার করে। মহান খানের সময় বৃহত্তর এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন হয়। সকল রাস্তা অস্থায়ীভাবে উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর সকল জাতির প্রতিনিধিরা কারাকোরামে সমবেত হয়। ইসলাম খ্রিষ্টধর্মের যে বাঁধ তৈরি হয়েছিল এশিয়া আর ইউরোপের মধ্যে তা অপসৃত হয়। মঙ্গোলদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে পোপের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ইতিপূর্বে তাদের একমাত্র ধর্ম ছিল শামানী ধর্ম, যা একধরনের পৌত্তলিকতা। মঙ্গোলীয় দরবারে সমবেত হতে পেরেছিল পোপের প্রতিনিধি ; ভারত

www.nagorikpathagar.org

থেকে আগত বৌদ্ধপুরোহিত, পারসিক, ইতালীয়, চীনা কলাকুশলী, বাইজান্টীয় ও আর্মেনীয় বণিক, আরব, পারস্য ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। ইতিহাসে আমরা মঙ্গোলদের অনেক অভিযান আর ধ্বংসযজ্ঞের কথা পড়েছি, তবে তাদের কৌতূহল ও শিক্ষা-দীক্ষার কথা তেমনটা জানা যায় না। জাতি হিসেবে জ্ঞানের বিস্তারণের ক্ষেত্রে তাদের অবদান অসামান্য। চেঙ্গিস বা কুবলাই খানের মতো রোমান্টিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে যা-ই জানুক না কেন, সম্রাট হিসেবে তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা ও সৃজনশীলতা; বর্ণাঢ্য, আত্মম্ভর, সম্রাট আলেকজান্ডার বা অশিক্ষিত ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তার অধিকারী শার্লামেনের চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিল।

মঙ্গোল দরবারে আগন্তুকদের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো, পরবর্তীকালে যিনি তার ভ্রমণকাহিনী নিয়ে বই লিখেছিলেন। ১২৭২ সালে তিনি তার বাবা ও চাচার সাথে চীনে এসেছিলেন, যারা ইতিপূর্বে নিজেরাও চীনে এসেছিলেন। মহান খান পোলোদের আগমনে বেশ অভিভূত হয়েছিলেন। কারণ তারাই ছিল চীনে প্রথম লাতিন ভাষাভাষী ব্যক্তি, আর তিনি তাদের অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন যেন খ্রিষ্টধর্মে অভিজ্ঞ লোকদের তার দরবারে পাঠানো হয়। আরো অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ইউরোপীয় বিষয়েও তার আগ্রহ ছিল। দ্বিতীয়বার তারা মার্কোকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

তিনজন পোলো যাত্রা করেছিলেন প্যালেস্টাইনের মধ্য দিয়ে, ক্রিমিয়ার মধ্য দিয়ে নয়, যেমনটা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অভিযান। খানপ্রদত্ত উৎকীর্ণ স্বর্ণফলক এবং অন্যান্য দ্রব্য তাদের ভ্রমণ পথে অনেক সহায়তা করেছিল। মহান খান তাদের অনুরোধ করেছিল জেরুজালেমের পবিত্র সমাধিগৃহের প্রদীপের একটু তেল এনে দিতে। কাজেই প্রথমে তারা সেখানেই গিয়েছিল তারপর ওখান থেকে সিলিসিয়া হয়ে আর্মেনিয়ায়, এভাবেই তাদের যাত্রাপথ অনেক উত্তর দিয়ে নির্ধারণ করতে হয়েছিল। কারণ সে সময় মিশরের সম্রাট মঙ্গোলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিলেন। সেখান থেকে তারা মেসোপটেমিয়া হয়ে পারস্যের হরমুজ প্রণালী হয়ে জলপথে অগ্রসর হয়। হরমুজে তারা ভারতীয় বণিকদের সাথে পরিচিত হয়, তবে কিছু কারণে তারা সমুদ্রপথে যেতে চায়নি, আর উত্তরের পথে পারস্য মরুভূমি হয়ে বল্‌খ, পামির, কাশগড়, কোটান, লবণর হয়ে হোয়াং হো উপত্যকায় পৌছায় আর সেখান থেকে অবশেষে পিকিং। পিকিং-এ মহান খান তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান।

মার্কো বিশেষভাবে কুবলাই খানকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান নবীন যুবক, আর তাতার ভাষা তিনি ভালোভাবেই আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাকে বিশেষ রাজকীয় মর্যাদা দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব চীনে মিশনে প্রেরণ করা হয়। তিনি যে কাহিনী বর্ণনা করেন, তা এক হাস্যোজ্জ্বল সমৃদ্ধ দেশের, যেখানে পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল। ছিল সুন্দর সুন্দর দ্রাক্ষাকুঞ্জ, মাঠ, উদ্যান, বৌদ্ধ সন্তদের আশ্রম, রেশম বস্ত্র বয়ন-কেন্দ্র, সোনার জরি

www.nagorikpathagar.org

বসানো কাপড়, সমৃদ্ধ নগর বন্দর। এসব বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি ইউরোপীয়দের অবিশ্বাস্য কল্পনাকে উস্কে দিতে পেরেছিলেন। তিনি বর্মার কথা বলেছিলেন যাদের ছিল শত শত হস্তিবহর, আর কীভাবে মঙ্গোল ধনুর্ধররা তাদের পরাস্ত করতে পেরেছিল। মঙ্গোলদের পেগু বিজয়ের কাহিনীও তার বিবরণীতে পাওয়া যায়। তিনি জাপানিদের সম্বন্ধেও লিখেছেন, যাদের স্বর্ণভাণ্ডার সম্বন্ধে তিনি প্রচুর অতিশয়োক্তি করেছেন। তিন বছর তিনি ইয়াং চাওয়ের গভর্নর হিসবে কাজ করেন, আর তিনি তাদের মন জয় করতে পেরেছিলেন যতটা না ইউরোপীয় হিসেবে, তার চেয়ে বেশি একজন খাঁটি তাতাররূপে। তাকে দূত হিসেবে ভারতেও পাঠানো হয়েছিল, ১২৭৭ সালে একজন পোলোকে রাজকীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দেখানো হয়।

মার্কো পোলোর ছাপানো ভ্রমণকাহিনী ইউরোপীয় কল্পনাকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্য মার্কো পোলোর গল্পের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়।

দুই শতাব্দী পরে মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীর একজন বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন জেনোয়ার এক নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস, যিনি পশ্চিম দিক দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চীনে পৌঁছানোর চমৎকার ধারণা পোষণ করেছিলেন। সেখানে কলম্বাসের টিপ্পনিসহ মার্কোর ভ্রমণ কাহিনীর একটি কপি সংরক্ষিত আছে, যেখানে একজন জেনোয়াবাসীর মনে কেন এমন ধারণা জন্মালো তার অনেক কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিদের দ্বারা দখল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধ স্বরূপ, আর জেনোয়াবাসীরা সেখানে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করত। তবে লাতিন ভেনিসীয়রা জেনোয়াবাসীদের তিক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যারা গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুর্কিদের সহায়তা দিয়েছিল। আর তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপল দখল করার পর জেনোয়াবাসীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। পৃথিবী গোলাকার, মানুষের দীর্ঘদিন ভুলে যাওয়া ধারণাটা আবার জাগ্রত হতে শুরু করে। কাজেই পশ্চিম দিকে যাত্রা করে চীনে পৌঁছানোর চিন্তাটা তেমন উদ্ভট ছিল না। দুটি ব্যাপার এ বিষয়ে প্রেরণা জুগিয়েছিল। এ সময় নাবিকদের কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছিল, আর তাদের দিকনির্দেশনার জন্য তারকাখচিত সুন্দর একটা আকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হতো না, ইতিমধ্যেই নর্মান, ক্যাটালনীয়, জেনোয়াবাসী আর পর্তুগিজরা আটলান্টিক মহাসাগরে এগিয়ে গিয়েছিল ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ, ম্যাডিরা ও অ্যাজোরেস পর্যন্ত।

তবু কলম্বাসকে তার ধারণাটা পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। তিনি এক ইউরোপীয় দরবার থেকে আরেক দরবারে ধর্না দিয়ে ফিরছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুরদের হাত থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত গ্রানাডায় গিয়ে রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানী ইসাবেলার আনুকূল্য লাভ করলেন, আর তারপর তিনটি ছোট জাহাজ নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। দুই মাস নয় দিন সমুদ্র যাত্রার পর, তিনি এক দেশে গিয়ে পৌঁছলেন যাকে তিনি ভারত বলে বিশ্বাস করেছিলেন, যা

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতপক্ষে ছিল এক নতুন মহাদেশ, যার অস্তিত্ব প্রাচীন পৃথিবীর কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তিনি স্পেনে ফিরে এলেন প্রচুর সোনা, কার্পাস, অদ্ভুত প্রাণী আর দুজন জংলী মানুষ নিয়ে, যাদের সারা শরীর চিত্রিত ছিল। তাদের তিনি ইন্ডিয়ান বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন, যে নতুন দেশে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন তা ভারতবর্ষই ছিল। ওটা যে নতুন মহাদেশ ছিল, সে বিশ্বাস জন্মাতে মানুষকে অনেকগুলি বছর পার করতে হয়েছিল।

কলম্বাসের সফলতা মানুষের মধ্যে সমুদ্র যাত্রার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিল। ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজরা আফ্রিকার উপকূল ঘুরে ভারতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল, আর ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজ জাহাজ জাভায় পৌঁছেছিল। এরপর ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মতো ম্যাগিলান স্পেনের সেভিল থেকে রওনা দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আবার সেভিলে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিলেন। তার পাঁচটি জাহাজের মধ্যে মাত্র একটি জাহাজ ভিক্টোরীয় সেভিলে ফিরে এসেছিল ১৫২২ খ্রিষ্টাব্দে। সেই জাহাজে মোট ২৮০ জন নাবিকের মধ্যে মাত্র ৩১ জনই ফিরতে পেরেছিল। ম্যাগিলান নিজেও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নিহত হন। কাগজের ছাপানো বই, গোলাকার পৃথিবীর সপ্রমাণ অনুধাবন, নতুন নতুন দেশ, প্রাণী, উদ্ভিদ, অদ্ভুত জীবনাচরণ, প্রথা, সমুদ্র পাড়ের নতুন পৃথিবী, আকাশ আবিষ্কার ইউরোপীয় মানসিকতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করল। গ্রিক ক্ল্যাসিক সাহিত্য নতুন করে মুদ্রিত ও পঠিত হতে শুরু করল, প্লেটোর প্রজাতন্ত্রের ধারণা তাদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ও মর্যাদাবোধ এনে দিলো। রোমের আধিপত্য ইউরোপে আইন ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়েছিল, তবে রোমান চার্চ মানুষের কৌতূহল, নতুনত্বের প্রেরণা দমিয়ে রেখেছিল। লাতিনীয় সংরক্ষণবাদী মানসিকতা অপসৃত হতে শুরু করল। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপীয় আর্য, সেমিটিক ও মঙ্গোল প্রভাবে লাতিন ঐতিহ্য থেকে বের হয়ে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটাল।

৫০. লাতিনীয় চার্চের পুনর্গঠন (রিফর্মেশন)

এই মানসিক পুনর্জাগরণ লাতিন চার্চের ওপর ছিল এক বড় আঘাত। এটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যে অংশটা টিকে যায় সেটারও খোল নলচে বদলে যায়।

আমরা বলেছি কীভাবে খ্রিষ্টধর্ম চার্চের একাধিপত্যে চলে যায়। এটা একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কথা, আর কীভাবে চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে মানব মনে এর বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে। আমরা বর্ণনা করেছি সাধারণ মানুষের যে ধর্মীয় অনুভূতি ছিল চার্চের শক্তি, সেটাই ধর্মগুরুদের অহংকার, উৎপীড়ন এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করণের

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। আর দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের অবাধ্যতা রাজন্যবর্গের মনে চার্চের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস জোগাল। মহাবিভাজন চার্চের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মর্যাদা নগণ্য পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। এই উভয় দিক থেকেই চার্চের ওপর আঘাত নেমে এলো। ইংরেজ ব্যক্তিপুরুষ ওয়াইক্লিফের শিক্ষা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। শিক্ষিত লোকের গণ্ডি পেরিয়ে যেটা সাধারণের মধ্যেও উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। ১৪১৪ সালে কনস্টান্সে একটা সম্মেলন ডাকা হলো, যাতে এই বিভাজন দূর করা যায়। হাসকে এই সম্মেলনে ডাকা হলো তার প্রতি নমনীয় আচরণ করা হবে, অথচ তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ এনে এবং বিচার করে ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো। এতে করে হুসীয় মতবাদীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হলো, আর অনেকগুলি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাতিন খ্রিষ্টীয় প্রভাব ভেঙে পড়ল। এতে করে পোপ পঞ্চম মার্টিন, কনস্টান্সে যাকে প্রধান নির্বাচন করা হয়েছিল, তিনি ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করলেন।

এই কঠোর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাঁচ পাঁচটি ক্রুসেড পরিচালিত হলো, যার সবক'টি ব্যর্থ হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের সকল বেকার লোকজন বোহেমীয়দের বিরুদ্ধে হামলে পড়ে, যেমনটা পড়েছিল ত্রয়োদশ শতকে ওয়াল্ডেন্সীয়দের ওপর। তবে ওয়াল্ডেন্সীয়দের চেয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধে বিশ্বাসী ছিল চেক বোহেমীয়রা। ১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুসীয়দের সাথে চার্চের একটা সমঝোতা হয়, যাতে লাতিন চার্চের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আপত্তির স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

পঞ্চদশ শতকে এক মহা দুর্যোগ সমগ্র ইউরোপকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সাধারণ লোকের মধ্যে দারুণ দুর্দশা আর অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে আর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে কৃষকেরা জমিদার ও সম্পদশালীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই কৃষক অসন্তোষের ঢেউ জার্মানিতেও আঘাত হানে এবং তা ধর্মীয় আকার লাভ করে। এর পেছনে ছাপাখানার একটা অবদান ছিল। পঞ্চদশ শতকে জার্মানিতে স্থানান্তরযোগ্য অক্ষর তৈরি করা হয়, আর তা হল্যান্ড ও রাইনল্যান্ডে বিস্তৃত হয়। এই কলাটি ইতালি ও ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যেখানে ১৪৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাক্সটন ওয়েস্টমিনিস্টারে ছাপার কাজ শুরু করেন। যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল বাইবেলের ব্যাপক সরবরাহ ও প্রচার যাতে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিতর্কের সূচনা হয়। ইউরোপ পরিণত হয় পাঠকের জগতে, পূর্বে যেমনটা কোনো সমাজেই ঘটেনি, আর এটা ঘটে এমন এক সময়ে যখন চার্চ এতটাই বিচ্ছিন্ন আর বিভক্ত ছিল যে তার যথেষ্ট রক্ষাকবচ ছিল না, আর গির্জার অধিকারে যে বিপুল সম্পদ ছিল, তা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য রাজারাও তৎপর হয়ে উঠেছিল।

জার্মানিতে এই আক্রমণ সংহত হয়েছিল মার্টিন লুথার নামে এক প্রাক্তন সাধুর-নেতৃত্বে (১৪৮৩-১৫৪৬), যিনি উইটেনবার্গে-গির্জার নানান রক্ষণশীল ও ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। প্রথমত, তার বক্তব্য ছিল পণ্ডিতসুলভ লাতিন ভাষায়। তারপর তিনি মুদ্রণ পদ্ধতির সহায়তা নিয়ে জার্মান ভাষায় তার

www.nagorikpathagar.org

মতবাদ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন। তাকে দমাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। ইতিপূর্বে যেমনটা হয়েছিল হাসের ক্ষেত্রে, তবে মুদ্রণ-ব্যবস্থা অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, আর গোপনে ও প্রকাশ্যে অনেক রাজন্যই তাকে সমর্থন জুগিয়েছিল।

এ যুগে যখন চিন্তার প্রসার ঘটছে আর মানুষের ধর্মের বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে তখন অনেক রাজাই ভাবল রোমের সাথে তাদের প্রজাদের বন্ধন ছিন্ন করার একটা উপযুক্ত সময়। তারা চাইল জাতীয়তাবাদী ধর্মভাবনার নেতৃত্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, উত্তর জার্মানি, বোহেমিয়া একের পর এক রোমের প্রাধান্য থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। তখন থেকে তারা স্বতন্ত্রই রয়ে গেল।

বিভিন্ন রাজন্যবর্গ তাদের প্রজাদের নৈতিক, বৌদ্ধিক স্বাধীনতায় মোটেই উদ্বিগ্ন ছিল না। বরং তা তাদের ধর্মীয় সন্দেহবাদকে রোমের বিরোধিতায় কাজে লাগিয়েছিল। তবে রাজাদের কর্তৃত্বে জাতীয় গির্জা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গণজাগরণ বেশিদূর এগোতে পারেনি। তবে যিশুর শিক্ষার মধ্যে যে মানবিক মর্যাদাবোধ ছিল; যার ফলে ন্যায়-অন্যায়বোধ প্রাধান্য পায়। এসব রাজকীয় গির্জার কোনোটাই বিভিন্ন ধর্মমতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেনি। মানুষ তার ঈশ্বরভাবনা নিজের মতো করেই করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে বেশ কিছু ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যারা জীবন ও বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণে একমাত্র বাইবেলকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। তারা রাজকীয় গির্জার শৃঙ্খল মানতে চায়নি। ইংল্যান্ডে এই স্বতন্ত্রবাদীদের বলা হয় ননকনফরমিস্ট, যারা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ইংল্যান্ডে তারা চার্চের প্রধান হিসেবে রাজাকে মানতে অস্বীকার করে যার ফলক্রমে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায় (১৬৪৯), আর পরবর্তী এগারো বছর ইংল্যান্ড প্রজাতন্ত্ররূপে বিরাজমান যাকে ননকনফরমিস্টদের অধীনে।

উত্তর ইউরোপের এক বিশাল এলাকার লাতিন চার্চ থেকে বেরিয়ে আসার এই আন্দোলনকে বলে রিফর্মেশন। তবে রোমান চার্চেও এর অভিঘাত ছিল প্রবল। চার্চের পুনর্গঠন হয় আর এতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। এর প্রধান পুরুষ ছিলেন একজন স্পেনীয় সৈনিক ইনিগো লোপেজ রিকাল্‌দে বিশ্বের কাছে যিনি অধিক পরিচিত সেন্ট ইগ্নেশিয়াস লয়োলা নামে। তিনি প্রাথমিক দুঃসাহসিক প্রয়াসের পরে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পুরোহিতরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, যিনি যিশুর সমাজ নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন; যার মধ্যে সৈনিক সুলভ শৃঙ্খলার অবতারণা করা হয়। এটাই ছিল যেসুইট সমাজ যা সারা পৃথিবীব্যাপী মিশনারিরূপে যিশুর শিক্ষা সম্প্রচারে ব্রতী হয়। ভারত চীন ও আমেরিকাতে এরা খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটায়। রোমান চার্চকে ভেঙে পড়ার হাত থেকে এরাই রক্ষা করে। সমগ্র ক্যাথলিক জগতে তারা শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটায়, সুশিক্ষা ও সুবিবেচনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তারা ক্যাথলিক মানসিকতায় পরিবর্তন সূচিত

www.nagorikpathagar.org

করে। প্রটেস্ট্যান্ট জগতেও তারা প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার বিস্তার ঘটায়। আজকের শক্তিশালী রোমান চার্চ যেসুইটদেরই অবদান।

৫১. সম্রাট পঞ্চম চার্লস

বলা যায় সম্রাট পঞ্চম চার্লসের আমলে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ শিখরে পৌছে। তিনি ছিলেন সমগ্র ইউরোপে একজন অসাধারণ সম্রাট। কিছু সময়ের জন্য তিনিই ছিলেন শার্লামেনের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

তার মহত্ব তার নিজের অর্জন ছিল না। এটা ছিল তার পিতামহ ম্যাক্সিমিলিয়ানের কীর্তি (১৪৫৯-১৫১৯); কোনো কোনো পরিবার যুদ্ধ করেছিল আর কোনো কোনোটা ক্ষমতা লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল; আর হ্যাপ্সবার্গ ক্ষমতা লাভের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল বিবাহ; ম্যাক্সিমিলিয়ান শুরু করেছিলেন অস্ট্রিয়া, সিরিয়া এবং অ্যালসেস ও অন্যান্য কয়েকটি জেলা নিয়ে, যা ছিল হ্যাপ্সবার্গের পৈত্রীক উত্তরাধিকার। তিনি বিয়ে করেছিলেন নেদারল্যান্ডস ও বার্গান্ডির কন্যাদের, যাদের নাম মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বার্গান্ডীর অধিকাংশ এলাকা তার হাত থেকে ফসকে যায় তার প্রথম পত্নীর মৃত্যুর সাথে সাথে, তবে নেদারল্যান্ডস তার হাতে রয়ে যায়। তারপর ব্রিটানিতে বিবাহের এক নিষ্ফল চেষ্টা করেন। তার পিতা তৃতীয় ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সম্রাট হন ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে, তারপর বিয়ে করেন ডাচি অব মিলানকে। শেষ পর্যন্ত তার পুত্রের বিয়ে দেন ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার দুর্বলচিত্ত কন্যার সাথে, কলম্বাসের সেই ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা। এর মাধ্যমে তিনি যে কেবল সদ্য ঐক্যবদ্ধ স্পেন ও সার্ডিনিয়া এবং সিসিলির উভয় অংশের কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তা-ই নয়, ব্রাজিলের পশ্চিমে সমগ্র আমেরিকাও তার করায়ত্ত হয়। এভাবেই তার পৌত্র পঞ্চম চার্লস আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশ আর তুর্কিদের ছেড়ে যাওয়া ইউরোপের অর্ধেকটার প্রভু হয়ে বসেন। ১৫০৬ সালে নেদারল্যান্ডস তার অধিকারে আসে। তার পিতামহ ফার্ডিনান্ডের মৃত্যুর পর (১৫১৬) তিনি প্রকৃতপক্ষে স্পেন সাম্রাজ্যের রাজা হয়ে বসেন, কারণ তার মা ছিলেন নির্বোধ আর ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে পিতামহ ম্যাক্সিমিলিয়ানের মৃত্যুর পর (১৫২০ খ্রিষ্টাব্দে) বিশ বছর বয়সে সম্রাট হয়ে বসেন।

তিনি ছিলেন এক সুদর্শন যুবক, তবে তার চোখেমুখে বুদ্ধিমত্তার তেমন ছাপ ছিল না। তার ওপরের ঠোঁট ছিল পুরু আর চিবুক ছিল থ্যাবড়া। তিনি নিজেকে দেখতে পেয়েছিলেন তেজস্বী ব্যক্তিত্বের এক জগতে। এ ছিল এক উজ্জ্বল রাজন্যদের যুগ। প্রথম ফ্রান্সিস ২১ বছর বয়সে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ

www.nagorikpathagar.org

করেন ১৫১৫ খ্রিষ্টাব্দে, ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন সপ্তম হেনরী ১৮ বছর বয়সে ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে। ভারতে এটা ছিল বাবরের যুগ (১৫২৬-১৫৩০), আর তুরস্কে সুলেইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট (১৫২০), তারা দুজনই ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য সম্রাট, আর পোপ দশম লিও ছিলেন একজন খ্যাতিমান পোপ। পোপ ও প্রথম ফ্রান্সিস চার্লসের সম্রাট হওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তারা একজন ব্যক্তির হাতে এত ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়াকে ভয়ের চোখে দেখেছিলেন। প্রথম ফ্রান্সিস ও অষ্টম চার্লস উভয়েই সম্রাট পদের প্রার্থী ছিলেন। তবে ইতিমধ্যে হ্যাপ্সবার্গ পরিবারের সম্রাট হওয়ার একটা দীর্ঘ ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে (১২৬৩ থেকে), আর এক মোটা অংকের উৎকোচ চার্লসের সম্রাট হওয়ার ভিতকে পোক্ত করে।

প্রথম দিকে এই সুদর্শন যুবকটি তার প্রভাবশালী মন্ত্রীদের হাতের পুতুল-মাত্র ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে মজবুত করতে থাকেন, আর নিজের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করেন। তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে থাকেন তার সুউচ্চ অবস্থানের বিপদও নিশ্চয়ই কম নয়। তার রাজত্বের শুরুতেই যে সমস্যাটির সম্মুখীন হন তা হলো জার্মানিতে লুথারের আন্দোলন। সংস্কারবাদীদের প্রতি তার সমর্থনের একটা বড় কারণ ছিল তার নির্বাচনে পোপের বিরোধিতা। তবে ক্যাথলিক প্রধান স্পেনে লালিত হওয়ার কারণে তাকে লুথারের বিরুদ্ধে যেতে হয়। কাজেই তাকে প্রটেস্ট্যান্টদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় বিশেষ করে ইলেক্টর অব স্যাক্সনির। তাকে দাঁড়াতে হয় এক বিরাট ফাটলের সামনে, যা খ্রিষ্টজগতকে দ্বিধাবিভক্ত করে রেখেছিল। সেই ফাটল বন্ধে তার প্রচেষ্টা কষ্টসাধ্য ও আন্তরিক হলেও ফলপ্রসূ হয় নি। জার্মানিতে চলেছিল এক ব্যাপক রাজনৈতিক বিদ্রোহ, যা রাজনীতি ও ধর্মকে একসাথে গুলিয়ে ফেলেছিল। আর এসব অভ্যন্তরীণ গোলযোগ আরো জটিল করে তুলেছিল পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে আক্রমণ। পশ্চিম দিকে ছিল তার দুঃসাহসী প্রতিপক্ষ প্রথম ফ্রান্সিস; আর পূর্ব দিকে ছিল ক্রমাগ্রসর তুর্কি বাহিনী, যারা ফ্রান্সের সাথে এক জোট হয়ে হাঙ্গেরি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল আর অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে কর দাবি করেছিল। চার্লস স্পেনের কাছ থেকে অর্থ ও সৈন্য উভয়ই লাভ করেছিল, তবে জার্মানির কাছ থেকে আর্থিক সমর্থন লাভ করা বেশ কঠিন ছিল। আর্থিক সংকট তার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। তিনি বিধ্বংসী ঋণের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

মোটের ওপর অষ্টম হেনরীর সহায়তায় চার্লস ফ্রান্সিস ও তুর্কি সংকট মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ইতালি, এখানে উভয় পক্ষেরই সৈনাধ্যক্ষরা ছিল দুর্বল। তাদের অগ্রসর পশ্চাদপসরণ উভয়ই নির্ভর করত সৈন্য ও রসদ সরবরাহের ওপর। জার্মান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করে তবে মার্সেই দখলে তারা ব্যর্থ হয়ে ইতালিতে ফিরে যায়, মিলান তাদের হস্তচ্যুত হয়, এবং প্যাভিয়াতে তারা ঘেরাবন্দি হয়। প্রথম ফ্রান্সিস দীর্ঘ অসফল প্যাভিয়া অবরোধ

www.nagorikpathagar.org

করেন, আর নিজেই জার্মান বাহিনীর হাতে আহত ও বন্দি হন। তবে পোপ ও অষ্টম হেনরী তার অত্যধিক ক্ষমতা অর্জনে ভীত হওয়ায় চার্লসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। মিলানে জার্মান বাহিনী বুরবঁ সৈন্যাধ্যক্ষের কাছ থেকে মাসোহারা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে রোম আক্রমণ করে। তারা ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট চালায় (১৫২৭)। যে সময়ে লুটপাট আর হত্যাযজ্ঞ চলছে, তখন পোপ আশ্রয় নেন সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গে। শেষ পর্যন্ত তিনি চার লক্ষ ডুকাট প্রদান করে জার্মান বাহিনীকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। দশ বছর ধরে এসব এলোমেলো লড়াইতে ইউরোপ দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে সম্রাট ইতালিতে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হন। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে পোপ তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন– এভাবে মুকুটপ্রাপ্ত তিনিই সর্বশেষ জার্মান সম্রাট।

ইতিমধ্যে তুর্কিরা প্রবলবেগে হাঙ্গেরির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে তারা হাঙ্গেরির রাজাকে পরাস্ত ও হত্যা করে, বুদাপেস্ট দখল করে নেয় আর ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে মহানুভব সুলেমান ভিয়েনা প্রায় অধিকার করে ফেলেছিলেন। এসব অগ্রযাত্রায় সম্রাট অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন আর তুর্কিদের গতিরোধে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন, তবে তার জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, শক্তিধর এক শত্রুকে ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলতে দেখলেও জার্মান রাজন্যবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করা যাচ্ছিল না। প্রথম ফ্রান্সিস কিছু সময়ের জন্য অনমনীয়ই রয়ে গেলেন। তাছাড়া আর একটা ফরাসি যুদ্ধও শুরু হয়ে গিয়েছিল : তবে ১৫৩৮ নাগাদ দক্ষিণ ফ্রান্স তছনছ হওয়ায় চার্লস তার প্রতিপক্ষের কিছুটা সহানুভূতি পেয়েছিলেন। অতঃপর ফ্রান্সিস আর চার্লস তুর্কিদের বিরুদ্ধে মিত্রতা গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। তবে জার্মান রাজন্যবৃন্দ, যারা রোম থেকে বেরিয়ে আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারা নিজেদের মধ্যে একটা জোট গড়ে তুললেন, যার নাম স্মালকালডিক লিগ, কাজেই হাঙ্গেরি উদ্ধারের জন্য বড় বড় অভিযানের পরিবর্তে চার্লস মনোযোগ দিয়েছিলেন জার্মানির অভ্যন্তরীণ কোন্দল দূর করে ক্ষমতা সংহত করতে। এই কোন্দল নিজেদের প্রাধান্য অর্জনের জন্য মাঝে মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ষড়যন্ত্র আবার কখনো কূটনীতির চাল। রাজন্যদের মধ্যে এই তিক্ততা চলেছিল ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

এই ঘূর্ণায়মান দুর্যোগের মধ্যে সম্রাট কখনোই নিজ শক্তিকে পুরোপুরি হাত করতে পারেননি। তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। তার সময়কার ধর্মীয় মতপার্থক্যকে তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। ডায়েটস্ ও কাউন্সিল আহ্বান করে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টাও করেছিলেন। ইতিহাসের ছাত্রদের অবশ্য নুরেমবার্গ শান্তি সম্মেলন, রাতিশবঁ ডায়েট, অগস্‌বার্গ সমঝোতা ইত্যাদি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যথেষ্ট গলদঘর্ম হতে হবে। সত্যি বলতে কি তৎকালীন ইউরোপের অনেক রাজন্যই আন্তরিকতার সাথে কাজ করেননি। পৃথিবীব্যাপী ধর্মীয় সংঘাত, সাধারণ মানুষের সত্যসন্ধিৎসা ও ন্যায়পথে চলার বাসনা, জ্ঞানের বিস্তার; এসব কিছুই রাজাদের কূটচালের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ইংল্যান্ডের অষ্টম হেনরী,

www.nagorikpathagar.org

যিনি জীবন শুরু করেছিলেন ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে, পোপের কাছে থেকে যিনি উপাধি লাভ করেছিলেন ধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অ্যান বোলিন নামে সুন্দরী এক নবযুবতীকে বিয়ে করা আর চার্চ অব ইংল্যান্ডের বিশাল ধনভাণ্ডার লুট করার জন্য ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রটেস্ট্যান্টদের দলে ভিড়ে যান। সুইডেন, নরওয়ে আর ডেনমার্ক ইতিমধ্যেই প্রটেস্ট্যান্ট পক্ষে যোগ দিয়েছে।

জার্মানিতে ধর্মীয় সংঘর্ষ শুরু হয় ১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে, মার্টিন লুথারের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই। এই প্রচারাভিযানে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, প্রটেস্ট্যান্ট স্যাক্সন বাহিনী লচোতে দারুণ মার খায়। সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ফিলিপ অব হেসি বিরোধিতা করায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, আর বার্ষিক কর প্রদানে স্বীকৃতির মাধ্যমে তুর্কিদের পক্ষে নিয়ে আসা হয়। ১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ফ্রান্সিসের মৃত্যুর মাধ্যমে অনেকটা স্বস্তি ফিরে আসে। ১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, দ্রুত পলায়নের মাধ্যমেই কেবলমাত্র চার্লস বন্দি হওয়া থেকে রেহাই পান আর ১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দে পাসো সন্ধির মাধ্যমে শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

এই ছিল সম্রাটের ৩২ বছরের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। ইউরোপীয় মানসিকতা কিভাবে ইউরোপীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল সেটা লক্ষ করা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এখন পর্যন্ত তুর্কি, ফরাসি, ইংরেজ বা জার্মান কেউই নব আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশ বা এশিয়ার জলপথ আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। আমেরিকায় তখন বড় বড় ঘটনা ঘটে চলেছে, সামান্য কিছু লোকবল নিয়ে কর্টেজ স্পেনের হয়ে নব্য প্রস্তর যুগের মহান মেক্সিকো সাম্রাজ্য জয় করে নেয়। পানামা যোজক পার হয়ে যান পিজারো (১৫৩০) এবং আর এক আশ্চর্য দেশ পেরু জয় করে নেন। তবে তখন পর্যন্ত এসব বিজয় স্পেনের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা ছাড়া ইউরোপের জন্য তেমন অর্থবহ ছিল না।

কেবল পাসো সন্ধির পরেই চার্লস তার মানসিকতার মৌলিকত্ব প্রকাশ করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে তার সাম্রাজ্যের গৌরবগাথার মোহমুক্তি হতে শুরু করেছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে কর্তৃত্ব লাভের প্রাণান্ত প্রতিযোগিতা তার কাছে অসার মনে হয়। তার মানসিকতা কখনোই পুরোপুরি সুস্থ ছিল না, প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন অলস, সাংঘাতিক বাতের ব্যথায় কাতর। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। জার্মানিতে তার সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ভাই ফার্ডিনান্ডের ওপর ন্যস্ত করলেন আর স্পেন ও নেদারল্যান্ডসের দায়িত্ব দিলেন নিজ পুত্র ফিলিপকে। তারপর ইয়ুস্তের এক মঠের নিভৃত আশ্রয়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেললেন। আর সেখানে ওক আর চেস্টনাট গাছের ছায়াশীতল কোলে ১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করলেন।

তার মৃত্যুর সাথে সাথেই হলি রোমান সাম্রাজ্যেরও মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে তার সাম্রাজ্য তার ভাই ও পুত্রের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। রোমান সাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব

www.nagorikpathagar.org

টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্বকাল পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যায় আর কোনোমতে রুগ্ন ও মুমূর্ষু অবস্থায় টিকে থাকে।

৫২. ইউরোপে রাজতন্ত্র ও পার্লামেন্টারি প্রজাতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

লাতিন চার্চ ভেঙে পড়েছে, হলি রোমান সাম্রাজ্য চরম অবক্ষয়ের মুখে; ইউরোপের পুরো ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী জনগণ অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে ফিরছে নতুন এক সরকারব্যবস্থা, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপখাইয়ে চলতে পারবে। প্রাচীন পৃথিবীতে দীর্ঘ সময় ধরে রাজবংশের এমনকি শাসক জাতির ও ভাষাভাষীরও পরিবর্তন চলে আসছিল। তবে রাজা ও পুরোহিততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, তার চেয়েও বেশি অপরিবর্তনীয় ছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। ষোড়শ শতাব্দীর আধুনিক পৃথিবীতে রাজবংশ পরিবর্তন তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করত না, ইতিহাসের দাবি ছিল ব্যাপকতর রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল আর তার সাথে খাপখায়ানোটা ছিল সময়ের দাবি। তবে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাটাও ছিল বেশ কঠিন, কারণ পরিস্থিতি পরিবর্তনের গতি ক্রমান্বয়ে দ্রুততর হয়ে উঠছিল। মানুষ সহজে পরিবর্তন মেনে নেয় না। কাজেই খাপ খাওয়ানোর কাজটা অবচেতনেই ঘটে অনিচ্ছাকৃতভাবে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর নড়বড়ে স্বল্পতর অস্বস্তি দায়ক আর চরম বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। সময়ের দাবির প্রেক্ষিতে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের চাহিদা তা আত্মস্থ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

কী এই পরিবর্তন যা সাম্রাজ্য, পুরোহিততন্ত্র কৃষক, ব্যবসায়ী জনগণের মধ্যে ভারসাম্যকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল? এগুলি ছিল বহুমাত্রিক ও বহুমুখী; কারণ মানবিক বিষয়গুলি প্রকৃতিগতভাবেই জটিল, তবে পরিবর্তনের মূল কারণটি হলো বস্তুজগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি, প্রথম দিকে যা ধীরগতির এবং স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হলেও গত পাঁচশ বছরে তা প্রবল গতি সঞ্চয় করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় তা হলো প্রাচীন সভ্যতায় লেখার প্রচলন এবং তার বহুবিধ প্রয়োগ, যা বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করে। দ্বিতীয় অগ্রগতির সূচনা হয় অশ্বের ব্যবহারের মাধ্যমে, পরবর্তীকালে পরিবহন কাজে উটের ব্যবহার প্রচলন হয়, আর তার সাথে যুক্ত হয় চাকাওয়ালা গাড়ি, রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ আর লোহার ব্যবহার। এরপর একে একে আসে ধাতব মুদ্রা, ঋণদান, ব্যবসার মালিকানা, সাম্রাজ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে যেতে যাকে, আর তার সাথে সাথে বদল হয় মানুষের ধ্যানধারণা। তারপর বিলুপ্তি ঘটে

www.nagorikpathagar.org

স্থানীয় দেবতাদের, আর প্রসার ঘটে বৃহৎ সার্বজনীন ধর্মের। ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সেই সাথে মানবিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও বোধ জন্মে।

কিছু সময়ের জন্য গ্রিস ও আলেকজান্দ্রিয়ায় উদ্ভূত বিজ্ঞান-সমন্বয়তা বাধাগ্রস্ত হয়। বর্বর টিউটনিক অভিযান, মঙ্গোলদের পশ্চিমমুখী যুদ্ধযাত্রা, ব্যাপক ধর্মীয় পুনর্গঠন, আর বিধ্বংসী মহামারী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বিবাদ বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে সভ্যতা যখন আবার জাগতে শুরু করেছে, তত দিনে, কৃতদাসপ্রথা আর অর্থনীতির চালিকাশক্তি নেই। কাগজের কল আর ছাপাখানা মানুষের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। আর এতে জ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নতুন পথে যাত্রা শুরু করে।

আর এখন ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে সামনের দিকে মানুষের প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারায় কিছু নতুন নতুন সংযোজন ঘটতে শুরু করে, যাতে মানুষে মানুষে যোগাযোগ ও ভাবনার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। তারা বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যাতে অধিকতর উপকার ও ক্ষতি উভয়ই সংঘটিত হয়, আর তাদের এগিয়ে চলা বেগবান হতে থাকে। অবশ্য ওদিক দিয়ে মানুষের মন পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেনি, আর বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত নতুন নতুন আবিষ্কারের অভিঘাত আত্মস্থ করার শক্তি অর্জন করেনি। গত চার শতাব্দীর মানব ইতিহাস ঠিক সেই কারাগারের মতো যেখানে আগুন লাগার আগ পর্যন্ত বন্দিরা ঘুমিয়ে কাটাতেই বেশি পছন্দ করে।

যেহেতু মানব ইতিহাস ব্যক্তির নয় সম্প্রদায়ের, তাই সেসব ঘটনাই ইতিহাসে বেশি করে আলোকপাত করে, যা ব্যক্তি নয় বরং সম্প্রদায়কে অভিহিত করে। ষোড়শ শতকে যেসব নতুন জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি হলো কাগজে ছাপা বই, সমুদ্রগামী জাহাজ আর তাতে কম্পাসের ব্যবহার। প্রথমটির ফলে শিক্ষার বিপ্লবাত্মক বিস্তার, জনসম্প্রদায়ে তথ্যের প্রসার ও আলোচনা, আর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহজীকরণ। দ্বিতীয়টির প্রধান কাজ ছিল বর্তুলাকার পৃথিবীর ধারণা দৃঢ়করণ তবে কামান এবং কামানের গোলা, যা সর্বপ্রথম মোঙ্গলরা পশ্চিমা বিশ্বে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, তার পরিণতিকেও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বড় বড় ভূস্বামীর দুর্গ আর প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদ ধসে দিয়েছিল এই কামান। সামন্ততন্ত্রের উৎখাত ঘটিয়েছিল বন্দুক। বন্দুকের সামনে ধসে পড়েছিল কনস্টান্টিনোপল। মেক্সিকো আর পেরু স্পেনীয়দের বন্দুকের সামনে নতজানু হয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতকে ধারাবাহিকভাবে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ মুদ্রিত হতে শুরু করে, যার মাধ্যমে নতুনত্বের সূচনা হয়, অগ্রপথিক হিসেবে নামোল্লেখ করা যায় ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬), তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংল্যান্ডের লর্ড চ্যান্সেলর লর্ড ভেরুলাম, যিনি ছিলেন আর এক ইংরেজ, কোলবেস্টারের ডক্টর গিলবার্ট, যিনি ছিলেন বেকনের মুখপাত্র। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটিও প্রথমজনের মতো পর্যবেক্ষণ ও

www.nagorikpathagar.org

পরীক্ষণে আস্থাশীল ছিলেন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য নিউ আটলান্টিসে* তিনি স্বপ্নিল গবেষণার রূপরেখা এঁকেছিলেন।

এর পরপরই আবির্ভাব ঘটল রয়্যাল সোসাইটি অব লন্ডন, দ্য ফ্লোরেন্টাইন সোসাইটি এবং আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের; যাদের লক্ষ ছিল গবেষণা, তথ্য বিনিময়কে উৎসাহ প্রদান ও প্রকাশনা। ইউরোপের এসব বিজ্ঞান সোসাইটি যে কেবলমাত্র আবিষ্কারকে উৎসাহিত করত তাই নয়, ধর্মতত্ত্বের অতিমাত্রিকতারও সমালোচনা করত, যা কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের চিন্তা-চেতনাকে পঙ্গু করে রেখেছিল।

সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে বড় অর্জনই ছিল ছাপানো পত্রিকা আর সমুদ্রগামী জাহাজ, যার পরিপূর্ণ ফল প্রকাশ পায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, পৃথিবী আবিষ্কার ও মানচিত্র অংকনকাজ চলতে থাকে। পৃথিবীর মানচিত্রে প্রকাশ পায় তাসমেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড। গ্রেট ব্রিটেনে শুরু হয় ধাতু পরিশোধনে কয়লার ব্যবহার, যার ফলে লোহার ব্যবহার সহজতর ও ব্যাপকতর হতে থাকে, কাঠ কয়লার সাথে গলিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়, যাকে বলা যায় আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার অভ্যুত্থান।

স্বর্গরাজ্যের বৃক্ষের মতো বিজ্ঞানেও যুগপৎ কুঁড়ি, ফুল ও ফল ফলতে যাকে। ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বিজ্ঞানবৃক্ষে ফল ধরতে আরম্ভ করে। প্রথমে আসে বাষ্প, আর ইস্পাত, রেলপথ, বিশাল বিশাল সেতু, যন্ত্রপাতি যার শক্তি ছিল সীমাহীন, যা দিয়ে মানুষের সকল প্রয়োজন মেটানো সম্ভবপর হলো, তারপর আরো বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক শক্তি করায়ত্ত করল মানুষ।

আমরা ইতিপূর্বে মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে তুলনা করেছি কারাগারে বন্দি ঘুমন্ত কয়েদির মতো, আগুন লাগার আগে যার ঘুম ভাঙে না। ষোড়শ শতাব্দীতেও ইউরোপের মানুষ হলি রোমান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দেয়নি, যে সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দেবে ক্যাথলিক চার্চ। যেমন স্বপ্নের মধ্যে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হয় তেমনি ক্ষুধাতাড়িত পাকস্থলী নিয়ে এগিয়ে এলো পঞ্চম চার্লস, অষ্টম হেনরী আর মার্টিন লুথার, যারা রোমান চার্চের ধর্মসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মানুষের স্বপ্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজতন্ত্রের দিকে মোড় নিলো। এই সময় পুরো ইউরোপের ইতিহাসে দেখতে পাই রাজতন্ত্র সংহতকরণ এবং তাকে নিরংকুশ আর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তার ক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রয়াস। সেই সাথে ভূস্বামীদের অবিরাম বাধা আর ক্রমবর্ধিষ্ণু বিত্তশালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ক্ষমতাবৃদ্ধি, যা সম্রাটের বিরোধিতা করত। কোনো পক্ষই পরিপূর্ণ জয়লাভ করতে পারেনি, কোথাও হয়তো রাজার প্রাধান্য, আবার কোথাও সম্পদশালীর কর্তৃত্ব। একটা ক্ষেত্রে এখনও দেখা গেছে রাজা তার রাজ্যে পূর্বের মতো আলো ছড়াচ্ছে আর তার পাশেই এক বণিক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্র বিরাজ করছে।

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় নাটমঞ্চে এক সাধারণ চরিত্র ছিল রাজার মন্ত্রী, ক্যাথলিকদের রাজ্যে যাদের বলা হতো প্রিলেট, রাজার পাশে দাঁড়িয়ে যিনি অত্যাবশ্যক সেবাদান করতেন, আর মাঝে মধ্যে রাজার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতেন। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে সবগুলি বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। হল্যান্ডের বণিকরা ছিলেন প্রটেস্ট্যান্ট আর রিপাবলিকান, যারা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের কর্তৃত্ব ঝেড়ে ফেলে দেয়। ইংল্যান্ডে অষ্টম হেনরী আর তার মন্ত্রী উলসি, রানী এলিজাবেথ আর তার মন্ত্রী বার্লে, একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন করলেও প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লসের বোকামির কারণে তা ধসে পড়ে। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে প্রজারা চার্লসের শিরশ্ছেদ করে (১৬৪৯), ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রায় চব্বিশ বছর ধরে ব্রিটেনে প্রজাতন্ত্র চালু থাকে; আর রাজশক্তি প্রকৃতপক্ষে এক নড়বড়ে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, পার্লামেন্টের ছায়াতলে এক নিষ্প্রভ অস্তিত্ব, অবশেষে তৃতীয় জর্জ (১৭৬০-১৮২০) প্রবল প্রয়াসে রাজতন্ত্রের হৃত গৌরব অনেকটাই ফিরিয়ে আনেন, অপরপক্ষে ফ্রান্সের রাজা রাজতন্ত্রের প্রাধান্য বিস্তারে সবচেয়ে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হন। মহামন্ত্রিগণ রিশেলু (১৫৮৫-১৬৪২) এবং ম্যাজারিন (১৬০২-৬১), সেদেশে রাজশক্তিকে পাকাপোক্ত করেন, আর চতুর্দশ লুইয়ের দীর্ঘ এবং সক্ষম রাজত্ব এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করে।

চতুর্দশ লুই বাস্তবিকই ইউরোপের মডেল রাজা ছিলেন। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী সক্ষম শাসক, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তার আবেগের ঊর্ধ্বে, আর তার জটিল পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে নিজের রাজ্যকে দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মর্যাদাবোধ ছিল আকাশচুম্বী। তার প্রাথমিক প্রত্যাশা ছিল তার রাজ্যের সীমানা রাইন ও পিরেনিজ পর্যন্ত প্রসারিত করা, আর স্পেনীয় নেদারল্যান্ডসকে অঙ্গীভূত করা, আর তার দূরবর্তী দৃষ্টি ছিল শার্লামেনের উত্তরাধিকারীরূপে পুনর্গঠিত রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া। উৎকোচ প্রদানকে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় নীতিতে রূপ দেন, যা যুদ্ধ জয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় চার্লস ছিলেন তার একজন প্রসাদপ্রাপক, আর সেই ধারার মাঝে ছিল পোল্যান্ডের অভিজাতদের অধিকাংশ। তার অর্থ, সত্যিকার অর্থে ফ্রান্সের করদাতাদের অর্থ, সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে তার নিজস্ব জাঁকজমক কম ছিল না। তার ভার্সাই প্রাসাদের চোখধাঁধানো দ্যুতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তার আদর্শ ইউরোপের ছোট-বড় সব রাজন্যের অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকেই এক একটা ভার্সাই নির্মাণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কেউই তাদের আর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনায় নেয়নি। সর্বত্রই বিলাসসামগ্রী উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, মর্মর নির্মিত ভাস্কর্য, নকশা করা চীনামাটির পাত্র, গিল্টি করা কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, চিত্রিত চামড়া, উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্প, সুদৃশ্য তৈজসপত্র, উন্নত পানপাত্র। সুদৃশ্য আসবাবের সাথে খাপখাইয়ে ভদ্র সমাজের

www.nagorikpathagar.org

বেশভূষাতেও এসেছিল বৈচিত্র্য। উঁচু পরচুলা, রেশমিবস্ত্রে জরির কাজ, হাইহিল জুতো, বিচিত্র ছড়ি আরো কত কী! সম্ভ্রান্ত নারী-পুরুষ বেষ্টিত হয়ে মহামান্য লুই সূর্যের মতো কিরণ বর্ষণ করত, যে কিরণ কখনোই তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট প্রজাদের মাঝে পৌঁছত না।

পরীক্ষামূলক রাজতন্ত্রের এই যুগে জার্মানির জনগণ বিভক্তই রয়ে যায়, আর বেশ কিছুসংখ্যক রাজকীয় দরবারে ভার্সাইয়ের অন্ধ অনুকরণ চলছিল। ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-৪৮) জার্মানি, সুইডেন ও বোহেমিয়াকে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছিল পরবর্তী এক শতাব্দীকাল যাবৎ। এই যুদ্ধের ফলশ্রুতি ইউরোপীয় মানচিত্রের জোড়াতালির মধ্যেও লক্ষণীয়, যা নির্ধারিত হয়েছিল ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির (১৬৪৮) মাধ্যমে, এতে যে কেউ লক্ষ্য করবে অসংখ্য ক্ষুদ্ররাজ্য, ডিউকতন্ত্র, স্বাধীন রাজ্য ইত্যাদির অস্তিত্ব, যা আংশিকভাবে সাম্রাজ্যযুক্ত আবার অন্যেরা ছিল সাম্রাজ্যের বাইরে। সুইডেনের বাহু জার্মানি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল; সামান্য কিছু ভূখণ্ড বাদ দিলে ফ্রান্স তখনও রাইন থেকে অনেক দূরেই রয়ে গিয়েছিল। এই জোড়াতালির মধ্যে প্রাশিয়া যা ১৭০১ সালে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়, অনেকগুলি সফল যুদ্ধের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে আসে। প্রাশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটেরও ভার্সাই প্রাসাদ ছিল পোস্টডামে, যেখানে ফরাসি ভাষায় কথা বলা হতো। ফরাসি সাহিত্য পাঠ চলত, এবং ফরাসি সংস্কৃতির প্রতিযোগিতা চলত।

১৭১৪ সালে হ্যানোভারের ইলেক্টর ইংল্যান্ডের রাজা হয়ে রাজতন্ত্রের তালিকায় আর একটা সংযোজন ঘটান। পঞ্চম চার্লসের অস্ট্রীয় শাখা সম্রাট উপাধিটা ধরে রাখেন, তবে ইতিমধ্যে পূর্ব দিকে আরো এক সম্রাটের উত্থান ঘটেছে, স্পেনীয় শাখা স্পেন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের পতনের (১৪৫৩) পর মস্কোর গ্র্যান্ড ডিউক, আইভান দ্য গ্রেট (১৪৬২-১৫০৫) বাইজান্টাইন সিংহাসনের উত্তরাধিকার দাবি করেন, আর বাহুতে বাইজান্টীয় দ্বিমুখী ঈগলের প্রতীক ধারণ করেন। তার পৌত্র চতুর্থ আইভান যাকে বলা হয় আইভান দ্য টেরিবল (১৫৩৩-৮৪), সম্রাটীয় সিজার (জার) উপাধি ধারণ করেন। তবে শুধু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই ইউরোপীয় মানসিকতায় রাশিয়াকে দূরবর্তী এশীয় সাম্রাজ্য ভাবা শুরু হয়। জার পিটার দ্য গ্রেট (১৬৮২-১৭২৫) রাশিয়াকে পাশ্চাত্য ভাবধারায় যুক্ত করতে সক্ষম হন। তিনি নিভা নদীর তীরে পিটাসবার্গে

তার রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন, যা রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে জানালা হিসেবে কাজ করে, আর সেখান থেকে আঠারো মাইল দূরে পিটারহফে তার নিজস্ব ভার্সাই নির্মাণ করেন, যেখানে একজন ফরাসি স্থপতি তার জন্য তৈরি করেন টেরাস, ঝরনা, জলপ্রপাত, ছবির গ্যালারি, পার্ক এবং মহান সম্রাটের জন্য যত রকম বিলাসসামগ্রী সম্ভব। প্রাশিয়ার মতো রাশিয়াতেও ফরাসি ভাষাকে দরবারি ভাষারূপে গণ্য করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

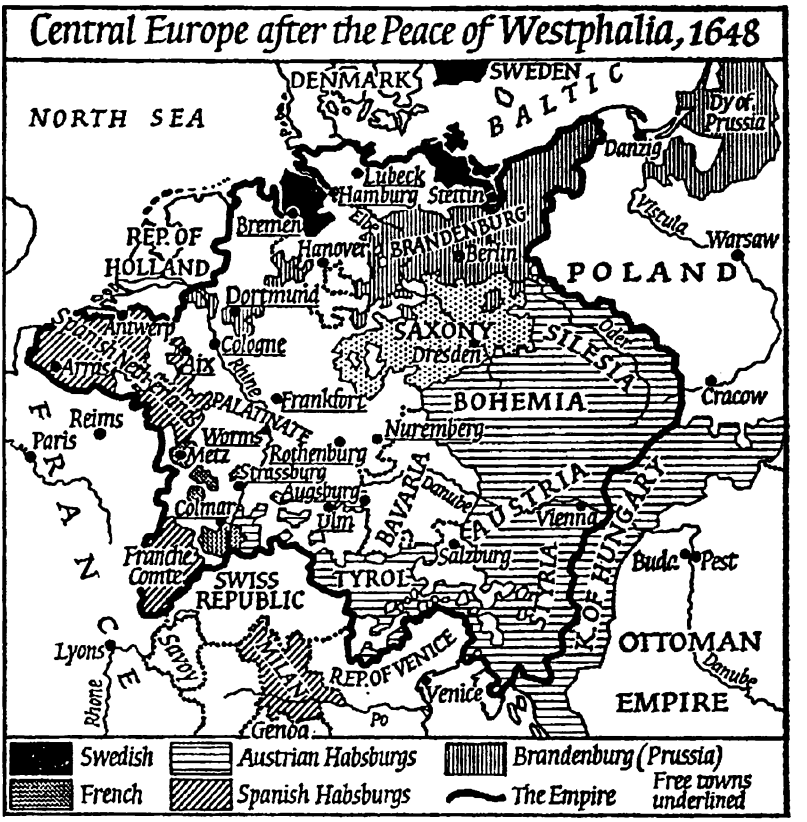

১৪. ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তিচুক্তির পরে মধ্য ইউরোপ (১৬৪৮ খ্রিঃ)

দুর্ভাগ্যজনকভাবে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মাঝখানে পড়ে গিয়েছিল পোলিশ রাজতন্ত্র যেখানে ছিল অসংগঠিত ধনিক শ্রেণী, আর তাদের নির্বাচিত নামমাত্র ক্ষমতাধর রাজা। রাজ্যটি তিন শক্তিধরের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছিল, অবশ্য ফ্রান্স চেষ্টা করেছিল তাদের অনুগত মোটামুটি স্বাধীন এক রাজা। সুইজারল্যান্ড ছিল অনেকগুলি প্রজাতান্ত্রিক প্রদেশের সমাহার; ভেনিস ছিল পরিপূর্ণ প্রজাতন্ত্র; ইতালি ছিল অনেকটা জার্মানির মতো, ডিউক ও প্রিন্সদের মধ্যে বিভক্ত। পোপাতার নিজ ভূখণ্ডে একজন রাজন্যের মতোই ছিলেন। ক্যাথলিক রাজন্যদের আনুগত্য হারাবার ভয়ে তিনি কোনোরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। প্রকৃতপক্ষে গোটা ইউরোপে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য রাজনৈতিক ধারণা ছিল না। সমগ্র ইউরোপে বিরাজমান ছিল বিভেদ আর বিচ্ছিন্নতা।

www.nagorikpathagar.org

সবগুলি সার্বভৌম রাজা ও প্রজাতন্ত্রই ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করত। প্রত্যেকেই আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করত এবং আগ্রাসী শক্তির সাথে মিত্রতা করত। এখনও আমরা এ ধরনের এক রাষ্ট্রব্যবস্থার শেষপর্যায়ে অবস্থান করছি আর এর পরিণতিতে ঘৃণা, শত্রুতা, আর সন্দেহের বাতাবরণ কাটিয়ে উঠতে পারছি না, আজকের ইতিহাস এই রটনা, অর্থহীনতা ও ক্লান্তিকর আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তবে আশার কথা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা এতে থেমে থাকেনি, মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কারের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল।

৫৩. এশিয়া ও সমুদ্রের ওপারে নতুন ইউরোপীয় সাম্রাজ্য

যদিও মধ্য ইউরোপ বিভক্ত ও বিবদমান রয়ে গিয়েছিল, তবুও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি বিশেষ করে ডাচ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, স্পেন, পর্তুগিজ, ফরাসি ও ব্রিটিশরা পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রের ওপারের দেশগুলিতে তাদের অধিকার বাড়িয়ে চলেছিল। ছাপাখানা আর সমুদ্রগামী জাহাজ ইউরোপীয় চিন্তায় অনেকটা সমন্বয় আনতে সক্ষম হয়েছিল আর ইউরোপীয়রা দূরতম সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পেরেছিল।

ডাচ ও উত্তর আটলান্টিকের দেশগুলি সমুদ্রপাড়ে বসতি স্থাপন করেছিল উপনিবেশের জন্য নয়, বরং বাণিজ্য ও খনিজ আহরণের উদ্দেশ্যে। তারা নব আবিষ্কৃত আমেরিকার প্রায় সবটাই নিজেদের বলে দাবি করেছিল। তবে খুব শিগগিরই পর্তুগিজরা একটা অংশ দাবি করেছিল। তবে পোপের সর্বশেষ কাজ হিসেবে মধ্যস্থতারূপে, কেপভার্দের ৩৭০ লিগ পশ্চিম পর্যন্ত ব্রাজিল পর্তুগিজকে, অবশিষ্টাংশ স্পেনকে ভাগ করে দেয় (১৪৯৪)। এ সময় পর্তুগিজরা দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ঠেলতে শুরু করে। ১৪৯৭ সালে ভাস্কো দ্য গামা লিসবন থেকে যাত্রা শুরু করে অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে জাঞ্জিবারে পৌঁছে এবং সেখান থেকে ভারতের কালিকটে আসে, ১৫১৫ খ্রিঃ জাহাজ চলে আসে জাভা ও মলাক্কায়, আর পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বাণিজ্য ঘাঁটি পোক্ত করতে থাকে। মোজাম্বিক, গোয়া ও ভারতের ছোট ছোট এলাকা অধিকার করে নেয়। এরপর ম্যাকাও, চীন ও তিমর তাদের অধিকারে আসে।

শিগগিরই ইংরেজ, ডেন ও সুইডিশরা উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাদের অধিকার দাবি করে বসে, আর ফ্রান্সের ক্যাথলিক মহারাজ পোপের দাবির প্রতি কোনো কর্ণপাত করেননি। এসব দাবি ও অধিকার নিয়ে ইউরোপীয়রা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে সমুদ্রপারের এসব কাড়াকাড়িতে ইংরেজরাই সবচেয়ে বড় দাঁও মারে। ডেন ও সুইডিশরা জার্মানির যুদ্ধক্ষেত্রে এত বেশি শক্তি ক্ষয় করে যে বিদেশে তেমন

www.nagorikpathagar.org

সুবিধা করতে পারেনি। সুইডেনের বিচিত্র রাজা যাকে বলা হয় "উত্তরের সিংহ", তিনিই জার্মান যুদ্ধে সুইডেনকে নিঃশেষ করে ফেলেন। সুইডেনের মতো ডাচদেরও আমেরিকায় কয়েকটা ছোট ছোট বসতি ছিল, আর সেগুলি ফরাসি আক্রমণের খুব কাছে থাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে টিকতে পারেনি। দূরপ্রাচ্যে ব্রিটিশ, ডাচ ও ফরাসিদের মধ্যে চলছিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা, আর আমেরিকায় চলছিল ব্রিটিশ ফরাসি ও স্পেনীয়দের মধ্যে। ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল "রুপালি রেখা" ইংলিশ চ্যানেলে তাদের নৌ প্রাধান্য।

ফরাসিদের চিন্তা ছিল সমগ্র ইউরোপ নিয়ে। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী ধরে স্পেন, ইতালি ও জার্মান দ্বন্দ্ব নিরসন করতে গিয়ে তারা পূর্ব ও পশ্চিমে দৃষ্টি দিতে পারে নি, সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে ধর্মীয় বিভেদের ডামাডোল এড়াতে অনেকে আমেরিকায় আশ্রয় নেয়। তারা সেখানে শিকড় গাড়ে আর সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকে আর সে কারণে আমেরিকার দ্বন্দ্বে ব্রিটিশরাই প্রাধান্য লাভ করে। ১৭৬০ সালের যুদ্ধে ফরাসিরা ব্রিটিশদের কাছে কানাডা হারায়, আর কয়েক বছর পর ফরাসি, ডাচ ও পর্তুগিজরা ব্রিটিশের কাছে পরাজিত হয়ে সমগ্র ভারত উপদ্বীপের অধিকার হারায়, মহান বাবর, আকবর ও তাদের উত্তরাধিকারীদের মোগল সাম্রাজ্য অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। আর একই ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে অধিকার জমানো দারুণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রানী এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যখন স্বীকৃতি প্রদান করেন, তখন সেটা ছোট এক সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক কোম্পানি ছিল মাত্র। ধীরে ধীরে তারা শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। আর সেই সাথে তাদের জাহাজগুলি করে তোলে অস্ত্রসজ্জিত। আর এখন এই বণিক দল মসলা, রঙ, চা, অলংকারের মধ্যেই তাদের কারবার সীমাবদ্ধ রাখল না, তা ভারতের রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় এবং এলাকা দখলের দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তারা এসেছিল কেনাবেচা করতে আর এখন রূপ নিলো জলদস্যুতে, এদের কাজকর্মে বাধা দেয়ার কেউ রইল না। এতে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে যে এর ক্যাপ্টেন, কমান্ডার, কর্মচারী, এমনকি কেরানি আর সাধারণ সৈনিকরাও এক একজন দেশে ফিরল সম্পদের পাহাড় মাথায় করে?

হঠাৎ সম্পদের মালিক হয়ে এসব লোক বুঝতে পারে না তাদের কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। তাদের জন্য এ এক আজব দেশ, যেখানে অদ্ভুত সূর্যালোক, এর বাদামি রঙের লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতের, যারা ছিল তাদের সহানুভূতির বাইরে। এর অদ্ভুত মন্দির আর লোকদের অদ্ভুত আচার-আচরণ তাদের অবাক করত। ইংল্যান্ডবাসীরা খুবই অবাক হতো যখন এসব লোক দেশে ফিরে একে অপরের বিরুদ্ধে লুটপাট আর নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করত। পার্লামেন্ট ক্লাইভের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনে। ১৭৭৪ সালে যিনি আত্মহত্যা করেন। পরবর্তীতে আর একজন মহান ভারতীয় শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮৮ সালে অভিযুক্ত হন এবং পরে তাকে দোষমুক্ত ঘোষণা করা হয় (১৭৯২)। এটা ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব

www.nagorikpathagar.org

ঘটনা। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট লন্ডনের এক বাণিজ্য কোম্পানির বিরুদ্ধে রুল জারি করছে; পক্ষান্তরে, সেই কোম্পানিই এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করছে যার লোকসংখ্যা ইংল্যান্ড ও তার অন্যান্য কলোনির লোকসংখ্যার সমষ্টির চেয়েও বেশি। অধিকাংশ ইংরেজ মনে করত ভারত দূরবর্তী, কিম্ভূত, প্রায় অগম্য এক দেশ; যেখানে দুঃসাহসী চরিত্র লোকরাই যেত আর ফিরে আসত বিত্তবান রগচটা এক ব্যক্তিরূপে। অধিকাংশ লোক বুঝতে পারত না প্রাচ্যের এই রৌদ্রালোকিত দেশের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল। তাদের অলীক কল্পনা কাজটিকে আরো কঠিন করে তোলে। ভারতবর্ষ এক কল্পনার রাজ্যই রয়ে যায়। কাজেই কোম্পানির কাজকর্ম কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভবই রয়ে যায়।

এসব আজব দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন নিয়ে পশ্চিমাশক্তির মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে, তখন এশিয়ায় আরো দুটি রাজ্যজয়ের ঘটনা ঘটে। চীনারা ১৩৬০ সালে মঙ্গোলদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বদেশীয় মহান মিঙ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে, যা ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত টিকে থাকে। ইতিমধ্যে রাশিয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বৈশ্বিক ব্যাপারে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে। প্রাচীন বিশ্বের এই কেন্দ্রীয়, যা পুরোপুরি প্রাচী বা প্রতিচী কোনোটাই নয়, তা মানবেতিহাসের নিয়ামকরূপে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাশিয়ার সম্প্রসারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হলো স্তেপ অঞ্চলের এক খ্রিষ্টান জাতির অভ্যুত্থান, এরাই ছিল কোসাক, তারা পশ্চিমের পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পূর্বের যাযাবর তাতারদের মধ্যে এক বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোসাকরা ছিল পূর্ব ইউরোপের বর্বর জাতি। তারা রাশিয়াকে এত উত্তপ্ত করে তুলেছিল যে সামাল দেয়া মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল উৎপীড়িত, নির্যাতিত, বিদ্রোহী কৃতদাস, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, চোর, ভবঘুরে, খুনি, সবাই আশ্রয় নিয়েছিল দক্ষিণের স্তেপ অঞ্চলে, আর জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করেছিল পোল, রুশ ও তাতারদের সাথে; সন্দেহ নেই পলাতক তাতারদের অনেকেই কোসাকদের সাথে মিশে গিয়েছিল, এসব মিশ্রিত জনগোষ্ঠীই শেষে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। এরাই মঙ্গোল শক্তিকে রুখে দিতে সহায়তা করেছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল শক্তির অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। চেঙ্গিস খাঁ আর তৈমুর লংগের দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যেই মধ্য এশিয়া বৈশ্বিক প্রাধান্য হারিয়ে চরম রাজনৈতিক স্থবিরতায় নিপীড়িত হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার এই অধঃপতনে সাহায্য করে থাকতে পারে। অবশ্য বিশ্ব ইতিহাসের মাপকাঠিতে এই পশ্চাদপসরণ ক্ষণস্থায়ী বলা যায়। অনেকে মনে করেন চীনে বুদ্ধের শান্তিবাদী শিক্ষাও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যাহোক, ষোড়শ শতাব্দীর দিকে মঙ্গোল, তাতার ও তুর্কি বাহিনীর অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয়ে পড়ে, বরং তারাই বারবার আক্রান্ত ও পরাস্ত হতে থাকে পশ্চিম থেকে খ্রিষ্টান রুশ এবং পূর্ব থেকে চৈনিক শক্তির দ্বারা।

www.nagorikpathagar.org

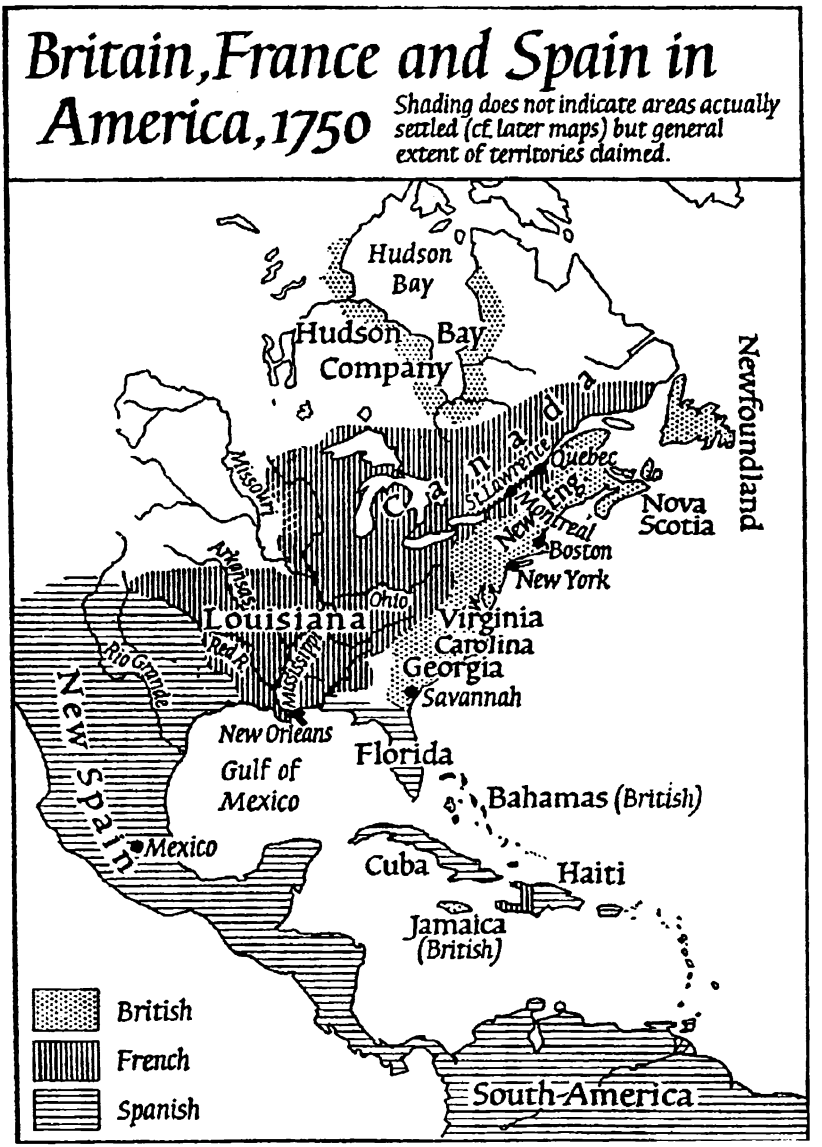

১৫. আমেরিকায় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেন (১৭৫০ খ্রিঃ)

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ ও ১৮১

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীব্যাপী ইউরোপীয় রাশিয়া থেকে কোসাক বাহিনী পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, আর যেখানেই কৃষির সম্ভাবনা দেখতে পায় সেখানেই স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। তারা চলন্ত ব্যূহ তৈরি করে সামনে এগিয়ে চলে। প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে, রুশদের সামান্যই বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

৫৪. আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

অষ্টাদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে ইউরোপের দৃশ্যপট ছিল বিভেদ আর বিভক্তির, রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় কোনো ক্ষেত্রেই ঐক্যবদ্ধ ধারণা ছিল না। তবুও এই বিভেদের মধ্যেই চলতে থাকে বিশ্বময় তাদের ছড়িয়ে পড়ার অভিযান, আর এ ব্যাপারে সহায়তা করেছিল ছাপানো বই, ছাপানো ম্যাপ ও সমুদ্রগামী জাহাজ। এটা অপরিকল্পিত, অসংহত, প্রায় দৈবাৎ আসা সুযোগ যা পৃথিবীর অন্য জাতির ওপর প্রাধান্য এনে দেয়। এই দৈবাৎ আসা সুযোগ নিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি প্রায় জনশূন্য আমেরিকা মহাদেশে ভিড় জমাতে থাকে। সেই সাথে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকেও তাদের নতুন আবাসরূপে বেছে নেয়।

কলম্বাসের আমেরিকা যাত্রা ও ভাস্কো দ্য গামার ভারত যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য– যা নাবিকদের আবহমানকালের অভিপ্রায়। যেহেতু পাচ্যদেশ আগে থেকেই জনবহুল তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যই প্রধান রয়ে যায়, আর ইউরোপীয়রা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করে সব সময়ই লাভবান রয়ে যায়। তবে আমেরিকায় ইউরোপীয়রা তেমন বাণিজ্যিক সুবিধা পায়নি, তারা সেখানে সোনা আর রুপার সন্ধানেই বেশি মনোনিবেশ করে। স্পেন অধীকৃত আমেরিকার খনি থেকে প্রচুর রুপা পাওয়া যায়। ইউরোপীয়রা আমেরিকায় যায় মূলত ভাগ্যের সন্ধানে, খনি থেকে মূল্যবান সামগ্রী আর ধনরত্নের সন্ধানে। পরবর্তীতে তারা বসতি স্থাপন করতে থাকে। উত্তরে তারা পশমের সন্ধান পায়। খনি ও আবাদ উভয়ের জন্যই প্রয়োজন স্থায়ী বসতি, কাজেই বিদেশে তারা বসতি নির্মাণে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন, সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ পিউরিটানরা ধর্মীয় নির্যাতন এড়াতে নিউ ইংল্যান্ডে গিয়ে বাস করতে থাকে, অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে প্লেথর্প ইংরেজ ঋণখেলাপিদের কারামুক্ত করে পাঠায় জর্জিয়াতে আর অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ডাচরা এতিমদের পাঠিয়ে দেয় উত্তমাশা অন্তরীপে; এভাবেই ইউরোপীয়রা বিদেশে বসতি গড়ে তোলে। আর বৃহত্তর অঞ্চলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এই নতুন সমাজ যারা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ গড়ে তোলা সভ্যতা, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, যা ছিল অনেকটাই অপরিকল্পিত অভাবিতপূর্ব, ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা তাদের ওপর বাধিত ছিল না। ইউরোপের রাজনীতিজ্ঞ আর

www.nagorikpathagar.org

মন্ত্রী আমলারা জনগণ যখন নিজদের স্বতন্ত্র জাতি স্বত্বাধিকারী ভাবতে শুরু করেছে, তখনও সম্পদের উৎস নির্ভরশীল অধীন জনগণ ভাবতেই অভ্যস্ত ছিল। আর ততদিনে মূল ভূখণ্ড তাদের ওপর আধিপত্য খোয়াতে শুরু করেছে।

কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সমুদ্রপারের এসব ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল জাহাজ। স্থলপথে তখন পর্যন্ত ঘোড়াই ছিল দ্রুততম বাহন। তাই যোগাযোগ রক্ষা করতে ঘোড়াকেই ব্যবহার করা হতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর আমেরিকার দু-তৃতীয়াংশই ব্রিটেনের অধিকারে চলে গেছে, ফ্রান্স আমেরিকা ছেড়ে চলে আসে। পর্তুগিজ ব্রাজিল, এবং অল্প কিছু দ্বীপ ও অঞ্চল বাদ দিলে দক্ষিণ আমেরিকার পুরোটাই চলে যায় স্প্যানিশদের দখলে।

ব্রিটিশ কলোনিগুলি আসলে ছিল সাতমিশেলি লোকের সমাহার। ব্রিটিশ ছাড়াও ছিল ফরাসি সুইডিশ ডাচ অভিবাসী। মেরিল্যান্ডে যেখানে ছিল ব্রিটিশ ক্যাথলিকদের প্রাধান্য সেখানে নিউ ইংল্যান্ডে ছিল চরমপন্থী প্রটেস্ট্যান্ট, নিউ ইংল্যান্ডের লোকেরা নিজেরা জমি চাষাবাদ করত আর দাস প্রথার বিরোধী থাকলেও, ভার্জিনিয়া ও দক্ষিণের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা অসংখ্য নিগ্রো কৃতদাস আমদানি করেছিল। এসব রাজ্যের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাওয়াটা আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার মতোই কষ্টসাধ্য ছিল। তবে লন্ডনের ব্রিটিশ সরকারের বোকামি তাদের অনৈক্য বাড়িয়ে তুলেছিল। তাদের কাছে যথেচ্ছ কর আদায় করা হত; তবে সেই কর কীভাবে ব্যয় করা হবে তার কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। ব্রিটিশ স্বার্থের কাছে তাদের বাণিজ্য মার খেত। ভার্জিনীয়দের বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারই লাভজনক দাস ব্যবসা পরিচালনা করত। তারা ভয় করত, হয়তো এই কালো দাসদের সংখ্যাধিক্যের ফলে তারাই কর্তৃত্ব করবে।

এ সময়ে ব্রিটেন নিরংকুশ রাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল আর তৃতীয় জর্জের একগুঁয়েমি ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে সংঘাতপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করছিল।

সংঘাতটি আরো ঘনীভূত হয়েছিল লন্ডনভিত্তিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুকূলে একটি আইন পাস, যা আমেরিকার জাহাজ কোম্পানিগুলোর স্বার্থ ব্যাহত করেছিল। তিনটি জাহাজ বোঝাই চায়ের চালান বোস্টন বন্দরে পৌছালে ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশী কিছু দস্যু সব চা সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে। (১৭৭৩)। ১৭৭৫ সালে লড়াই শুরু হয় যখন ব্রিটিশ সরকার বোস্টনের কাছে লেক্সিংটনে দুজন আমেরিকান নেতাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করে। প্রথম গুলিটি ব্রিটিশরাই ছুড়ে, এরপর কংকর্ডে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

এভাবেই সূত্রপাত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের, যদিও এক বছরের বেশি সময় ধরে অভিবাসীরা মাতৃভূমির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চায়নি। ১৭৭৬ সালে বিদ্রোহী রাজ্যগুলির কংগ্রেসে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করার আগ পর্যন্ত তারা একত্রিত থাকারই চেষ্টা করেছে। জর্জ ওয়াশিংটন অনেকের মতোই ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাকেই প্রধান সেনাপতি নির্বাচন করা হয়। ১৭৭৭ সালে এক ব্রিটিশ সেনাপতি বুর্গয়েন, কানাডা থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে এগিয়ে

www.nagorikpathagar.org

যেতে গিয়ে ফ্রিম্যান ফার্মের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। একই বছরে ফরাসি আর স্প্যানিশরা গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; এতে তাদের সমুদ্রে যোগাযোগ দারুণ বাধাগ্রস্ত হয়। জেনারেল কর্নওয়ালিসের অধীনে আর একটি ব্রিটিশ সৈন্যদল ১৭৮১ সালে ভার্জিনিয়ার ইয়র্কটাউন অন্তরীপে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ১৭৮৩ অব্দে প্যারিস শান্তি আলোচনার মাধ্যমে মেইন থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত ১৩টি রাজ্য মিলে সম্মিলিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এভাবেই আবির্ভাব হলো ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকার। কানাডা ব্রিটিশ পতাকার নিচেই রয়ে যায়।

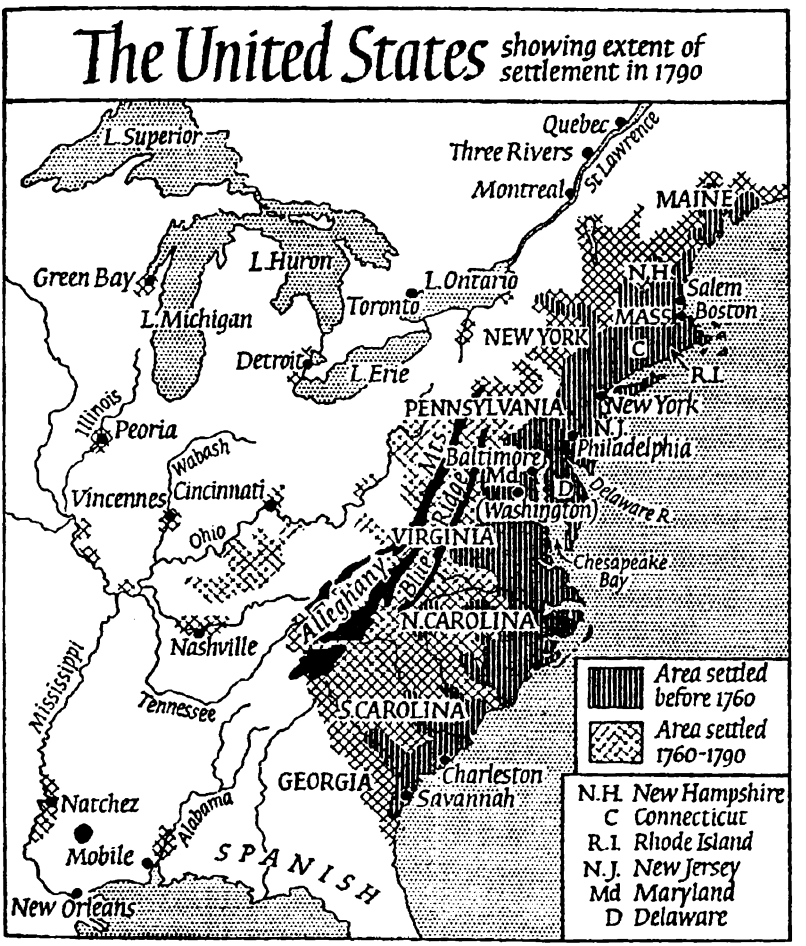

১৬. যুক্তরাষ্ট্র : বসতিস্থাপনের পরিসীমা (১৭৯০ খ্রিঃ)

www.nagorikpathagar.org

পরবর্তী চার বছর এসব রাজ্য দুর্বল এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কনফেডারেশন আকারে প্রায় স্বাধীনই রয়ে যায়। এবং আশংকা দেখা দেয় হয়তো তারা পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়েই টিকে থাকবে। ব্রিটিশ বিরোধিতা আর কানাডার শত্রুতামূলক আচরণের ভীতি না থাকলে হয়তো তারা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপেই আত্মপ্রকাশ করত। ১৭৮৮ সালে একটা সংবিধান অনুমোদন দেয়া হয়, যাতে অধিকতর কার্যকর এক ফেডারেল রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় যেখানে পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী একজন প্রেসিডেন্ট থাকবেন। ১৮১২ সালে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আর এক যুদ্ধের ফলে এই কেন্দ্রীয় শক্তিকে আরো দৃঢ়তর করা হয়। তবুও রাষ্ট্রের পরিধি এত বিশাল ছিল যে, সেই পর্যায়ের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এত বড় রাষ্ট্র একত্রে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। দূরবর্তী অঞ্চলের সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের পক্ষে ওয়াশিংটনে হাজিরা দেওয়া যেমন বিরক্তিকর তেমনি নিরাপত্তাহীন ছিল। আবার পৃথিবীব্যাপী এমন কিছু তত্ত্ব ছিল, যাতে পুরোপুরি আলাদা থাকাও সম্ভব ছিল না। অনতিবিলম্বে এসে গেল নদীতে স্টিমবোট, স্থলপথে রেলওয়ে আর টেলিগ্রাফ যা যুক্তরাষ্ট্রকে বিভক্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, আর বহুধাবিভক্ত জনগোষ্ঠীকে একত্র করে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এক মহান রাষ্ট্রের জন্ম দিলো।

এর একুশ বছর পর আমেরিকার স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক রাজ্যের অনুকরণে ইউরোপের সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করে। তবে পর্বত, মরুভূমি ও অরণ্যের দ্বারা বিভক্তির কারণে এবং ব্রাজিলে পর্তুগিজ অধিকার দৃঢ়তর হওয়ার কারণে স্প্যানিশরা একক কোনো বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। সেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট রিপাবলিকের সৃষ্টি হয়, যারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদে জড়িয়ে পড়ত।

ব্রাজিলের বিচ্ছেদ ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতিতে। ১৮০৭ সালে নেপোলিয়নের অধীনে ফরাসি সৈন্যরা পর্তুগালের মূল ভূখণ্ড দখল করে নেয়, আর সেখানকার রাজা ব্রাজিলে পালিয়ে যায়। সম্পূর্ণ বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত পর্তুগালই বরং ব্রাজিলের অধীন রাষ্ট্র ছিল। ১৮২২ সালে পর্তুগালের রাজপুত্র প্রথম পেড্রোর অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তবে নতুন পৃথিবীর কেউই রাজতন্ত্র মেনে নিতে রাজি ছিল না। ১৮৮৯ সালে ব্রাজিলের সম্রাট নীরবে জাহাজে করে দেশত্যাগ করে ইউরোপে চলে যান আর ব্রাজিল অন্যান্য আমেরিকান দেশের মতো প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।

৫৫. ফরাসি বিপ্লব ও ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ব্রিটেন আমেরিকায় তেরোটি কলোনি হারাতে না হারাতেই ইউরোপের জৌলুসপূর্ণ রাজতন্ত্রে উথাল-পাতাল শুরু হয়ে যায়, আর পৃথিবীতে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাই যে চিরস্থায়ী হতে পারে না, তা আরো একবার প্রমাণিত হয়।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ ৩৫ ১৮৫

www.nagorikpathagar.org

আমরা বলেছি, ইউরোপের সব রাজতন্ত্রের মধ্যে ফরাসি রাজতন্ত্রই সবচেয়ে সফল বলে প্রতীয়মান হয়। অনেক ছোট ছোট রাজদরবারই ফ্রান্সকে ঈর্ষার চোখে দেখত। তবে এটা বিকশিত হয়েছিল অবিচারের ওপর ভিত্তি করে, যার জন্য এটা পড়তেও সময় নেয়নি। এটা ছিল জৌলুসময় আর আগ্রাসী, তবে এটা সাধারণ মানুষকে চুষে খেয়ে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলেছিল। পুরোহিততন্ত্র আর অভিজাতরা কর অবমুক্ত ছিল, আর তার সমস্ত বোঝা গিয়ে চেপেছিল মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের ওপর, কৃষকেরা করের বোঝার চাপে মাটির সাথে চেপ্টে গিয়েছিল, মধ্যবিত্তেরা উচ্চবিত্তের দ্বারা দমিত ও অপমানিত হত।

১৭৮৭ সালে ফরাসি সম্রাট দেশের দেউলিয়া অবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ ও জটিল আয়ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত ব্যয় সমন্ধে আলোচনার জন্য সমাজের বিভিন্ন বর্গের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৭৮৯ সালে ভার্সাইতে স্টেট্স্ জেনারেল, অভিজাত ও সাধারণ জনপ্রতিনিধির এক সম্মেলন বসে, যা ছিল অনেকটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো। ইতিপূর্বে ১৬১০ সালের পর এ ধরনের সম্মেলন বসে নি, ফ্রান্স সর্বদাই রয়ে গেছে এক নিরংকুশ রাজতন্ত্র। জনগণ এবার সুযোগ পেল তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ করার। এবার তৃতীয় পক্ষ কমন্সসভা বাতিল করা হয় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এতে কমন্সরাই সুবিধা করে নেয়, স্টেটস্ জেনারেল ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে পরিণত হয়, যারা প্রকৃতপক্ষে সম্রাটকে চাপে রাখতে শুরু করে, যেমন চাপে থাকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র। রাজা ষোড়শ লুই প্রদেশসমূহ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে প্যারিস ও ফ্রান্স বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

রাজতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত হয়। প্যারিসের লোকেরা কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ অবরোধ করে। আর বিদ্রোহ সমগ্র ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বের অনেক প্রদেশে কৃষকেরা অভিজাতদের অনেক প্রাসাদ পুড়িয়ে দেয়, তাদের জমিদারির দলিলপত্র নষ্ট করে ও মালিকেরা বিতাড়িত বা নিহত হয়, এক মাসের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু অভিজাততন্ত্র ধসে পড়ে। সামনের সারির অনেক প্রিন্স ও রানীর সভাসদরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্যারিসে এবং অধিকাংশ বড় বড় নগরে অস্থায়ী নাগরিক সরকার গঠিত হয়, যে বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের বাহিনীর মোকাবেলা করা। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি নতুন যুগের উপযোগী এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করে।

এ কাজটি সম্পাদন করাই এই নতুন সংস্থার মূল প্রচেষ্টা ছিল। নিরংকুশ রাজত্বকালের অন্যায় অবিচারগুলি দূর করার চেষ্টা চলছিল। এটা বাতিল করেছিল কর রেয়াত, দাস প্রথা, অভিজাততান্ত্রিক উপাধিসমূহ ও সুযোগ-সুবিধা আর প্যারিস ভিত্তিক এক সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। রাজা ভার্সাইয়ের জাঁকজমক ত্যাগ করে প্যারিসের তুলেরিতে এক ছোট্ট রাজপ্রাসাদে ঠাঁই পেয়েছিল।

দুই বছর ধরে ধারণা জন্মেছিল ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এক কার্যকর আধুনিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সক্ষম হবে। এর অনেক কাজকর্মই ছিল সুষ্ঠু এবং

www.nagorikpathagar.org

অনেক কিছুই আজও টিকে আছে, যদিও অনেক কিছুই ছিল পরীক্ষামূলক আর পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। অনেক কিছুই ছিল অকার্যকর। পেনাল কোডের অনেক কিছুই পরিচ্ছন্ন করতে হয়েছিল : যেমন উৎপীড়ন, যথেচ্ছ কারাদণ্ড, ধর্মদ্রোহিতার শারীরিক যন্ত্রণা প্রদান ইত্যাদি লোপ করা হয়েছিল। পুরানো ফ্রান্সের নর্মান্ডি, বার্গান্ডি ইত্যাদি প্রদেশগুলির স্থলে ১৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ সকল শ্রেণীর লোকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। চমৎকার সাদাসিধা এক বিচারালয় স্থাপন করা হয়েছিল, তবে জনগণের ভোটে স্বল্পমেয়াদি বিচারপতি নিয়োগ, ব্যবস্থাটির গুরুত্ব অনেকটাই খর্ব করে। চার্চের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রের আওতায় আনা হয়। যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষামূলক বা সেবামূলক কাজ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে যুক্ত ছিল, তা ভেঙে দেওয়া হয় এবং পুরোহিতদের বেতন রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নবর্গের পুরোহিতদের জন্য এটা মন্দ ছিল না, যাদের বেতন উচ্চবর্গের পুরোহিতদের তুলনায় খুবই কম ছিল। তাছাড়াও পুরোহিত ও বিশপদের পদসমূহ নির্বাচনমূলক করা হয়েছিল, যা রোমান চার্চের মূলে কুঠারাঘাত করে; প্রকৃতপক্ষে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এক আঘাতেই ফ্রান্সের চার্চকে প্রটেস্ট্যান্টে পরিণত করেছিল, তাত্ত্বিক দিক থেকে না হলেও অন্তত সংগঠনের দিক থেকে।

১৭৯১ সালে ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবসান ঘটে রাজা রানীর কিছু পদক্ষেপের কারণে এবং এই ভুল পদক্ষেপগুলি ছিল বিদেশে অবস্থানরত তার কিছু অভিজাত রাজতন্ত্রমনা বন্ধুর পরামর্শে। পূর্ব সীমান্তে কিছু বিদেশী সৈন্যের সমাবেশ ঘটল, আর জুনের এক রাতে রাজা রানী তুলেরী থেকে পালিয়ে গিয়ে নির্বাসিত অভিজাতদের সাথে যোগ দিলো। তাদেরকে ভ্যারেনেসে থেকে পাকড়াও করে প্যারিসে ফিরিয়ে আনা হয়, আর সমগ্র ফ্রান্স প্রজাতান্ত্রিক আবেগের শিখায় জ্বলতে থাকে। প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হলো, অস্ট্রিয়া আর প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আর রাজার বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো (জানুয়ারি, ১৭৯৩), জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শাস্তির যে মডেল ইংল্যান্ডে স্থাপন করা হয়, সেই অনুসারে।

এবার ফরাসি জনজীবনে অদ্ভুত এক অধ্যায়ের সূচনা হয়। প্রজাতান্ত্রিক অগ্নিশিখায় জ্বলতে থাকে সমগ্র ফ্রান্স। দেশে-বিদেশে আপসরফার কোনো ঠাঁই রইল না। স্বদেশে রাজতন্ত্রের প্রতি ন্যূনতম সমর্থন আর প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা নির্মমভাবে দমন করা হয়। বিদেশে যে কোনো বিপ্লবের সমর্থক হয়ে দাঁড়াল ফ্রান্স। তাদের চিন্তায় সমগ্র ইউরোপ তথা সমগ্র পৃথিবীর রিপাবলিকান হওয়া উচিত। যুবকেরা দলে দলে রিপাবলিকান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে থাকে, সারা দেশে অদ্ভুত এক সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ে, মার্সেই সঙ্গীত যা মদের মতো রক্ত গরম করে তোলে। উজ্জীবিত ফরাসি সৈন্যের উদ্যত বেয়নেট আর বন্দুকের সামনে বিদেশি সৈন্যরা সব পিছু হটে যায়। ১৭৯২ সালের মধ্যে ফরাসি সৈন্যরা চতুর্দশ লুইয়ের সমস্ত অর্জনকে

www.nagorikpathagar.org

পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল, তারা বিদেশেও অধিকার জমাতে শুরু করল। তারা পৌঁছালো ব্রাসেলস্, স্যাভয় এবং মেইন্স আক্রমণ করল, তারা হল্যান্ডের কাছ থেকে শেল্ড কেড়ে নিলো। এরপর ফরাসি সরকার যেটা করল তা ছিল চরম অবিবেচনা প্রসূত, লুইয়ের মৃত্যুদণ্ডে ক্ষিপ্ত হয়ে ইংল্যান্ড সে দেশ থেকে ফরাসি প্রতিনিধিকে বহিষ্কার করে আর এতে ফ্রান্স ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এটা ছিল অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত, কারণ ইংল্যান্ড ছিল নৌযুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী। ফ্রান্সের এই উসকানি সমগ্র ইংল্যান্ডকে ঐক্যবদ্ধ করল, অথচ প্রথম দিকে ফরাসি বিপ্লবের প্রতি ইংল্যান্ড বেশ সহানুভূতিশীল ছিল।

জোটবদ্ধ ইউরোপের বিরুদ্ধে পরবর্তী বছরগুলিতে ফ্রান্সের যুদ্ধের ব্যাপারে বেশি কিছু বলার নেই। তারা বেলজিয়াম থেকে অস্ট্রিয়াকে চিরতরে তাড়িয়ে দেয়, আর হল্যান্ড পরিণত করে রিপাবলিকে। টেক্সেলে সামান্য কিছু অশ্বারোহীর কাছে ডাচ নৌবহর আত্মসমর্পণ করে। কিছুদিনের জন্য ইতালির দিকে ফ্রান্সের অগ্রযাত্রা থেমে থাকে, আর কেবলমাত্র ১৭৯৬ সালেই একজন নতুন জেনারেল নেপোলিওন যিনি ছিন্নভিন্ন রিপাবলিকান আর্মিকে একত্রিত করে বিজয় গৌরবে পিডমন্টের মধ্য দিয়ে মান্তুয়া হয়ে ভেরোনা পর্যন্ত অগ্রসর হন। (সি. এফ. অ্যাটকিনসন)।

ইউরোপীয় জোটকে যা অবাক করে দিয়েছিল, তা হলো রিপাবলিকানদের সংখ্যা ও গতিবেগ। এই ক্ষয়িষ্ণু বাহিনীর বিলম্ব করার মতো সময় ছিল না। অর্থের অভাবে তাঁবুর জোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না, পরিবহনের জন্য যে বিশাল গাড়িবহর প্রয়োজন, তা-ও ছিল না। শিগগিরই ফরাসি সৈন্যরা গেঁয়োবাহিনীরূপে পরিচিতি লাভ করল। ১৭৯৩ সালে বিশ্ববাসী অবলোকন করল আধুনিক যুদ্ধ কৌশল– যার মূল কথা ছিল গতির তীব্রতা, জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত, তাঁবুবিহীন শিবির, ক্ষুদ্র পেশাদার সৈন্যবাহিনী। বিপ্লবের দায়িত্ব এবার কাঁধে তুলে নিলেন আর এক আবেগ উন্মত্ত সেনাপতি রোবসপিয়ের। এই ব্যক্তিটির মূল্যায়ন করা কঠিন, লোকটা ছিল ক্ষীণ স্বাস্থ্যের, স্বভাবত ভীরু প্রকৃতির দাম্ভিক, খিটখিটে মেজাজের; কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। তার নিজস্ব ভাবনা অনুসারেই তিনি রিপাবলিককে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, আর তার কল্পনায় তিনি ছাড়া আর কেউ এটাকে বাঁচাতে পারবে না। রিপাবলিককে বাঁচাতে হলে তাকে ক্ষমতায় থাকতেই হবে। মনে হয় যেন রিপাবলিকের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে রাজা ও রাজার অনুগতদের হত্যার মধ্যে। বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল পশ্চিমে লাভেন্ডি জেলায়। বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান ও অর্থোডক্স পুরোহিতদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে, আর ওটা পরিচালিত হয়েছিল অভিজাত ও পুরোহিত শ্রেণীর সমন্বয়ে। আর দক্ষিণেরটি পরিচালিত হয়েছিল লিওঁ ও মার্সাইয়ে তুলোর রাজতন্ত্রীরা ইংরেজ ও স্প্যানিশ বাহিনীকে ডেকে এনেছিল, রয়্যালিস্টদের হত্যা করা ছাড়া এর কোনো প্রত্যুত্তর ছিল না।

বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল তার কাজ শুরু করে দিলো, আর এগিয়ে চলল হত্যাযজ্ঞ। এ কাজের জন্য গিলোটিনের আবিষ্কার বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল, রানীকে দেওয়া

www.nagorikpathagar.org

হলো গিলোটিনে আর সেই সাথে রোবসপিয়েরের বিরোধিতাকারীদের চড়তে হলো গিলোটিনে, যেসব নাস্তিক সর্বময় সত্তাকে অবিশ্বাস করল তাদের কপালেও জুটল গিলোটিন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এই নতুন যন্ত্রটি বেশি, আরো বেশি মানুষের শিরশ্ছেদ ঘটিয়ে চলল। মনে হলো রোবস্পিয়েরের যুগ অনন্তকাল স্থায়ী হবে, যার দাবি ছিল আরো বেশি রক্ত, যেমন কোনো আফিমখোরের প্রয়োজন আরো বেশি আফিম।

শেষ পর্যন্ত ১৭৯৪-এর গ্রীষ্মকালে রোবস্পিয়েরকেও ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়ে গিলোটিনে চড়ানো হয়। তাঁর উত্তরসূরিরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় পাঁচ সদস্যের নির্বাহী কমিটি যারা বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে পাঁচ বছর ফ্রান্সকে টিকিয়ে রাখে। তাদের শাসনকাল ছিল ইতিহাসের এক অনন্য অন্তর্বর্তীকাল। তারা যে অবস্থায় পেয়েছিল সেভাবেই দেশ চালাতে চেয়েছিল। বিপ্লবের জয়গাথা গেয়ে তারা তাদের সৈন্যবাহিনীকে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ জার্মানি ও উত্তর ইতালির দিকে পরিচালিত করে। সর্বত্রই রাজাকে বিতাড়িত করে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এসব প্রচার-প্রচারণা ফরাসি সৈন্যদের লুটপাটের প্রলোভন সংযত করতে পারেনি। তাদের যুদ্ধ আর স্বাধীনতার পক্ষে ধর্মযুদ্ধ রইল না, বরং প্রাচীন কালের আগ্রাসী যুদ্ধে পরিণত হলো। গ্র্যান্ড মনার্কীর শেষ বৈশিষ্ট্য নিয়েই যেন ফ্রান্সের নতুন অভ্যুদয় ঘটল অন্তত বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ডিরেক্টরের অধীনে ফ্রান্সকে মনে হলো তেমনি ক্ষমতাগর্বী, যেন ফ্রান্সে কোনো বিপ্লবই ঘটেনি।

ফ্রান্সের জন্য তথা সমগ্র ইউরোপের দুর্ভাগ্য যে ফ্রান্সে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল যার দাম্ভিকতা পূর্বের সকল মাপকাঠি ছাড়িয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেন। তিনি ছিলেন দারুণ অদূরদর্শী এক ব্যক্তি, তবে অত্যন্ত তেজস্বী ও নির্দয় প্রকৃতির। প্রথম জীবনে তিনি রোবস্পিয়রের একজন কড়া সমর্থক ছিলেন; তার পদোন্নতিও সেখান থেকে, তবে ইউরোপে যে নতুন শক্তি কাজ করছে সে সম্বন্ধে তার কমই ধারণা ছিল। তার রাজনৈতিক কল্পনায় ছিল পশ্চিম ইউরোপে ক্ষমতা বিস্তার। হাল রোমান সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, তার বদলে প্যারিসভিত্তিক এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের কল্পনা করেছিলেন। ভিয়েনার সম্রাট আর পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট রইলেন না, শুধুমাত্র অস্ট্রিয়ার সম্রাট হয়েই টিকে রইলেন।

১৭৯৯ সালে প্রথম কনসালরূপে তিনি প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের রাজা হয়ে গেলেন, আর শার্লামেনের অনুকরণে ফ্রান্সের সম্রাট হলেন ১৮০৪ সালে, প্যারিসে পোপ তার মাথায় মুকুট তুলে দিলেন। তার পুত্র হলো রোমের রাজা।

কয়েক বছরের জন্য নেপোলিয়নের রাজত্ব ছিল বিজয়ের ইতিহাস, তিনি ইতালি ও স্পেনের অধিকাংশই জয় করে নিলেন। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করলেন, আর রাশিয়ার পশ্চিমে গোটা ইউরোপ তার পদানত হয়। তবে ব্রিটিশের কাছ থেকে কখনোই সমুদ্রের আধিপত্য ছিনিয়ে নিতে পারলেন না, আর ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল নেলসনের কাছে তার নৌবহর চরমভাবে পরাস্ত হয় (১৮০৫)। ১৮০৮ সালে স্পেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আর ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্য ফরাসি বাহিনীকে উপদ্বীপ থেকে হটিয়ে দেয়। ১৮১১ সালে নেপোলিয়ন জার প্রথম আলেকজান্ডারের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এরপর ১৮১২ সালে ৬,০০০,০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হন, রাশিয়া যাকে পরাস্ত করে অধিকাংশই ধ্বংস করে ফেলে; রাশিয়ার শীত যে কাজে দারুণ সহায়তা করে। জার্মানিও তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, সুইডেনও বিপক্ষে চলে যায়। ফরাসিরা পিছু হটে যায় আর ১৮১৪ সালে ফঁতেব্লতে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করেন। এলবা দ্বীপে তাকে নির্বাসন দেয়া হয়। শেষ চেষ্টায় আর একবার তিনি সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা করেন (১৮১৫); তবে ব্রিটিশ, বেলজিয়াম আর প্রাশিয়ার যৌথ বাহিনীর কাছে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। ১৮২১ সালে সেন্ট হেলেনায় তিনি ব্রিটেনের বন্দি হিসেবে প্রাণত্যাগ করেন।

ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে যে শক্তি উৎসারিত হয়েছিল, তা কালক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। বিজয়ী মিত্রজোট ভিয়েনা কংগ্রেসের মাধ্যমে বিপ্লবের ঝড়ে খণ্ড-বিখণ্ড শক্তিগুলিকে পুনঃস্থাপিত করে। পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে নিঃশেষিত শক্তির এক ধরনের শান্তি বিরাজ করে ইউরোপে।

৫৬. ন্যাপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপে বিরাজিত অস্বস্তিকর শান্তি

এই সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া এবং ১৮৫৪ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত যে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা তার প্রধান ও প্রথম কারণ হলো, রাজকীয় দরবারমুখী প্রবণতা এবং চিন্তার ও লেখার স্বাধীনতার প্রতি অন্যায্য হস্তক্ষেপ; দ্বিতীয় কারণটি হলো, ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে সীমান্ত চিহ্নিতকরণের অযৌক্তিকতা।

রাজকীয় মানসিকতার সহজাত প্রবণতা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় স্পেনে। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও এর আবির্ভাব ঘটে। নেপোলিয়ন যখন তার ভাইকে স্পেনের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রদান করে, তখন আটলান্টিকের ওপারে স্প্যানিশ কলোনিতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে। জেনারেল বলিভার ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন। স্পেন এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম না হয়ে বরং একে টেনে নিয়ে চলে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ এগিয়ে চলে। অবশেষে অস্ট্রিয়ার পরামর্শে ইউরোপীয় জোট স্পেনকে সমর্থন করতে রাজি হয়। সারা ইউরোপে একমাত্র ব্রিটেন এর বিরোধিতা করে, তবে প্রেসিডেন্ট মনরোর দ্রুত হস্তক্ষেপেই রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা রোধ করা সম্ভব হয়। তিনি ঘোষণা করেন পশ্চিম গোলার্ধে কোনো ইউরোপীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শত্রুতামূলক বলে গণ্য হবে।

www.nagorikpathagar.org

এটাই মনরো-তত্ত্ব নামে পরিচিত; যার মূল কথা হলো আমেরিকার বাইরের কোনো শক্তি আমেরিকায় কর্তৃত্ব করতে পারবে না। এভাবেই স্প্যানিশ আমেরিকানরা তাদের নিজের জন্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে।

তবে যদিও স্পেন তার কলোনির কর্তৃত্ব হারাল, তবু ইউরোপে তার নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ১৮২৩ সালে ফ্রান্সের সহায়তায় স্পেনে এক গণ-অভ্যুত্থান গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়, অনুরূপভাবে অস্ট্রিয়াও ন্যাপলসে এক বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়।

১৮২৪ সালে সপ্তদশ লুইয়ের মৃত্যুর পর দশম চার্লস তার উত্তরাধিকার লাভ করে, প্রেস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করে নিরংকুশ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাসাদ পোড়ানো, বাজেয়াপ্তকরণের ক্ষতিপূরণ করার জন্য লক্ষ লক্ষ ফ্রাংক বরাদ্দ করা হয়। ১৮৩০ সালে প্রাচীন রাজতন্ত্র বহালের প্রতিবাদে ত্রাসের রাজত্বকালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তার পুত্র লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসানো হয়। অন্যান্য মহাদেশীয় রাজতন্ত্র, ব্রিটেন জার্মান ও অস্ট্রিয়া এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। এই লুই ফিলিপ (১৮৩০-৪৮) ১৮ বছর ধরে ফ্রান্সের সাংবিধানিক রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

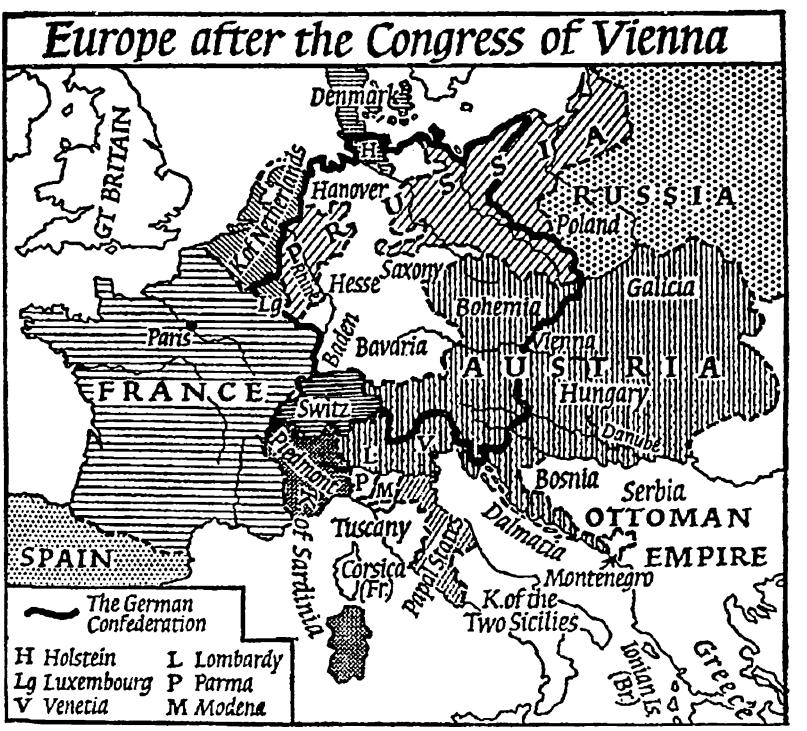

১৭. ভিয়েনা কংগ্রেসের পরে ইউরোপ

www.nagorikpathagar.org

এই ছিল ভিয়েনা শান্তিচুক্তির অস্বস্তিকর দোদুল্যমান অবস্থা, যা প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রীদের দ্বারা আরো উত্তপ্ত করে তুলেছিল। ভিয়েনার কূটনীতিকদের অবৈজ্ঞানিক সীমানা চিহ্নিতকরণ এই উত্তেজনাকে আরো উসকে দিয়েছিল, যা মানবজাতির শান্তির জন্য ছিল বিপজ্জনক। বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের একীভূত করার ফলে প্রশাসন চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল, তার ওপরে ছিল ধর্মীয় মতানৈক্য। বিভিন্ন ভাষাভাষী আর মতাদর্শী লোকদের মধ্যে একমাত্র ঐক্যের উপাদান ছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা। এমনকি সুইজারল্যান্ডেও সর্বোচ্চ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। যেখানে মেসিডোনিয়ার মতো মিশ্র জনগণের বাস, সেখানে ক্যান্টন পদ্ধতি অপরিহার্য। তবে পাঠক যদি ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রণীত ইউরোপের ম্যাপের দিকে লক্ষ করেন তাহলে সহজেই জনগণের অস্বস্তির কারণ উপলব্ধি করতে পারবেন।

এটা ডাচ রিপাবলিকের অবলুপ্তি ঘটায় অকারণে, এতে প্রটেস্ট্যান্ট ডাচদের ফরাসিভাষী স্প্যানিশ ক্যাথলিক নেদারল্যান্ডসের সাথে জুড়ে দেয়া হয়, আর এভাবেই প্রতিষ্ঠা পায় নেদারল্যান্ডস রাজ্যের। এটা যে শুধু প্রাচীন ডেনিশ প্রজাতন্ত্রকে জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়ানদের হস্তান্তর করেছিল; তা-ই নয়, মিলান পর্যন্ত ইতালিও হস্তান্তর করা হয়। ফরাসি ভাষাভাষী স্যাভয়কে ইতালির এক টুকরার সাথে যুক্ত করে গঠন করা হয় সার্দিনিয়া রাজ্য। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে যেখানে ইতিমধ্যেই নানান বিবদমান জাতির অস্তিত্ব রয়েছে, যেমন জার্মান, হাঙ্গেরিয়, চেকোশ্লাভ, যুগোশ্লাভ, রুমানীয় ও ইতালীয়; তার সাথে আরো যুক্ত হলো অস্ট্রীয় ও পোলিশ রিপাবলিকান মনোভাবাপন্ন পোলিশ জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো অপেক্ষাকৃত কম সভ্য গ্রিক অর্থোডক্স জারের অধীনে আর অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলি চলে যায় প্রটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়ার কাছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শী ফিনদেরকেও জারের কাছে সমর্পণ করা হয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নরওয়ে ও সুইডিশ জনগণকে এক রাজার অধীনে দিয়ে দেওয়া হয়। জার্মানির অবস্থাও এলোমেলো করে ফেলা হয়। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার কিছু অংশ কনফেডারেশনের মাঝে আর কিছু বাইরে রাখা হয়, যেখানে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য। ডেনমার্কের রাজাও চলে আসে জার্মান কনফেডারেশনের অধিকারে; কারণ হলস্টাইনে ছিল কিছু জার্মানভাষী জনগণ। লুক্সেমাবার্গ চলে যায় জার্মান কনফেডারেশনে যদিও সেখানকার রাজা নেদারল্যান্ডসেরও রাজা ছিলেন আর অনেক লোকই ফরাসি ভাষায় কথা বলত।

যারা জার্মান ভাষায় কথা বলে এবং জার্মান সাহিত্যের ওপর নিজেদের ভাবধারা গড়ে তোলে, তাদের এক ভূখণ্ডে থাকতে দিলেই তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেসে এটা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। ঠিক তেমনি ইতালীয় ও পোলিশ ভাষাভাষীদের প্রতিও একই অবিচার করা হয়। জার্মানদের একটা প্রিয় গানের মর্মার্থ ছিল, 'যেখানেই লোকে জার্মান ভাষায় কথা বলবে সেখানেই জার্মান পিতৃভূমি।'

www.nagorikpathagar.org

১৮৩০ সালে ফরাসিভাষী বেলজিয়াম সাম্প্রতিক ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নেদারল্যান্ডসের সাথে ডাচ সংযুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফ্রান্সের সাথে সংযুক্তি ভয়ে ভীত হয়ে বেলজীয়রা স্যাক্স-কোবার্গের প্রথম লিওপোল্ডকে রাজা ঘোষণা করে। ১৮৩০ সালে ইতালি ও জার্মানিতেও ব্যর্থ অভ্যুত্থানের চেষ্টা চলে, তবে সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপারটি ছিল রুশীয় পোল্যান্ডের ওয়ারসতে, একটি রিপাবলিকান সরকার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে এক বছর ধরে টিকে থাকে, তারপর চরম অত্যাচার নির্যাতনের পর তা লুপ্ত করে দেয়া হয়। পোলিশ ভাষা নিষিদ্ধ করা হয়, রোমান ক্যাথলিকের পরিবর্তে গ্রিক অর্থোডক্স মতবাদকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে ঘোষণা করা হয়।

১৮২১ সালে তুর্কিদের বিরুদ্ধে এক গ্রিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ছয় বছর ধরে তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে, ইউরোপের সরকারসমূহ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। উদারপন্থীরা এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করে, ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশের স্বেচ্ছাসেবীরা বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেয়। অবশেষে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া যৌথ ব্যবস্থা নেয়। নাভারিনোর যুদ্ধে (১৮২৭) ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড তুর্কি নৌবহর ধ্বংস করে দেয়, আর এ সুযোগে জার তুরস্ক আক্রমণ করে বসে। আদ্রিয়ানোপলের সন্ধি অনুসারে (১৮২৯) গ্রিসকে স্বাধীন করে দেয়া। তবে তাকে তার প্রাচীন প্রজাতান্ত্রিক রূপে ফিরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। একজন জার্মান রাজা, ব্যাভারিয়ার প্রিন্স অটোকে গ্রিসের রাজপদে বসানো হয়। তবে এসব এলাকা থেকে তুর্কিদের সম্পূর্ণ বিতাড়নের জন্য আরো অনেক রক্ত ঝরাতে হয়।

৫৭. বস্তুবাদী জ্ঞানের বিকাশ

সমগ্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক আর ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত যখন ইউরোপে চলছে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির (১৬৪৮) মাঝে জোড়াতালি দেওয়া হচ্ছে ভিয়েনা চুক্তির মাধ্যমে। আর সমুদ্রগামী জাহাজ যখন ইউরোপীয় প্রভাব ছড়াচ্ছে সারা দুনিয়ায়, তখন পৃথিবী সম্বন্ধে মানুষের ধারণা আরো পরিচ্ছন্ন হতে থাকে।

রাজনৈতিক জীবন থেকে স্বতন্ত্রভাবেই এই জ্ঞানের বিকাশ ঘটছিল, আর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক অঙ্গনে এর কোনো প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়নি। সাধারণ জনগণের ওপরও এর কোনো প্রভাব ছিল না, এর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছিল অনেক পরে, পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ পেয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এ পদ্ধতি সক্রিয় ছিল সমৃদ্ধ ও স্বাধীন মানসিকতার ছোট এক পৃথিবীতে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রিসে বা ইউরোপের অন্য কোথাও নবায়িত হতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ববিদ্যালয় একটা ভূমিকা পালন করেছিল, আর এই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারায় তার বড় কোনো ভূমিকা ছিল না। প্রদত্ত শিক্ষা ভীরু ও রক্ষণশীল প্রকৃতির হয়, যাতে উদ্যমের অভাব থাকে এবং নতুনত্বকে প্রতিরোধের প্রবণতা থাকে, যদি না তাতে থাকে মুক্তমনের উদ্দীপনা।

ইতিমধ্যেই আমরা জানি ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কথা, যেখানে বেকনের *নিউ আটলান্টিসের* স্বপ্নের রূপায়ণ প্রচেষ্টা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরোটা সময় জুড়েই, বস্তু ও গতি সম্বন্ধে নতুন ধারণা স্পষ্টতর হতে থাকে। গণিতশাস্ত্রে অগ্রগতি, মাইক্রোস্কোপ ও টেলিস্কোপে অপ্টিক্যাল গ্লাসের ব্যবহার, শ্রেণিবিন্যস্ত প্রাকৃতিক ইতিহাস, শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান, যার চিন্তা ছিল অ্যারিস্টটলের মাথায়, আর যার পূর্বানুমান করেছিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯), যার মাধ্যমে পাথরের গায়ে অঙ্কিত ইতিহাসের পঠন শুরু হয়।

পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতি ধাতুবিদ্যার ওপর প্রয়োগ শুরু হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণ ধাতুর প্রায়োগিক ব্যবহার শুরু হয়। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করে।

১৮০৪ সালে ট্রেভিথিক, ওয়াটের আবিষ্কৃত স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহার করে পরিবহনে প্রথম লোকেমোটিভ আবিষ্কার করেন, ১৮২৫ সালে প্রথম রেলওয়ে চালু হয় স্টকস্টন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত। আর স্টিফেনসনের রকেট ট্রেন ঘণ্টায় চুয়াল্লিশ মাইল বেগে চলতে থাকে। ১৮৩০ সাল থেকে শুরু হয় রেলওয়ের সম্প্রসারণ। শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ সারা ইউরোপে রেলওয়ের নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়।

মানুষের নির্ধারিত জীবনযাত্রায় হঠাৎ করেই বড় এক পরিবর্তনের ধাক্কা এসে গেল, মানুষের যাতায়াত প্রবল বৃদ্ধি পেল। রুশ বিপর্যয়ের পর ভিয়েনা থেকে প্যারিসে পৌঁছতে নেপোলিয়নের লেগেছিল ৩১২ ঘণ্টা। এটা ছিল ১৪০০ মাইলের ভ্রমণ সে সময়ে প্রচলিত সব সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করেও ঘণ্টায় পাঁচ মাইল ছিল তার গতিবেগ। সাধারণ ভ্রমণকারীদের গতি এর অর্ধেকও ছিল না। এই একই গতিবেগ ছিল প্রথম শতাব্দীতে রোমান ও গলদের। তারপর হঠাৎ করেই এলো এই প্রচণ্ড পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের ভ্রমণ সময়ও বিপুল হ্রাস পেল। পূর্বের তুলনায় ইউরোপের ভ্রমণকাল এখন এক-দশমাংশে নেমে এলো। প্রশাসনিক কাজকর্মও দশ গুণ ত্বরান্বিত হলো। আমেরিকাতেও এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমে ওয়াশিংটন পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। এতে করে টেকসই ঐক্য সুনিশ্চিত হলো।

প্রথমদিকে বাষ্পচালিত জাহাজ বাষ্পীয় রেলগাড়ির চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিল। ১৮০২ সালে শার্লট ডান্ডোস ক্ল্যাইড ক্যানালেএকটা বাষ্পীয় জাহাজ, আর ১৮০৭ সালে ফুলটন নামে এক আমেরিকানের একটা স্টিমার ছিল। ব্রিটিশ ইঞ্জিন সংযোজিত ক্লেয়ারমন্ট নামের স্টিমারটি হাডসন নদীতে চলাচল করত। প্রথম সমুদ্রগামী বাষ্পচালিত জাহাজটিও ছিল আমেরিকান, যা নিউ ইয়র্ক থেকে

www.nagorikpathagar.org

ফিলাডেলফিয়া পর্যন্ত যাতায়াত করত। আর প্রথম যে বাষ্পীয় পোত আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেয় (১৮১৯) সেই সাভানা জাহাজটিও ছিল আমেরিকান। এসব জাহাজই ছিল প্যাডল-হুইল জাহাজ, যা গভীর সমুদ্রে চলাচলে তেমন উপযুক্ত ছিল না। প্যাডলগুলি সহজেই ভেঙে যেত আর জাহাজও অকেজো হয়ে পড়ত। এরপর চালু হলো স্ক্রু-স্টিমশিপ। প্রকৃত কার্যকরী স্ক্রু পদ্ধতি চালুর পূর্বে অনেক অসুবিধা দূর করতে হয়। শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে বৃহৎ মালবাহী জাহাজ প্রচলিত হয়নি। এরপর সমুদ্র পরিবহন দ্রুততর হতে থাকে। প্রথমবারের মতো মানুষ সুনিশ্চিত হতে পারে কখন তাদের জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছবে।

স্থল ও জলপথে বাষ্পীয় পরিবহন ছাড়াও এসময় ভোল্টা, ফ্যারাডে ও গ্যালভানির তৎপরতায় বিদ্যুতের ব্যবহার সুনিশ্চিত হওয়ায় মানুষের মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৩৫ সালে প্রচলিত হয় বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ। ১৮৫১ সালে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সমুদ্রতলদেশীয় ক্যাবল সংযোগ স্থাপিত হয়। আর কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা সভ্য পৃথিবীব্যাপী টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ফলে বিশ্বব্যাপী সংবাদ আদান-প্রদান ত্বরান্বিত হয়।

এসব জিনিস, স্টিম রেলপথ, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ বিস্ময়কর আবিষ্কার হলেও এসবকে বলা যায় সুদূরপ্রসারী অগ্রযাত্রার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। প্রযুক্তি-জ্ঞান ও কুশলতা বিকাশ লাভ করছিল অসাধারণ দ্রুতগতিতে এবং পূর্ববর্তী যে কোনো যুগের চেয়ে তা ছিল অপরিমেয়। প্রথম দিকে প্রাত্যহিক জীবনে এর প্রয়োগ অল্পই পরিলক্ষিত হয়, তবে কাঠামোগত উপকরণের দিক থেকে মানুষের সক্ষমতা বিপুলভাবে প্রসারিত হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আকরিক থেকে লোহা আহরণ করা হতো কাঠকয়লা পুড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা আকারে এবং আকৃতি দেওয়া হতো হাতুড়ি পিটিয়ে। গুণগত মান অনেকটাই নির্ভর করত কারিগরদের কুশলতার ওপর। অষ্টাদশ শতকে শুরু হলো ব্লাস্ট ফারনেস ও কাঠ কয়লার ব্যবহার। নাস্মিথের স্টিম হাতুড়ি প্রচলিত হয় অনেক পরে ১৮৩৮ সালে।

প্রাচীন পৃথিবীতে ধাতুবিজ্ঞানের জ্ঞানে স্বল্পতার কারণে স্টিমশক্তি ব্যবহার করা যায়নি। শিট আয়রনের আবিষ্কারের পূর্বে স্টিম ইঞ্জিন, এমনকি পাম্প ইঞ্জিনও কাজে লাগানো যায়নি। অনেক পরে ১৮৫৬ সালে বিসেমার পদ্ধতি নাগালের মধ্যে আসে এবং খোলা চুল্লি পদ্ধতিতে লোহা গলানো, শুদ্ধিকরণ এবং ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়। আজকাল দেখা যায় ইলেকট্রিক ফার্নেসে লোহা গলানো হচ্ছে যেন কড়াইতে দুধ জ্বাল দেওয়া চলছে। রেলপথ ও প্রাথমিক ইঞ্জিন আধুনিক ধাতু বিজ্ঞানের প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। শিগগিরই দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটল লৌহনির্মিত বিশাল বিশাল জাহাজ, সেতু, এবং দালানকোঠায় বিপুল পরিমাণ লোহা ব্যবহার করা হলো। আরো প্রশস্ততর রেলপথ তৈরি হলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ২০০০ টনের বেশি জাহাজ তৈরি হয়নি; তবে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ইতিমধ্যে ৫০,০০০ টনের জাহাজ চলাচল শুরু করেছে। অনেকে

www.nagorikpathagar.org

নাসিকা কুঞ্চিত করে যে এই বৃদ্ধি শুধু আকারগত, তবে এটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এটা কেবলমাত্র আগের জাহাজের বৃহৎ সংস্করণ নয়, এটা প্রকৃতিগতভাবেই স্বতন্ত্র, হালকা অথচ দৃঢ়ভাবে নির্মিত, যাতে রয়েছে সূক্ষ্ম ও জটিল হিসাব-নিকাশ।

ধাতুবিদ্যা ও ইস্পাত নিয়ে এতক্ষণ যা বলা হলো, তা শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ, তামা, টিন ও অন্যান্য ধাতু যেমন নিকেল ও টিন সম্বন্ধেও বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যার কোনো ব্যবহার ছিল না। মানুষ দক্ষতা অর্জন করল বিভিন্ন ধরনের কাচ, পাথর, প্লাস্টার, রঙ, বুনট, ব্যাপারে; আর এভাবেই মানুষ এগিয়ে চলল যান্ত্রিক বিপ্লবে। তবু বলা যায় আমরা এখনও রয়ে গেছি প্রাথমিক পর্যায়ে। ক্ষমতা আমাদের করায়ত্ত, তবে সেই ক্ষমতা কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে শিক্ষা এখনও পুরোপুরি রপ্ত হয়নি। এসব অবদানের প্রথম প্রয়োগ প্রায়ই কুৎসিত চটকদার, নির্বোধ, ভয়ংকর। মানুষের অধিকারে আসা অগণিত বস্তুপুঞ্জের সঠিক, শৈল্পিক ব্যবহার এখনও শুরু হয়নি। বিদ্যুতের প্রকৃত ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকের পূর্বে শুরু হয়নি, যখন বিদ্যুতের প্রয়োগ হয় আলো জ্বলতে, শ্রমশক্তি, গতিশক্তি ও তাপশক্তিতে পরিণত করা হয়, আর তারের মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত করা, যেমন পানি বহন করা হয় পাইপের মধ্য দিয়ে।

প্রথম ব্রিটিশ ও ফরাসিরা জ্ঞানের বহুমুখীকরণে অগ্রণী ছিল। তবে শিগগিরই জার্মানরা, যারা নেপোলিয়নের দ্বারা যথেষ্ট হেনস্তা হয়, তাতে তাদের উৎসাহই বেশি পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ বিজ্ঞান বিকশিত হয় ব্রিটিশ ও স্কচদের দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে।

এ সময়ের ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাদমুখী, যেখানে মূলত লাতিন ও গ্রিক পাণ্ডিত্য কপচানো হতো। ফরাসি জ্ঞানচর্চাও জেসুইট পণ্ডিতদের কেন্দ্র করে, তাই জার্মানরা নতুন তত্ত্ব ও তথ্য সন্ধানে তাদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কাজেই গবেষণাকর্ম ও পরীক্ষা-নিরিক্ষায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশে পরিণত হচ্ছিল, সেখানে বিজ্ঞানী ও আবিষ্কর্তারা তেমন বিত্তবান হতে পারেনি। প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির সাংসারিক জ্ঞান একটু কমই থাকে। তিনি তার গবেষণা, পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নিয়ে এতই মগ্ন থাকেন যে অর্থ উপার্জনের কথা মাথায় আসে না। এসব গবেষণা কাজে লাগিয়ে ধনার্জনের ব্যাপারটা চলে রায় ধুরন্ধর ব্যক্তিদের কব্জায়। তারা সোনার ডিমপাড়া হাঁসদের অভুক্তই রেখে দেন। আবিষ্কারকরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই আসেন আর চালাকরা তা দিয়ে লাভবান হয়।

এদিক দিয়ে জার্মানরা অনেকটা বিজ্ঞতর। জার্মান শিক্ষিতরা নতুন জ্ঞানের ততটা বিরোধিতা করত না। জার্মান ব্যবসায়ী আর নির্মাতারা বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞার চোখেও দেখত না। জার্মানরা বিশ্বাস করত জ্ঞান জিনিসটি কর্ষণের ব্যাপার, এতে সার দিলে ফলন ভালো পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে নতুন এক ধরনের ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হলো যাতে বিস্ফোরণ শক্তিকে কাজে লাগানো হলো। এভাবেই হাল্কা অথচ শক্তিশালী ইঞ্জিন যুক্ত

www.nagorikpathagar.org

হলো অটোমোবাইলে আর শেষ পর্যন্ত সেটাই বিকশিত হয়ে উড্ডয়নের কাজে ব্যবহৃত হলো যা মানবজাতির ইতিহাসে এক বিশাল অর্জন। একটা উড্ডয়নযন্ত্র যদিও তা মানবশরীর বহনোপযোগী ছিল না আবিষ্কার করেন আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ল্যাংগলী ১৮৯৭ সালে। ১৯০৯ সালের মধ্যেই এরোপ্লেনকে মানব পরিবহনোপযোগী করে ফেলা হয়। বিমান আবিষ্কারের সাথে সাথে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেল। অষ্টাদশ শতকে লন্ডন থেকে এডিনবরার ভ্রমণকাল ছিল আট দিন। আর ১৯১৮ সালে সেই আট দিনে পৃথিবীর অর্ধেক দূরত্ব লন্ডন থেকে মেলবোর্নে যাওয়া সম্ভব হলো।

ভ্রমণকালের দূরত্ব হ্রাসের ওপর বেশি গুরত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের সামনে যত সম্ভাবনা রয়েছে, দূরত্ব হ্রাস তার একটা বাতায়ন মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি রসায়ন ঊনবিংশ শতকে সমানতালে এগিয়ে যায়। সপ্তদশ শতকে সমপরিমাণ জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হতো, রাসায়নিক সার প্রয়োগে সেই পরিমাণ জমি থেকে চতুর্গুণ ফসল উৎপাদন সম্ভব হলো। মানুষের জীবৎকাল বৃদ্ধি পেল, প্রাত্যহিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানি হ্রাস পেল।

মানুষের জীবনে এত পরিবর্তন এলো, যেন এটা মানবেতিহাসের এক নতুন পর্যায়। এক শতাব্দীর সামান্য কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই এই বিশাল বিপ্লব ঘটে গেল। জড়জগতে মানুষের এই বিশাল পদক্ষেপ পুরানো প্রস্তর যুগ থেকে কৃষিযুগ শুরু পর্যন্ত বা মিশরের পেপির আমল থেকে ইংল্যান্ডের তৃতীয় জর্জের আমলের অগ্রগতির চেয়েও বিপুলতর। বস্তুজগতে মানুষের করায়ত্ত হলো এক দৈত্যাকার অবকাঠামো। এর ফলে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। তবে আজ পর্যন্ত তা শুধু প্রারম্ভিক পর্যায়েই রয়ে গেছে।

৫৮. শিল্পবিপ্লব

অনেক ইতিহাসবিদের মধ্যেই একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে আর তা হলো যান্ত্রিক বিপ্লব, যা প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত বিজ্ঞানের অবদান, অন্যদিকে শিল্পবিপ্লব যাকে বলা যায় মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, দুটি ব্যাপারেই পাশাপাশি চলছিল আর পরস্পরের ওপর প্রভাব ফেলছিল, তবে মূল ও নির্যাসের দিক থেকে তারা ছিল পৃথক। যদি কয়লা না থাকত, বাষ্প না থাকত এমনকি যন্ত্রপাতিও না থাকত, তা হলেও হয়তো একধরনের শিল্পবিপ্লব ঘটত, তবে তা হত রোম সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যের মতো অর্থনৈতিক অগ্রগতি। কারখানা ব্যবস্থাটা কিন্তু যন্ত্র আবিষ্কারের আগেই ঘটেছিল। ফ্যাক্টরি জিনিসটি যন্ত্রের ফসল নয়, বরং তা শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে ঘটেছিল। অগাস্টাসের আমলেও রোমে ফ্যাক্টরি ছিল, এতে বই

www.nagorikpathagar.org

বিক্রেতারা সারি সারি লেখক বসিয়ে দিয়ে লেখার কাজ সম্পন্ন করত। ডিফো বা ফিল্ডিং-এর মনোযোগী পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই দরিদ্র মানুষদের একসাথে কাজে লাগিয়ে দেওয়ার প্রথা ব্রিটেনে ছিল। এমনকি মোরের ইউটোপিয়াতেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় (১৫১৬)। এটা ছিল সামাজিক বিকাশ, যান্ত্রিক নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খ্রিষ্টপূর্ব শেষ তিনটি শতকে রোমান সাম্রাজ্যের মতোই চলছিল। তবে ইউরোপের রাজনৈতিক অনৈক্য, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান আর বিশেষ করে ইউরোপীয় জনমনে যান্ত্রিক আবিষ্কারের ধারা; গতিধারাকে সম্পূর্ণ নতুন এক মোড় এনে দেয়।

যান্ত্রিক বিপ্লব, যান্ত্রিক আবিষ্কারসমূহ, মানব অভিজ্ঞতার এক নতুন পর্যায়, আর এটা এগিয়ে চলেছিল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিল্পক্ষেত্রে এর কী প্রতিক্রিয়া হবে তা বিবেচনা না করেই। যান্ত্রিক বিপ্লব মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন এনেছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বৃহৎ পুঁজির সমাবেশ ঘটায় শ্রমের ধারাও বদলে গিয়েছিল, প্রাচীন পৃথিবীর শক্তি ছিল মানবশক্তি, সব কিছু নির্ভর করত পেশিশক্তি সঞ্চালনের ওপর, অজ্ঞ ও অবদমিত মানুষের পেশিশক্তি। এর সাথে যোগ হয়েছিল কিছু পশুশক্তি যেমন ষাঁড়, ঘোড়া ইত্যাদি। প্রাচীন সভ্যতায় বিপুলসংখ্যক মানুষ যন্ত্রের মতো একঘেয়ে খাটুনিতে নিরন্তর নিয়োজিত হতো খাল খননে, রেলপথ নির্মাণে, বাঁধ তৈরি ইত্যাদি ব্যাপারে, খনিতেও নিয়োজিত থাকত বিশাল শ্রমিক বহর। তবে সুযোগ-সুবিধা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দী এগিয়ে চলার সাথে সাথে পরিস্থিতিও বদলাতে থাকে। অগোছালো মানবশক্তি আর কাজে আসছিল না। মানুষ যা সম্পন্ন করত নেহাত পেশিশক্তি দিয়ে, তাই এখন হতে থাকে যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুততর ও উন্নততরভাবে। মানুষের প্রয়োজন রইল শুধু বাছাই করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে। পেশিশক্তির সাথে যোগ হলো বুদ্ধিবৃত্তির। প্রাচীন শিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে, যেমন কৃষি ও খনি, যেহেতু নতুন নতুন ধাতু বিদ্যা প্রযুক্ত হলো। রোমান সভ্যতায় সস্তা ও অবদমিত মানবশক্তি ব্যবহৃত হতো, আর আধুনিক সভ্যতা গড়ে উঠল সস্তা যন্ত্রশক্তির সহায়তায়। জনশক্তির চেয়ে যন্ত্রশক্তি সহজলভ্য হয়ে উঠল।

মানবিক ব্যাপারে একটা প্রাথমিক পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। ঊনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগমনের সাথে সাধারণ মানুষ একঘেয়ে শ্রমজীবীর চেয়ে কিছু বেশি মর্যাদার অধিকারী হলো। তাকে হতে হবে শিক্ষিত, যাতে শিল্পকারখানায় দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। তাকে বুঝতে হবে তার কাজ কী। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম দিক থেকেই ইউরোপে শিক্ষার আলো ধীরে ধীরে জলতে থাকে, এশিয়ায় যেমনটা জ্বলে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে, কারণ এতে ধর্ম সম্পর্কে সে কিছুটা পড়াশোনা করতে পারবে ও জ্ঞানলাভ করবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি হতে থাকে। তবে উচ্চবর্গের মধ্যে সেই অনুপাতে অগ্রগতি হয়নি, কাজেই ইতিপূর্বে শিক্ষার যে বিশাল বৈষম্য বিরাজিত ছিল তা

www.nagorikpathagar.org

অনেকটাই হ্রাস পায়। এর পিছনে ছিল যান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ, যার ফলে বিশ্বব্যাপী নিরক্ষর মানুষের হার কমতে থাকে।

রোম রিপাবলিকের অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করতে পারেনি। রোমের সাধারণ মানুষ যে সমাজে বাস করত তা ছিল অচলায়তন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্পবিপ্লব, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করেছিল, কারণ তারা পড়তে, আলোচনা করতে এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারত, যা ইতিপূর্বে কখনোই সম্ভব ছিল না।

৫৯. আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণার বিকাশ

প্রাচীন পৃথিবীর প্রতিষ্ঠান, প্রথা ও রাজনৈতিক ধারণা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করছিল, যা কোনো মানুষের একক পরিকল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। মানবজাতির বয়ঃসন্ধি যুগ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মানুষ পরস্পরের সম্পর্কে অনুধাবন করতে শিখল, মানব প্রশাসনের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস পুনঃসংস্থান হতে শুরু করল।

আমরা গ্রিস ও আলেকজান্দ্রিয়ার গৌরবময় বৌদ্ধিক ঊষাকালের কথা আলোচনা করেছি, আর কীভাবেই বা কৃতদাস নির্ভর সভ্যতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক একাধিপত্য সেই ঊষার আলোকে আচ্ছন্ন করল। আরবীয় কৌতূহলের বিরাট ঝড় আর মঙ্গোল অভিযান ইউরোপীয় মানসিকতায় কতটা প্রভাব ফেলেছিল, তা আমরা লক্ষ করেছি। প্রথম দিকে এই জ্ঞান ছিল পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক মানবিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি ও শিক্ষা বিষয়গুলি বেশ সূক্ষ্ম এবং এসব ব্যাপারে অগ্রগতি বেশ ধীর ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে চলছিল।

ঠিক গ্রিসে যেমন অ্যারিস্টটলের বাস্তব অনুসন্ধানের পূর্বেই এসেছিল প্লেটোর সাহসী কাল্পনিক ভাবনা সেভাবেই ইউরোপে নতুন রাজনৈতিক অনুসন্ধান এসেছিল ইউরোপীয় ভাব ধারায় যা *প্লেটোর রিপাবলিকের* প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রভাবিত হয়। স্যার টমাস মোরের *ইউটোপিয়া* ছিল প্লেটোর কৌতূহলোদ্দীপক অনুকরণ, যা দুর্বল ইংরেজ আইনব্যবস্থাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল। নিয়াপলিটান ক্যাপানেলার *সিটি অব দ্য সান* ছিল অনেক বেশি অদ্ভুতুড়ে, কম ফলপ্রসূ।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বেশ কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক সাহিত্যকর্ম প্রণীত হতে দেখা যায়। তার মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন জন লক যিনি ছিলেন এক ইংরেজ রিপাবলিকানের পুত্র, ছিলেন অক্সফোর্ডের এক বিশিষ্ট পণ্ডিত, যিনি প্রথম দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের দিকে। সরকার সম্বন্ধে তার গ্রন্থে সামাজিক পুনর্গঠনের সম্ভাবনার কথা বলা হয়। জন লকের সমান্তরাল প্রায় সমসাময়িক ফ্রান্সের মঁতেস্কু সামাজিক রাজনতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তার

www.nagorikpathagar.org

মৌলিক পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেন। ফ্রান্সে নিরংকুশ রাজতন্ত্রের ছদ্মবেশ তিনি টেনে খুলে ফেলন। জন লকের সাথে তিনিও অনেক ভুল ধারণার ওপর আলোকপাত করেন, যা মানব সমাজ পুনর্গঠনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে তাদের নৈতিক ও বৌদ্ধিক ধারণা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে যায়, একদল বুদ্ধিদীপ্ত লেখক যারা ছিলেন এনসাইক্লোপেডিয়ার লেখক, জেসুইট সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী শক্তি, নতুন এক পৃথিবী নির্মাণে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তাদের পাশাপাশি আর এক দল অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক যারা উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ে গবেষণায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। *কোড ডিলা নেচার* গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারকে অনৈতিক আখ্যা দেন এবং সমাজতাত্ত্বিকভাবে সমাজ গঠনের পরামর্শ দেন। যিনি ছিলেন পরবর্তী ঊনবিংশ শতাব্দীর একগুচ্ছ সমাজতান্ত্রিক চিন্তকের পূর্বসূরি।

সমাজতন্ত্র কী? সমাজতন্ত্রের শত শত সংজ্ঞা আছে আর আছে হাজার হাজার শ্রেণিগোত্র। মূলত সমাজতন্ত্রে সাধারণের উপযোগী সম্পদ ব্যক্তির অধিকারে থাকবে না, এটাই সমাজতন্ত্রের সার কথা। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ ধারণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা দিতে পারি। সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতা এই দুই ধারণাকে কেন্দ্র করেই আমাদের রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হচ্ছে।

মানবজাতির যুদ্ধংদেহী প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি থেকেই সম্পত্তি ধারণাটির জন্ম। প্রাগৈতিহাসিক সম্পত্তি বোঝাতে জন্তু জানোয়াররা যেমন নিজের অধিকার বজায় রাখত, তেমনটাই। কুকুর আর তার হাড্ডি, বাঘ আর তার শিকার, সম্পত্তির অধিকার তেমনটাই। প্রাচীনকালে কম্যুনিজমের মতো নির্বোধ শব্দ আর নেই। প্রাচীন প্রস্তর যুদ্ধের মানুষ তার স্ত্রী ও কন্যাদের ওপর অধিকার ফলাত, তার অস্ত্র ও দৃশ্যমান জগতের দাবিদারও ছিল। তার দৃশ্যমান জগতে অন্য কোনো মানুষ অনধিকার প্রবেশ করলে সে তার সাথে যুদ্ধ করত, আর ক্ষমতায় কুলালে তাকে হত্যাও করত। কালক্রমে গোত্রের আকার বৃদ্ধি পেল। অ্যাটকিনসন তার *প্রাচীন আইন* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষ তার অপেক্ষাকৃত যুব শ্রেণীর প্রতি সহনশীল হতে শুরু করল, আর গোত্রের বাইরে থেকে নিয়ে আসা তাদের স্ত্রীদের প্রতিও সহনশীল হলো। যেসব যন্ত্র, অলংকার যা তারা তৈরি করে আর যেসব শিকার করে তাতেও তাদের অধিকার মেনে নেয়। সম্পত্তির আপসরফার ভিত্তিতেই মানব সমাজ গড়ে ওঠে। যদি পাহাড়, জঙ্গল, নদী *তোমার* বা *আমার* না হয়, তাহলে সে সব আমাদের সম্পত্তি, আমরা প্রত্যেকে জমিকে আমার করে নিতে চাই, তবে তা কোনো কাজে আসে না। সেক্ষেত্রে অন্যেরা আমাদের ধ্বংস করে ফেলত। প্রথম থেকেই সমাজ বলতে বোঝাত মালিকানার আপসরফা। পশু ও আদিম বর্বরদের মধ্যে মালিকানা বিষয়টি আজকের সভ্য মানুষের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রতর ছিল। এর মূল দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল যতটা না যুক্তির ওপর, তার চেয়ে বেশি সহজাত প্রবৃত্তির ওপর।

www.nagorikpathagar.org

মালিকানার ক্ষেত্রে আদিম, বর্বর ও আধুনিক অপরিশীলিত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। তুমি যা লড়াই করে জিতে নিতে পারবে তা-ই তোমার; সেটা মেয়ে মানুষই হোক যুদ্ধ বন্দিই হোক, আটককৃত জন্তু জানোয়ার, বনজঙ্গল, পাহাড়ের গুহা যাই হোক না কেন? সম্প্রদায়ের আকার বৃদ্ধির সাথে অন্তর্ঘাতী সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু নিয়মকানুন প্রবর্তন হলো। মানব সমাজে কিছু অমসৃণ তাৎক্ষণিক আইনের উদ্ভব ঘটল মানুষের সম্পত্তির মালিকানা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। যে মানুষ প্রথম যেটা দখল করে বা দাবি করে সেটা তার হয়ে যায়। এটা খুব স্বাভাবিক মনে হতো ঋণগ্রহীতা যদি দাতার অর্থ পরিশোধ করতে না পারত, তবে সে দাতার সম্পত্তিতে পরিণত হতো। এটাও স্বাভাবিক ছিল একখণ্ড জমি দখলের পর যদি অন্য কেউ সেটা ব্যবহার করতে চাইত, তবে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট থেকে তার দখল স্বত্বের মূল্য দাবি করতে পারত। তবে ধীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। রোমান রিপাবলিকে এ ধারণার বিকাশ ঘটতে থাকে, সে নিয়ন্ত্রিত সম্পত্তির অধিকার অসুবিধার সৃষ্টি করে। কাজেই এটা পরিহার করা উচিত। আমরা দেখেছি পরবর্তী সময়ে ব্যাবিলনীয়ায় কৃতদাসদের বেলায় সম্পত্তির অধিকার সীমিত করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মহান বিপ্লবী নাজারেথের যিশুর শিক্ষায় সম্পত্তির অধিকারের ওপর যে আঘাত হানা হয়, ইতিপূর্বে তার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি বলেছিলেন সূঁচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উটের গলিয়ে যাওয়া যতটা সহজ একজন বিত্তশালীর স্বর্গে প্রবেশাধিকার ততটা সহজ নয়। গত পঁচিশ বা ত্রিশ শতাব্দীব্যাপী সম্পত্তির অধিকারের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর সমালোচনা হয়েছে।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি ব্যাপারটা শুধু আলোচনা সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কোনো কিছুই স্বচ্ছভাবে সামনে আসেনি, নিষ্পত্তি হওয়া তো দূরের কথা। প্রাথমিক যে প্রবণতা তা হলো রাজা ও অভিজাতদের থাবা থেকে সাধারণের সম্পত্তির অধিকার বাঁচিয়ে রাখা। ফরাসি বিপ্লবের শুরু সম্পত্তির ওপর করের বিপুল বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে। তবে তা সম্পত্তিতে সাম্যের পরিবর্তে সম্পত্তির অধিকার বিচ্যুতিতে পর্যবসিত হয়। মানুষ কীভাবে স্বাধীন হতে পারে, সমানাধিকার পেতে পারে, যখন অনেকেরই দাঁড়াবার ঠাঁই নেই, পেটে দেওয়ার মতো খাদ্য নেই, আর তারা যদি পরিশ্রম না করে তাহলে মালিকেরা মাথা গোঁজার ঠাঁই, একমুঠো খাবার দেবে না, দরিদ্ররা চিরকাল শুধু অভিযোগ করেই যাবে।

এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শ্রেণী এই ধাঁধার উত্তরে বেছে নিয়েছে বিভক্তিকরণ, তারা চান সম্পত্তির নিবিড়করণ ও সার্বিকীকরণ। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আদি সমাজতান্ত্রিকরা অন্য একটা পথের সন্ধান দেয়, তারা চায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ, তবে এই কূটাভাসের উত্তর নিহিত আছে এই তত্ত্বে যে মালিকানা কেবল একটা বিষয় নয়, অনেকগুলি বিষয়ের সমাহার।

ঊনবিংশ শতকের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ বুঝতে শিখেছে সম্পত্তি ব্যাপারটা একটা মাত্র সরল উপাত্ত নয়, অনেকগুলি মূল্যবোধের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জটিল সমাবেশ, যার মধ্যে অনেক কিছুই রয়েছে– যেমন রেলওয়ে, মেশিনপত্র, বাড়িঘর, কর্ষিত বাগান,

www.nagorikpathagar.org

প্রমোদতরী ইত্যাদি, যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করতে হবে কতটুকু ব্যক্তিমালিকানায় থাকতে পারে, আর কতটুকুই বা সর্বসাধারণের বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে এসব বিষয় রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত হতে পারে, এবং এসবের নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। সম্পত্তির সমালোচনা আজও বেশ আবেগঘন ব্যাপার, যা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত নয়। একদিকে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যারা ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তি অধিকারকে সুরক্ষিত, অন্যদিকে রয়েছে সমাজতন্ত্রবাদীরা সরকারকে কর দেওয়ার বিরোধী, অন্য দিকে কট্টর সমাজতন্ত্রীরা সম্পত্তিতে কোনোরকম ব্যক্তি অধিকার মানতে চায় না। আজকের সাধারণ সমাজতন্ত্রীরা যৌথ মালিকানায় বিশ্বাসী, যারা বেশ কিছু ব্যক্তিমালিকানা ছাড় দিতে চায়, তবে শিক্ষা, পরিবহন, খনি ভূমির মালিকানা, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন ব্যবস্থা সুসংগঠিত সরকারের পরিচালনায় রাখতে চায়।

তবে আজকের দিনের স্বার্থপর নিয়োগদাতা ও শ্রমবিমুখ কর্মজীবীদের টানাপড়েনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র বেশ কঠোর মনোভাবাপন্ন করে তোলা হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে মার্কসবাদ। মার্কস এই বিশ্বাসের ওপর তার তত্ত্বের ভিত গেড়েছিলেন যে মানুষের মন সীমাবদ্ধ থাকে অর্থনৈতিক অপরিহার্যতার দ্বারা আর আজকের সভ্যতায় সমৃদ্ধ নিয়োগদাতা ও অভাবী কর্মজীবী শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্বও অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। আর আধুনিক যন্ত্রবিপ্লবের যুগে শিক্ষালাভের আবশ্যিকতা অনুভূত হওয়াতে মাধ্যমে শ্রেণী সচেতনতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শ্রেণী সচেতন এই শ্রমজীবীরা যে করেই হোক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে, আর নতুন এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা করবে। সক্রিয় বিরোধিতা, বিদ্রোহ, সম্ভাব্য বিপ্লব, এসবই যথেষ্ট বোধগম্য বিষয়, তবে এর ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা না হয়ে সমাজ বিধ্বংসী ঘটনার সূচনা হতে পারে।

মার্কস চেয়েছিলেন জাতীয় বিরোধের স্থলে শ্রেণী বিরোধকে প্রতিস্থাপিত করতে। মার্কসবাদ সৃষ্টি করেছে পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (Workers International)। মহান স্কটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ থেকে শুরু করে ক্রমবর্ধিতভাবে উপলব্ধি হচ্ছে যে বিশ্বব্যাপী মুক্ত ও অবাধ বাণিজ্য প্রচলন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এটা নিরীক্ষণ করা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে দুটি বিপরীত ধারা এক দিকে মার্কসের সমাজতান্ত্রিক শ্রেণিসংগ্রাম আর অপর দিকে ভিক্টোরীয় যুগের ব্রিটিশমুক্ত ব্যবসায়িক দর্শন, যা প্রসারিত হবে রাষ্ট্রসীমানার সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে। বাস্তবতার যুক্তি সর্বদাই তাত্ত্বিক যুক্তিকে অতিক্রম করে যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করতে শুরু করি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্র একই তত্ত্বানুসন্ধানের দুটি অংশ আর তাহলো প্রশস্ততর এক সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণা ও তার রূপায়ণ, যাতে করে মানুষ এক সাথে কাজ করার প্রণোদনা লাভ করতে পারে, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও খ্রিষ্টবাদের অবক্ষয়ের সাথে সাথে ইউরোপে যার সূত্রপাত হয় এবং ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে, যা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে গোটা মানবজাতি একটা সম্প্রদায়রূপে গড়ে উঠছিল, আর তার সাথে একটা বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা অনুভূত হচ্ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজ সমগ্র গ্রহটি এক অখণ্ড অর্থনৈতিক সম্প্রদায়, আর প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস। আজকের দিনে যেসব বিচ্ছিন্ন প্রয়াস চলছে তার অধিকাংশই শক্তির অপচয় মাত্র। আর্থিক কৌশলসমূহ বৈশ্বিক মাত্রায় সমাধানেও অধিকতর সাফল্যের সম্ভাবনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যাপক দেশান্তর এবং ফলে সংক্রামক রোগের বিস্তারও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের অধিকতর ক্ষমতায়ন ও জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি করে দেয়। এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপকতর ভিত্তি নির্মাণের চিন্তাও বলবৎ ছিল।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, পরাশক্তিধর কোনো রাজশক্তি বিজয়ের মাধ্যমে ও জোটগঠনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সাদৃশ্য কল্পনায় মানুষ বিশ্ব-সংসদ বা বিশ্ব কংগ্রেসের মতো কোনো কিছুর চিন্তা করেছে। আর সেই সাথে গোটা বিশ্বের একজন প্রেসিডেন্ট বা রাজা। তবে গত অর্ধ শতাব্দীর পরামর্শ বা আলাপ আলোচনায় এমন ধারণা নিরুৎসাহিতই হয়েছে বেশি। বিশ্ব ঐক্যের প্রতিরোধ শক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী। তবে প্রবণতা দেখা দিয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কমিটি বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা, যা বৈশ্বিক ব্যাপারসমূহের মীমাংসা করা, যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশ ঘটানো ও অপচয় রোধ, শ্রমবৈষম্য দূরীকরণ, বিশ্বশান্তি নিশ্চিতকরণ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি।

মানুষ চায় সাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি সমন্বিতভাবে সমাধান হবে; তবে এ পর্যন্ত বিশ্বসরকারের স্বপ্ন সফল হয়নি। এরূপ বিশ্ব ঐক্য অর্জনের পূর্বে, দেশাত্মবোধী সন্দেহ ও ঈর্ষার ঊর্ধ্বে উঠে, বিশ্ব মানবতাবোধের মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। বৈশ্বিক ঐক্যের ধারণা শিক্ষা ও বোধের বিষয় হওয়া উচিত। তবে আজকের পৃথিবীতে, গোষ্ঠীতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ও অবিশ্বাস মানবজাতির একজোট হয়ে কাজ করার প্রেরণাকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ মানব মনে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করছে, যেমন ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ইউরোপীয় মানসিকতাকে অধিকারের চেষ্টা করেছিল। এই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের সঞ্চার করার জন্য প্রয়োজন কিছু আত্মনিবেদিত মিশনারির।

৬০. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণ

পরিবহনব্যবস্থায় নতুন নতুন আবিষ্কারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধাগ্রহণ করেছিল উত্তর আমেরিকা। রাজনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র মধ্য অষ্টাদশ শতকের উদারনৈতিক সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে গির্জার ভূমিকা বাদ দিতে

www.nagorikpathagar.org

পেরেছিল এবং জমির ভোগদখলে ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল। প্রথম দিকে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পৃথক পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তবে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছিল। ভোটদান পদ্ধতি অবশ্য ছিল খুবই অমার্জিত, আদিম প্রকৃতির; যাতে তা প্রায়ই দলীয় যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এতে নব্য মুক্তিপ্রাপ্ত বিকাশমান, উদ্দীপ্ত, উদ্যোগী, গণমুখী জনসাধারণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

অতঃপর এলো গতিশীল রেলব্যবস্থা, যার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে দ্রুতগতির রেলব্যবস্থার কাছে আমেরিকার উন্নতি অনেকটা ঋণী হলেও তারা সেটার মূল্যায়ন করেনি। যুক্তরাষ্ট্র রেলপথ, বাষ্পচালিত স্টিমার, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদিকে গ্রহণ করেছে যেন এগুলি তাদের অগ্রগতির স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। আসলে তা নয়। আমেরিকার ঐক্য টিকিয়ে রাখতে সঠিক সময়ে অপরিহার্যরূপেই এগুলি এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে প্রথমে স্টিমবোট, তারপর রেলওয়ে। এগুলি ছাড়া বিশাল যুক্তরাষ্ট্রকে ধরে রাখা মোটেই সম্ভব ছিল না। জনসমষ্টির পশ্চিম দিকে অগ্রসর হত অনেক ধীরগতিতে। হয়তো মধ্যাঞ্চলের বিশাল সমভূমি কোনো দিনই অতিক্রম করতে পারত না। মিসৌরী উপকূল পর্যন্ত জনবসতি বিস্তারে যে ২০০ বছর লেগেছে, হয়তো তার অর্ধেক পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। নদী অতিক্রম করে মিসৌরী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২১ সালে। তবে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সময় লাগে মাত্র কয়েক দশক। সে সময় যদি সিনেমার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে ১৬০০ সাল থেকে শুরু করে উত্তর আমেরিকার মানচিত্রের প্রতি সালের মানচিত্র দেখাতে পারতাম, প্রতি ১০০ জনের জন্য একটা করে ডট বসালেই কাজ চলত, আর এক লাখ লোকের শহরের জন্য একটা করে তারকা চিহ্ন। পাঠকরা দেখতে পেত ফুটকিগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে উপকূলীয় অঞ্চল আর নৌপরিবহন যোগ্য নদীপথ ধরে, যেমন ইন্ডিয়ানা, কেন্টাকী ইত্যাদি। তারপর ১৮১০ সালের দিকে এসে দেখা যাবে এক বিরাট পরিবর্তন। নদী অববাহিকার দৃশ্য অধিকতর প্রাণচঞ্চল। ফুটকিগুলির সংখ্যাধিক্য আর বিস্তৃতি ঘটছে। এটা সম্ভব হচ্ছে নদীপথে স্টিমবোটের সাহায্যে।

১৮৩০ সালের পর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে রেলপথের কৃষ্ণরেখা! এরপর ডটগুলি আর গুঁড়ি মেরে চলছে না, রীতিমতো দৌড় শুরু করেছে। মনে হয় যে ডটগুলি কোনো স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ছড়ানো হচ্ছে। আর মাঝে মধ্যেই দৃষ্টি গোচর হবে তারকাচিহ্নের অর্থাৎ এক লাখ লোকবসতির শহর। প্রথম একটি দুটি– তারপর অসংখ্য রেলরেখার ওপর গ্রন্থির আকারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা, এক বিরল ব্যাপার। ইতিপূর্বে এরূপ এক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব দৃষ্টিগোচর হয় না, আর রেলওয়ের অস্তিত্ব না থাকলে অনেক আগেই এটা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। রেলওয়ে বা টেলিগ্রাফ না থাকলে পিকিং থেকে ক্যালিফোর্নিয়া শাসন করা যতটা সম্ভব, ওয়াশিংটন থেকে

www.nagorikpathagar.org

ততটা সম্ভব ছিল না। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এই মহান জনগণের সম্প্রসারণ নির্মমতার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি, এটা হয়েছে সমন্বয়ের মাধ্যমে। এক শতাব্দী পূর্বে ভার্জিনিয়ার একজন লোক যতটা না নিউ ইংল্যান্ডের লোকের সদৃশ ছিল, সানফ্রান্সিসকোর একজন লোক নিউ ইয়র্কের লোকের আরো বেশি কাছাকাছি। আর সদৃশীকরণের এ পদ্ধতি অবাধে এগিয়ে চলেছিল। সাথে সাথে কথা বলা, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটছিল, আকাশযান এই বন্ধনকে আজও দৃঢ়তর করে চলেছে।

ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন একটা বিষয় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ইতিপূর্বেও বৃহৎ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, যার লোকসংখ্যা ১০০,০০০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তবে এগুলি ছিল ভিন্ন ভাবধারার জনসমষ্টি, একক জনসমষ্টির এত বড় দেশ এর আগে কখনোই ছিল না। এই নতুন বিষয়টির একটা নতুন নামকরণ প্রয়োজন। আমরা এই দেশকে বলি যুক্তরাষ্ট্র, যেমন ফ্রান্স বা হল্যান্ডকে বলি দেশ। তবে দুটি জিনিস এতটাই আলাদা যেমন আলাদা যন্ত্রচালিত শকট আর ঘোড়ার গাড়ি। এরা ভিন্ন সময়ে ভিন্ন অবস্থায় সৃষ্ট। তারা এগিয়েছে ভিন্নগতিতে, ভিন্ন মুখে, মাত্রা ও সম্ভাবনার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে তুলনা করা যায় সমগ্র পৃথিবীর সম্মিলিত এক রাষ্ট্রের সাথে ইউরোপের যে কোনো এক রাষ্ট্রের।

তবে বর্তমানের এই মহৎ নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর পথে আমেরিকানদের মস্ত বড় সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। নদীতে স্টিমবোট, রেলপথ, টেলিগ্রাম আর এগুলির প্রাপ্ত সুবিধা উত্তর ও দক্ষিণের সংঘাত থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, দক্ষিণের রাজ্যগুলি ছিল কৃতদাস নির্ভর, আর উত্তরের রাজ্যগুলির মানুষ ছিল স্বাধীন। স্টীমবোট আর রেলপথের সহজ যোগাযোগ এ সংঘাতকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। পরিবহনের নতুন অনুষঙ্গ ভূখণ্ড সম্প্রসারণের সাথে এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় দক্ষিণের ধারণা টিকে থাকবে, না উত্তরের। আপসের সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। উত্তরের চিন্তা-চেতনা ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে; আর দক্ষিণে গড়ে উঠেছিল বড় বড় জোতদার যারা ভূমিদাসদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

বর্ধিত জনসংখ্যা যতই পশ্চিমে অগ্রসর হচ্ছিল আর নতুন নতুন ভূভাগ মিলে এক একটা রাজ্যের গোড়াপত্তন হচ্ছিল, দুটি ধারণার মধ্যে মতবিরোধ তীব্রতর হচ্ছিল, এটা কি স্বাধীন মানুষের রাজ্য হবে নাকি কৃতদাস নির্ভর জনপদ। ১৮৩৩ সালে গঠিত একটা কৃতদাস বিরোধী সংগঠন প্রচার করেই ক্ষান্ত ছিল তাই না, তারা কৃতদাস প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। টেক্সাসকে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না– এই নিয়ে সংঘাতের শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। প্রথমে টেক্সাস ছিল মেক্সিকো প্রজাতন্ত্রের অংশ। তবে মূলত কৃতদাসদের কলোনি ছিল এবং মেক্সিকো থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৩৫ সালে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর তারপর ১৮৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়। মেক্সিকোর আইন অনুসারে টেক্সাসে দাস প্রথা নিষিদ্ধ ছিল, আর এখন দক্ষিণের রাজ্য হওয়ায় টেক্সাস দাসপ্রথা দাবি করল এবং তা পেল।

www.nagorikpathagar.org

১৮. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

www.nagorikpathagar.org

ইতিমধ্যে মহাসাগরীয় নৌব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় ইউরোপ থেকে দলে দলে লোক এসে উত্তর আমেরিকায় জনাধিক্য ঘটাতে থাকে, আর উত্তরের কৃষিক্ষেত্র আইওয়া, উইসকনসিন, মিনেসোটা আর অরিগন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করল আর সিনেট ও প্রতিনিধি সভায় দাসপ্রথা বিরোধী সংখ্যাধিক্য ঘটাল। তুলা উৎপাদী দক্ষিণ বিলোপবাদীদের ভয়ে ভীত হয়ে আর কংগ্রেসে তাদের সংখ্যাধিক্য আঁচ করে, ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলাবলি শুরু হলো। দক্ষিণেরা স্বপ্ন দেখাতে শুরু করল উত্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা মেক্সিকো আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে একত্র হয়ে দাসনির্ভর এক শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে।

১৮৬০ সালে সম্প্রসারণ বিরোধী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ফিরে আসায় ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষিণ স্থির করল তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সাউথ ক্যারোলিনা সম্পর্কচ্ছেদের এক অর্ডিন্যান্স পাস করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, আলাবামা, জর্জিয়া লুইসিয়ানা ও টেক্সাস তার সাথে যোগ দিয়ে এক কনভেনশন আহ্বান করে জেফারসন ডেভিসকে কনফেডারেট স্টেটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করল আর এক সংবিধানও তৈরি করল, যাতে নিগ্রো দাসপ্রথাকে বৈধতা দেওয়া হয়।

সৌভাগ্যক্রমে আব্রাহাম লিংকন ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতার পরবর্তী সবচেয়ে বিশিষ্ট মানসিকতার এক ব্যক্তি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পশ্চিম দিকে ভেসে চলা ক্ষুদ্র এক ব্যক্তি। ১৮০৯ সালে কেন্টাকিতে তার জন্ম। বাল্যাবস্থাতেই তাকে নিয়ে আসা হয় ইন্ডিয়ানা এবং তারপর ইলিনোয়ায়। জঙ্গলে ঢাকা ইন্ডিয়ানা রাজ্যে সে সময় জীবন ছিল বেশ কঠোর। তাদের বাড়িটা ছিল জঙ্গলের মধ্যে কাঠের গুঁড়ির তৈরি, আর লেখাপড়া ছিল নিম্নমানের আর অনিয়মিত। তবে মা ছোটবেলায় লিখতে পড়তে শেখান, আর তিনি ছিলেন একজন ক্ষুধার্ত পাঠক, ১৭ বছর বয়সে তিনি হয়ে ওঠেন ক্রীড়ানিপুণ যুবক এবং মল্লযোদ্ধা ও দৌড়বিদ। কিছুদিনের জন্য তিনি এক দোকানে কেরানির কাজ করেন, আর এক পানোন্মাদ ব্যবসায়ীর স্টোর কিপারও ছিলেন। ১৮৩৪ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি ইলিনোয়া থেকে প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ইনিনোয়ায় কৃতদাস প্রথা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল তীব্র। কারণ ইলিনোয়া থেকে নির্বাচিত সিনেট সদস্য ডগলাস ছিলেন কৃতদাস ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ঘোর সমর্থক। ডগলাসের সামর্থ্য ও সমর্থন ছিল প্রবল আর কয়েক বছর ধরে বক্তৃতায় ও প্রচারপত্রে লিংকন তার বিরোধিতা করে আসছিলেন। লিংকন ধীরে ধীরে তার শক্তিবৃদ্ধি করছিলেন আর শেষ পর্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। তাদের চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতা রূপ নেয় ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আর ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে লিংকন প্রেসিডেন্টরূপে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার ক্ষমতা গ্রহণের সময় দক্ষিণের রাজ্যগুলি প্রায় বিচ্ছিন্নতার দ্বারপ্রান্তে, যুদ্ধের আশংকা প্রবল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফেডারেল বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ইতিমধ্যে দশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। বিশাল এলাকা নিয়ে এই যুদ্ধ, নিউ মেক্সিকো

www.nagorikpathagar.org

থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। মূল লক্ষ্যস্থল ছিল ওয়াশিংটন ও রিচমন্ড। এই বিশাল মহাকাব্যিক যুদ্ধ যা বিস্তৃত ছিল টেনেসি ভার্জিনিয়ার বনভূমি আর মিসিসিপি পর্যন্ত। ভয়ংকর হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চলেছিল। দুই পক্ষই ছিল অনড় মরিয়া; আশা পরিণত হচ্ছিল হতাশায়। মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ওয়াশিংটন কনফেডারেটদের হাতে চলে গেল। আবার ফেডারেল সৈন্যবাহিনী তাড়িয়ে চলেছিল রিচমন্ডের দিকে। কনফেডারেটরা সংখ্যাল্প ও স্বল্প সম্পদের অধিকারী হলেও তাদের ছিল জেনারেল লির মতো একজন সুদক্ষ সেনাধ্যক্ষ, অপরপক্ষে ইউনিয়নের সেনানায়করা ছিল অনেক নিম্নমানের এবং প্রায়ই সেনাপতিদের বরখাস্ত করে নতুন সেনাপতি নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল। অবশেষে শেরম্যান ও গ্র্যান্টের মতো সেনানায়কদের নেতৃত্বে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে। ১৮৬৪ এর অক্টোবরে জেনারেল শেরম্যানের নেতৃত্বে ফেডারেল বাহিনী টেনেসি, জর্জিয়া হয়ে উপকূল পর্যন্ত কনফেডারেট এলাকায় ঢুকে পড়ে। ইতিমধ্যে গ্র্যান্ট জেনারেল লিকে রিচমন্ডে আটক করে রাখেন যতক্ষণ না জেনারেল শেরম্যান সেখানে পৌঁছেন। অবশেষে ১৮৬৫ সালে অ্যাপেম্যাটক্স কোর্ট হাউসে জেনারেল লি আত্মসমর্পণ করেন। আর পরবর্তী এক মাসের মধ্যে গোটা কনফেডারেশনের সৈন্যবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে আর এভাবেই কনফেডারেশনের সমাপ্তি ঘটে।

এই চার বছরের যুদ্ধ আমেরিকার জনগণের ওপর দারুণ দৈহিক ও নৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের নীতি আমেরিকান মানসিকতার কাছে ছিল অত্যন্ত মূল্যবান, আর উত্তর, দক্ষিণের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করতে চাপ প্রয়োগ করেছিল। দুই সীমান্তের রাজ্যে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। উত্তর তাদের নীতিকে সঠিক ভাবত, তবে অনেকের কাছেই এই নীতি অভ্রান্ত ছিল না। তবে লিংকনের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। অনেক বিভ্রান্তির মধ্যেও তার মন ছিল পরিচ্ছন্ন। তিনি ছিলেন ইউনিয়নের পক্ষে। তিনি চেয়েছিলেন আমেরিকার ব্যাপক শান্তি। তিনি দাস প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তবে দাস ব্যবস্থাটা তার কাছে মুখ্য বিষয় ছিল না। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যে দুই আমেরিকার মধ্যে কোনো বিভেদ বিরাজমান না থাকে।

প্রথম দিকে যখন কংগ্রেস ও ফেডারেট সেনাধ্যক্ষরা দ্রুত দাসপ্রথার বিলুপ্তি চেয়েছিলেন, সেখানে লিংকন সংযম অবলম্বন করতে বলেন। তিনি চেয়েছিলেন রাজ্য নিজেই দাসদের মুক্তির ব্যবস্থা করুক এবং তা হবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ। ১৮৬৫ সালেই কেবলমাত্র কংগ্রেস সংবিধান সংশোধন করে দাসপ্রথা বিলোপ করতে সমর্থ হয়। আর রাজ্যগুলির অনুমোদন পাওয়ার আগেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৮৬২ ও ৬৩ সাল ধরে মহান যুদ্ধ চলছিল, ধীরে ধীরে যুদ্ধের আবেগ উৎসাহে ভাটা পড়ে আসছিল, আমেরিকা ইতিমধ্যে যুদ্ধের ক্লান্তি ও যুদ্ধের বিতৃষ্ণা অনুভব করতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যে নিজেকে দেখতে পেলেন বিশ্বাসঘাতক, বরখাস্ত জেনারেল, পেঁচুক রাজনীতিক সন্দেবাদী জনগণ, মনমরা সৈনিকদের মাঝে।

www.nagorikpathagar.org

তবে সান্ত্বনার কথা একটাই যে রিচমন্ডে জেফারসন ডেভিসের অবস্থাও তার চেয়ে বেশি ভালো ছিল না। ইংল্যান্ডে ইংরেজ সরকারের ভূমিকাও ভালো ছিল না। তারা কনফেডারেট এজেন্টদের তিনটি দ্রুতগামী জাহাজ দিয়েছিল, যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজকে সমুদ্র থেকে তাড়িয়ে দেয়। মেক্সিকোর ফরাসি সৈনিকরাও মনরো নীতিকে পদদলিত করে। হঠাৎ করেই রিচমন্ড থেকে প্রস্তাব এলো যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তির আর ফেডারেল ও কনফেডারেট বাহিনী একত্রিত হয়ে মেক্সিকোর ফরাসি বাহিনীর মোকাবেলা করা। তবে লিংকন এ প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না, যদি না ফেডারেল ইউনিয়নের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। আমেরিকা এক জাতি হিসেবে কাজটি করতে পারে দুই জাতি হিসেবে নয়।

ক্লান্তিকর পাল্টাপাল্টি ও অকার্যকর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় অতিক্রম করতে থাকে, যার মধ্যে ছিল বিভক্তি আর সাহসের অধক্ষেপন। তবে এমন কোনো নজির নেই যাতে বোঝা যায় তিনি কখনও দোটানায় ভুগেছেন বা তার উদ্দেশ্য থেকে সরে এসেছেন। এমনও সময় এসেছে যখন কিছুই করার থাকত না, তখন তিনি নিঃশব্দে হোয়াইট হাউসে বসে থাকতেন, সংকল্পের এক অনড় প্রতিমূর্তি আবার কখনও সখনও হাসিঠাট্টা আর খোশগল্পের মধ্য দিয়ে সময় পার করতেন।

তিনি দেখেছিলেন ইউনিয়নের বিজয়। আত্মসমর্পণের পর দিনই তিনি রিচমন্ডে প্রবেশ করেছিলেন, আর শুনেছিলেন লি'র শিরশ্ছেদের কথা। তিনি ওয়াশিংটনে ফিরে এসে গণসমাবেশে ভাষণ দেন ১১ই এপ্রিল তারিখে। তার বক্তব্যের সার কথা ছিল সমঝোতা ও পরাজিত রাজ্যসমূহের পুনর্গঠন। ১৪ই এপ্রিল তিনি ওয়াশিংটনের ফোর্থয়িরেটারে বসে নাট্যাভিনয় দেখছিলেন। হঠাৎ বুথ নামের এক অভিনেতা তার মাথার পেছনে গুলি করে, আর তাৎক্ষণিকভাবে তার মৃত্যু হয়। লিংকনের বিরুদ্ধে সেই অভিনেতার কিছু অভিযোগ ছিল আর চুপি চুপি পেছন থেকে সে স্টেজে ঢুকে পড়ে। তবে লিংকনের কাজ শেষ; ইউনিয়ন বেঁচে যায়।

যুদ্ধের শুরুতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রেলপথ ছিল না; তবে দ্রুতবর্ধিষ্ণু লতার মতোই তা সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যাকে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রের মানসিক ও বৈষয়িক যোগসূত্র, মহান এক জনসমাজ।

৬১. ইউরোপে জার্মানির প্রাধান্য অর্জন

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি কীভাবে ফরাসি বিপ্লবের বিপর্যয় ও নেপোলিয়নের দুঃসাহসিক অভিযাত্রা বিফল হওয়ার পর, ইউরোপে এক অস্বস্তিকর স্থিতাবস্থার পরিস্থিতি বজায় থাকে আর পঞ্চাশ বছর আগের এক রাজনৈতিক অবস্থার পুনঃস্থাপন হয়। শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইস্পাত, রেলপথ ও বাষ্পীয় পোত কোনো

www.nagorikpathagar.org

লক্ষণীয় রাজনৈতিক পরিণাম বয়ে আনতে পারেনি। তবে নগরায়িত শিল্পায়ন নানারকম টানাপড়েনের সৃষ্টি করে। ফ্রান্স থেকে যায় লক্ষণীয়ভাবে এক অস্বস্তিকর রাষ্ট্ররূপে। ১৮৩০-এর বিপ্লবের পর ১৮৪৮ এ আরো একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়। তারপর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভাগ্নে তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হন এবং তার পর হয়ে বসেন সম্রাট (১৮৫২)।

তিনি প্যারিসকে নতুন করে গড়ে তুলতে লেগে যান এবং ছবির মতো নিম্নমানের পয়ব্যবস্থার সপ্তদশ শতকের পরিবর্তে আধুনিক মার্বেল খচিত লাতিনীয় ধাঁচের এক প্রশস্ত শহর নির্মাণ করেন। তিনি ফ্রান্সের নতুন রূপায়ণের প্রয়াসী হন এক চোখ ধাঁধানো নব্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের। তিনি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে প্রতিযোগিতামূলক পরাশক্তির পুনঃঅভ্যুত্থানের কল্পনা করেন। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসও দক্ষিণ দিকে তুর্কি সাম্রাজ্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন, যার প্রকৃত দৃষ্টি ছিল কনস্টান্টিনোপলের দিকে।

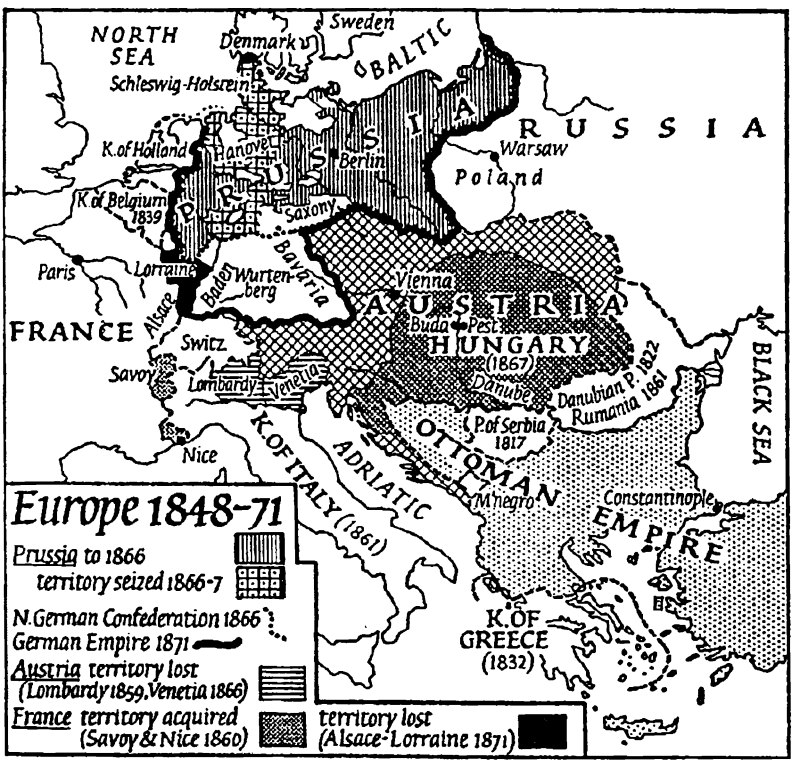

১৯. ইউরোপ ১৮৪৮-৭১

www.nagorikpathagar.org

ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকেই ইউরোপ নতুন এক যুদ্ধের চক্রে নিপতিত হয়। এটা ছিল মূলত নির্ভরশীল ক্ষমতার ভারসাম্য এবং যুদ্ধে প্রাধান্য লাভ। ফ্রান্স ও সার্দিনিয়া তুর্কির সপক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রাশিয়া ইতালির সহযোগীরূপে এবং অস্ট্রিয়া জার্মানির ওপর কর্তৃত্ব লাভের জন্য যুদ্ধ শুরু করে। ফ্রান্স উত্তর ইতালি অস্ট্রিয়ার হাত থেকে মুক্ত করে, তবে তা স্যাভয়ের বিনিময়ে, আর ইতালি ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক রাজ্যে পরিণত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন বোকামি করে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় মেক্সিকো উদ্ধারের চেষ্টা চালায়; সেখানে তিনি মেক্সিমিলিয়ানকে সম্রাট হিসেবে বসিয়ে অল্পদিনের মধ্যে তার নিজের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে নেন, বিজয়ী ফেডারেল বাহিনী মেক্সিকোতে ঢুকে পড়লে মেক্সিকানরাই তাকে গুলি করে মেরে ফেলে।

১৮৭০ সালে ইউরোপে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সংগ্রাম শুরু হয়ে যায় প্রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল আর অপরপক্ষে অর্থনৈতিক দুর্নীতিতে ফ্রান্স অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল। তার পরাজয় ছিল দ্রুত ও নাটকীয়। আগস্টে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করে, সম্রাটের অধীনে এক বিশাল ফরাসি বাহিনী সেডানে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর অন্য এক বাহিনী ১৮৭১ এর জানুয়ারিতে মেৎসে আত্মসমর্পণ করে। বোমাবর্ষণের পর প্যারিস জার্মান বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়। আলসেস ও লোরেন প্রদেশ জার্মানির হাতে তুলে দিয়ে ফ্রাংকফুর্টে সন্ধি স্থাপিত হয়। অস্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ এক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। প্রাশিয়ার রাজা জার্মান সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হন।

পরবর্তী তেতাল্লিশ বছর ধরে জার্মানি ইউরোপ মহাদেশের মুখ্য শক্তিতে পরিণত হয়। ১৮৭৭-৭৮ সালে এক রুশ-তুর্কি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে লর্ড বিকন্সফিল্ড জার্মানির সাথে সহযোগিতা করে রাশিয়ার কনস্টান্টিনোপল অধিকারের অভিপ্রায় নস্যাৎ করে দেয়। তবে এরপর থেকে বল্কান এলাকায় কিছু পুনর্বিন্যাস ব্যতীত ইউরোপীয় রাজ্যগুলির সীমান্ত পরবর্তী ত্রিশ বছর ধরে অস্বস্তিকর সুরক্ষিত থেকে যায়।

৬২. বিদেশে বাষ্পীয় পোত ও রেলপথের সাম্রাজ্য

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ ছিল সাম্রাজ্যে ধস ও সম্প্রসারণের মোহমুক্তি। ইংল্যান্ড ও স্পেন এবং তাদের কলোনির মধ্যে দীর্ঘ বিরক্তিকর ভ্রমণপথ এবং ফলস্বরূপ কলোনিগুলিতে স্বতন্ত্র ধ্যানধারণার এমনকি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী মানব সমাজ গড়ে ওঠে। তাদের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে কষ্টকর জাহাজ ব্যবস্থা অনিশ্চিত যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছিল। ফ্রান্স আর কানাডার মতো অরণ্যবেষ্টিত বাণিজ্য কেন্দ্র অথবা ভারতে ব্রিটেনের বাণিজ্যকেন্দ্রটিকে রাখার জন্য মূল ভূখণ্ডের সমর্থন প্রয়োজন ছিল।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ পৃ ২১১

www.nagorikpathagar.org

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে অনেক চিন্তাবিদ এর বেশি কিছু আশা করেনি উপনিবেশের শাসনব্যবস্থায়। মধ্য অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপের ম্যাপে যে বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের রূপরেখা দেখা যায়, তা ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে। এশিয়ার বিশাল এলাকায় শুধু রুশ অধিপত্য বজায় থাকে।

১৮১৫ সালে কানাডায় ব্রিটিশ আধিপত্য বলতে শুধু বোঝাত বিরল জনবসতির উপকূলীয়, নদী উপত্যকা ও বনভূমি। বসতি বলতে উল্লেখযোগ্য ছিল হাডসন বের পশম-বাণিজ্যকেন্দ্র। ভারতীয় উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে, উত্তমাশা অন্তরীপের উপকূলীয় জেলাসমূহ ছিল কৃষ্ণকায় অধিবাসী ও বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ডাচ অভিবাসীদের আয়ত্তে। পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলের কিছু ব্যবসাকেন্দ্র, জিব্রালটারের পাহাড়, মাল্টা দ্বীপ, জ্যামেইকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিছু দাস ব্যবসাকেন্দ্র, দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রিটিশ গিয়ানা, আর পৃথিবীর অন্যপ্রান্তের অস্ট্রেলিয়া ও তাসমেনিয়ার অপরাধী নির্বাসন কেন্দ্র। স্পেন ধরে রাখে কিউবা ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ। পর্তুগাল আফ্রিকায় সামান্য কিছু দখল বজায় রাখতে সমর্থ হয়। হল্যান্ড তার অধিকার টিকিয়ে রাখে ইস্ট ইন্ডিজ ও ডাচ গিয়ানায়, আর ডেনমার্ক ওয়েস্ট ইন্ডিজের দু-একটা দ্বীপ। ফ্রান্সের অধিকার বজায় থাকে দু-একটা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপ আর ফ্রেন্স গিয়ানায় মনে হয় এটুকুই মাত্র চাহিদা ছিল ইউরোপের। কেবলমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই সম্প্রসারণ বজায় রাখতে পেরেছিল।

ইউরোপ যখন নেপোলিয়নের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একই ভূমিকা পালন করেছে যেমনটা এক সময় উত্তরের তুর্কি বাহিনী করেছিল। আর ভিয়েনা চুক্তির পর এটা আরো বেগবান হয়। কর আদায়, যুদ্ধ পরিচালনা, অন্যান্য এশিয় শক্তির কাছে দূত প্রেরণ : প্রায় স্বাধীন এক রাষ্ট্র, তবে এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিমে সম্পদ পাচার।

এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নয় কীভাবে এই ব্রিটিশ কোম্পানি কখনো এই শক্তির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আবার কখনো ঐ শক্তির সাথে আর শেষ পর্যন্ত বিজেতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর আধিপত্য বিস্তার লাভ করে আসাম, সিন্ধু ও অযোধ্যা পর্যন্ত, ভারতের মানচিত্র আকার লাভ করে, যা পরবর্তী এক শতাব্দী ধরে টিকে থাকে। সামান্য কিছু দেশীয় রাজ্য বাদ দিলে ভারতের প্রায় সবগুলি প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

ভারতের দেশীয় সৈন্যদের এক ভয়ংকর বিদ্রোহের পর ১৮৫৯ সালে ভারতবর্ষ সরাসরি ব্রিটেনের রাজমুকুটের নিচে চলে আসে। পার্লামেন্টে ভারতবর্ষে একটা উন্নত শাসনের স্বার্থে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় উপাধি দেওয়া হয়, যিনি হলেন ব্রিটেনের রাজ প্রতিনিধি, আর কোম্পানির দায়িত্ব অর্পণ করা হলো সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া উপাধিধারী এক ব্যক্তির ওপর, যিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকবেন। ১৮৭৭ সালে লর্ড বিকন্সফিল্ড প্রস্তাব উত্থাপন করেন কুইন ভিক্টোরিয়াকে ভারতের রানী ঘোষণার।

www.nagorikpathagar.org

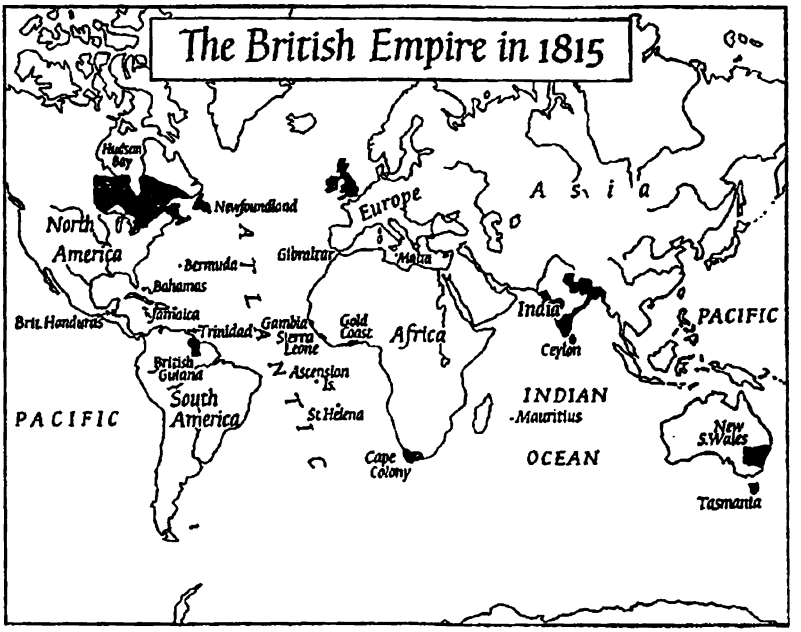

২০. ১৮১৫ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

ভারত ব্রিটেনের সাথে যুক্ত থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ অবধি, তদবধি ভারতবর্ষ তত্ত্বগতভাবে মহান মোগল সাম্রাজ্যরূপেই পরিচিত ছিল, আর তার পর হয়ে যায় ব্রিটেন রাজের অধীন প্রজাতন্ত্র। ভারতবর্ষ হয়ে পড়েছিল একনায়ক ছাড়াই একনায়কতন্ত্র, যার ফলে একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের দোষত্রুটির সাথে যুক্ত হয়েছিল দায়িত্বহীন নৈর্ব্যক্তিক গণতন্ত্রের দুর্বলতা। ভারতীয়রা অভিযোগ জানাবার জন্য কোনো দৃশ্যমান রাজা খুঁজে পেত না, অপরপক্ষে সম্রাট ছিলেন এক স্বর্ণসৌধবাসী শরীরী আত্মা। তিনি ইংল্যান্ডে কোনো পাম্ফলেট ছাড়তে বা কম্‌ন্সসভায় কোনো প্রশ্ন তোলার উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারতেন না। পার্লামেন্ট অধিকাংশ সময় ব্রিটেনের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকত, ভারতবর্ষ নিয়ে ধ্যান দেওয়া বা চিন্তা করার খুব কমই অবসর থাকত, ভারতবর্ষ কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারীর করুণার ওপরই নির্ভরশীল ছিল।

ভারতবর্ষ ছাড়া বাষ্পীয়পোত বা রেলপথ চালু হওয়ার পূর্বে তেমন কোনো কার্যকরী ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠেনি। বেশ কিছু সংখ্যক ব্রিটেনের রাজনীতিবিদ মনে করতেন সাম্রাজ্যের অধিক সম্প্রসারণ ব্রিটেনের দুর্বলতা সূচিত করবে। অস্ট্রেলিয়া অভিবাসন প্রক্রিয়া বেশ ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছিল, যতক্ষণ না ১৮৪২ সালে তামা এবং ১৮৫১ সালে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। পরিবহনের

www.nagorikpathagar.org

অগ্রগতির সাথে অস্ট্রেলীয় পশমও ইউরোপে বাজার লাভ করেছিল। কানাডাতেও তেমন অগ্রগতি ছিল না ১৮৪৯ অবধি, এর প্রধান অসুবিধা ছিল ফরাসি ও ব্রিটিশ অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ, বেশ কয়েকটি সাংঘাতিক বিদ্রোহও ঘটেছিল। কেবলমাত্র ১৮৬৭ সালে কানাডাকে ফেডারেল ইউনিয়ন করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ টানাপড়েন দূর করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে রেলপথই কানাডার মানসিকতা পরিবর্তনে অনেকটা ভূমিকা রাখে, ঠিক যেমন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভাবিত করে পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হতে, আর এর ভুট্টা ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য ইউরোপে বাজারজাতকরণে। এতে দ্রুত সম্প্রসারণ সত্ত্বেও ভাষা, চিন্তা ও আগ্রহে ঐক্যবদ্ধ থেকে যায়। রেলওয়ে, বাষ্পীয়পোত আর টেলিগ্রাফের তার ঔপনিবেশিক অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রাখে।

১৮৪০ এর আগেই নিউজিল্যান্ডে ইংরেজ বসতিস্থাপন শুরু হয়ে যায়, আর দ্বীপটির সম্পদ আহরণের জন্য নিউজিল্যান্ড ল্যান্ড কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৪০ সালে নিউজিল্যান্ডকেও ব্রিটিশ রাজের ঔপনিবেশিক অধিকারভুক্ত করা হয়।

কানাডাই ছিল প্রথম কলোনি যেখানে নতুন পরিবহনব্যবস্থা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। অনতিবিলম্বে দক্ষিণ আমেরিকান প্রজাতন্ত্র, বিশেষ করে আর্জেন্টিনা রিপাবলিক ইউরোপের বাজারে গোসম্পদ ও কফি প্রেরণ করে। এযাবৎকাল অনধ্যুষিত বর্বর অঞ্চলে ইউরোপীয়দের মূল আকর্ষণ ছিল স্বর্ণ বা অন্যান্য ধাতু, মসলা, গজদন্ত অথবা ক্রীতদাস। তবে ঊনবিংশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইউরোপের দেশগুলি খাদ্য সরবরাহের দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করে; আর যন্ত্রচালিত শিল্পকারখানার জন্য কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজন দেখা যায়, যেমন নানারকম চর্বি ও গ্রিজ, রাবার এবং ইতিপূর্বে অপ্রয়োজনীয় আরো অনেক সামগ্রী। এটা বেশ সহজবোধ্য যে গ্রেটব্রিটেন, হল্যান্ড ও পর্তুগাল তাদের অধিকৃত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় এলাকার অনেক সামগ্রীর বাণিজ্যিক সুবিধা কাজে লাগাতে পেরেছিল।

১৮৭১ এর পরে জার্মানি, ফ্রান্স এবং সবশেষে ইতালি এযাবৎ অনধিকৃত কাঁচামাল উৎপাদী অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল, প্রাচ্যদেশসমূহে শিল্পায়নের মাধ্যমে লাভবান হতে চেয়েছিল। সুতরাং আরো একবার নতুন করে পৃথিবীব্যাপী কাড়াকাড়ি শুরু হলো। অবশ্য মনরো চুক্তির ফলে আমেরিকায় সে অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

ইউরোপের সবচেয়ে কাছাকাছি মহাদেশ আফ্রিকা, যেখানে রয়েছে প্রচুর অজানা সম্ভাবনা। ১৮৫০ পর্যন্ত আফ্রিকা ছিল অন্ধকার রহস্যের মহাদেশ, জ্ঞাত ছিল কেবলমাত্র মিশর ও উপকূলীয় কিছু দেশ। এখানে অবশ্য জায়গা নেই সেসব অভিযাত্রীর কথা বলার, যারা আফ্রিকার অন্ধকার ভেদ করে আবিষ্কারের নেশায়

www.nagorikpathagar.org

মেতেছিল, আর তাদের পথ ধরে এগিয়ে এসেছিল রাজনৈতিক প্রতিভূ, প্রশাসক, বণিক, অভিবাসী আর বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিবৃন্দ। আবিষ্কার হয়েছিল পিগমীর মতো অসভ্য জাতির লোক; ওকাপীর মতো অদ্ভুত প্রাণী, আশ্চর্যজনক ফুল-ফল, পতঙ্গ, সাংঘাতিক রোগ, পাহাড়-জঙ্গল, বিশাল ভূ-বেষ্টিত সাগর, বিপুলাকার নদী, আর সুদৃশ্য জলপ্রপাত, সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবী। এমনকি অচিহ্নিত, লুপ্ত কোনো সভ্যতার অবশেষ (জিম্বাবুয়ে), আদি মানবজাতির দক্ষিণ দিকে অগ্রগমন, এসবই আবিষ্কার হয়। এই নতুন পৃথিবীতে এলো ইউরোপীয়রা, আর ইতিমধ্যেই দেখতে পেল সেখানে রাইফেল হাতে আরব দাস ব্যবসায়ীদের, আর নিগ্রোদের বিপর্যস্ত জীবন।

এর পঞ্চাশ বছর বাদে ১৯০০ সালের দিকে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের ম্যাপ তৈরি হয়ে যায় এবং হিসাব-নিকাশ করে ইউরোপীয়দের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায়। এসব কাড়াকাড়িতে দেশীয়দের স্বার্থের প্রতি কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। আরব দাস ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা হয়, বরং বলা যায় বিতাড়িত করা হয়। বেলজিয়ান কঙ্গোর রাবার সম্পদ দখলের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। আমরা সবিস্তারে বলতে পারব না কীভাবে গ্রেট ব্রিটেন ১৮৮৩ সালে মিশরের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, যদিও মিশর ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশ। এ নিয়ে ১৮৯৮ সালে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, যে সময় কর্নেল মার্চান্ড পশ্চিম উপকূল থেকে মধ্য এশিয়া অতিক্রম করে নীল নদের উজান দিক দখলের চেষ্টা করেন।

এটা বলাও সম্ভব নয় কেন ব্রিটিশ সরকার ডাচ বসতি স্থাপনকারীদের অরেঞ্জ নদী উপত্যকা ও ট্রান্সভালে বসতি স্থাপন করতে আর দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে দিলো, আর পরবর্তীতে আফসোস করে ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্র দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে যুক্ত করে নেয় ১৮৭৭ সালে, আর কীভাবেই বা বুয়ার্সরা মাজুবার যুদ্ধে (১৮৮১) ট্রান্সভাল প্রজাতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে। এরপর ১৮৯৯ সালে আবার তিন বছরব্যাপী এক যুদ্ধ শুরু হয়, যাতে ব্রিটিশদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে রিপাবলিকানদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তাদের পরাধীনতা স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। ১৯০৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পতনের পর দক্ষিণ আফ্রিকার উদারপন্থীরা সমস্যা সমাধানের ভার নিজের হাতে নিয়ে নেয়, আর এই প্রাক্তন প্রজাতন্ত্রগুলি কেপ কলোনি ও নাটাল সমন্বিত হয়ে স্বেচ্ছায় ব্রিটিশরাজের স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়, তবে প্রথম থেকেই এখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

পরবর্তী ২৫ বছরের মধ্যে আফ্রিকার ভাগবাটোয়ারা শেষ হয়ে যায়। মাত্র তিনটি ছোট ছোট রাজ্যই দখলমুক্ত থেকে যায়; পশ্চিম উপকূলের সদ্যমুক্ত দাসদের বসতি লাইবেরিয়া, মুসলমান সুলতানের অধীন মরক্কো আর বর্বর রাজ্য আবিসিনিয়া যেখানে

www.nagorikpathagar.org

প্রচলিত ছিল আদিম কিম্ভূত এক খ্রিষ্টধর্ম, ১৮৯৬ সালে ইতালির বিরুদ্ধে আদোয়ার যুদ্ধে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

৬৩. এশিয়ায় ইউরোপীয় আগ্রাসন ও জাপানের অভ্যুদয়

এটা বিশ্বাস করা শক্ত যে ইউরোপীয় কালিতে আঁকা আফ্রিকার মানচিত্র কেউ পছন্দ করবে। তবে ইতিহাসবিদরা স্বীকার করবে বিশ্ববাসী মেনে নিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মানসিকতায় ইতিহাসের রেখাচিত্র ছিল অস্পষ্ট, আর সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টির বইয়ের অভাব। পশ্চিমা বিশ্বে যান্ত্রিক অগ্রগতি বিশ্বের অন্যান্য জাতির ওপর যে প্রাধান্য দিয়েছিল, তা ছিল নিতান্তই সাময়িক। বিজ্ঞানের স্থানান্তরণ সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তারা বুঝতে পারেনি যে চীনা বা ভারতীয়রাও সমান দক্ষতার সাথে গবেষণাকাজ চালাতে পারে ফরাসি বা ইংরেজদের মতো। তারা বরং বিশ্বাস করত ইউরোপীয়দের অন্তর্নিহিত বৌদ্ধিক প্রেষণা আছে। আর প্রাচ্যে আছে জন্মগত স্থবিরতা ও রক্ষণশীলতা, তাতেই বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় আধিপত্য নিশ্চিত বলে তারা ধরে নিয়েছিল।

এই আত্মতৃপ্তির পরিণতি হয়েছিল এই যে ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলির বৈদেশিক দপ্তরগুলিতে শুধু পরস্পরের ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়েছিল; তা-ই নয়, এশিয়ার জনবহুল দেশগুলিকে কাটাছেঁড়া করছিল, যেন সেখানকার জনগণ মানুষ নয়, নেহাৎ কাঁচামাল, যাদের নিজের প্রয়োজনে যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে। ভারতের ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী যারা বাইরে থেকে চাকচিক্যময় হলেও ভিতরে অন্তঃসারশূন্য আর পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ডাচদের বিস্তৃত লাভজনক অধিকার এই দুই শক্তিধর দেশই পারস্যে অনুরূপ গৌরব অর্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। ভারত, চীন ও জাপানেও যেমন প্রতিযোগিতা ছিল তাদের।

১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি চীনের কিয়াগুওচাও দখল করে নেয়, এর জবাবে ব্রিটেন অধিকার করে ওয়েই-হাই-ওয়েই, আর পরের বছর রাশিয়া দখল করে পোর্ট আর্থার। সারা চীনব্যাপী ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার শিখা প্রজ্বলিত হয়। শুরু হয় ইউরোপীয় ও খ্রিষ্টান হত্যার উৎসব; আর ১৯০০ সালে পিকিং-এর ইউরোপীয় দূতাবাস ভবন দখল করে নেয় চীনারা। একটি সম্মিলিত ইউরোপীয় বাহিনী পিকিং-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান চালিয়ে পিকিংয়ের দূতাবাস পুনর্দখল করে। আর বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুট করে নেয় এবং রাশিয়া দখল করে মাঞ্চুরিয়া ও ব্রিটিশরা অধিকার করে তিব্বত।

তবে এসব শক্তিধর দেশের তালিকায় নতুন একটি দেশ যুক্ত হয়, তা হলো জাপান। জাপান ইতিহাসের এ পর্যায়ে সামান্য ভূমিকাই পালন করেছে। তার আবদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতা মানব জাতির ভাগ্য নির্মাণে সামান্যই অবদান রাখতে পেরেছে। সে গ্রহণ করেছে অনেক কিছু, দান করেছে সামান্য। 'জাপানিরা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের সভ্যতা, তাদের লিপি এবং তাদের সাহিত্যিক ও শৈল্পিক ঐতিহ্য চীন থেকেই নিষ্কাশিত। তাদের ইতিহাস কৌতুকপ্রদ, রোমান্টিক। খ্রিষ্টযুগের প্রথম দিকে তারা একপ্রকার সামন্তবাদী বীরত্ব গাথা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তাদের কোরিয়া ও চীন আক্রমণ, ব্রিটেনের ফ্রান্স আক্রমণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জাপান সর্বপ্রথম ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসে ষোড়শ শতকে; ১৫৪২ সালে কিছু পর্তুগিজ চীনা নৌকায় করে জাপানে পৌঁছে, আর ১৫৪৯ সালে একজন জেসুইট মিশনারি ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেখানে খ্রিষ্টীয় শিক্ষা প্রচার শুরু করে, আর চৈনিক মিশনারিরা অনেককে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়। উইলিয়াম অ্যাডামস্ নামে এক ব্যক্তি জাপানিদের বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হতে সক্ষম হন। আর তাদের শিখিয়ে দেন কীভাবে বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ করা যায়। জাপানিদের তৈরি জাহাজ ভারত ও পেরুতে পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়। এরপর শুরু হয় স্প্যানিশ ডমিনিকান, পর্তুগিজ জেসুইট এবং ইংরেজ ও ডাচ প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে জটিল দ্বন্দ্ব, প্রত্যেকেই জাপানিদের সতর্ক করিয়ে দেয় অন্যদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে। প্রাধান্য অর্জনের একপর্যায়ে জেসুইটরা বৌদ্ধদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে। অবশেষে জাপানিরা সিদ্ধান্তে আসে ইউরোপীয়রা অসহিষ্ণু উৎপাত, আর সিদ্ধান্তে পৌঁছায় ক্যাথলিকরা পোপ আর স্পেন সম্রাটের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের ছদ্মবেশী এজেন্ট মাত্র আর তারা ইতিমধ্যেই ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে সেখানকার খ্রিষ্টানদের দারুণ উৎপীড়ন করেছিল। ১৬৩৮ সালে জাপানে ইউরোপীয়দের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছিল। যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে পরবর্তী ২০০ বছর ধরে। ঐ দুই শতাব্দী ধরে জাপানিরা অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করেছে যেন তারা অন্য এক গ্রহের বাসিন্দা। উপকূলীয় নৌকার চেয়ে বড় কোনো জাহাজ নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। কোনো জাপানি বিদেশে যেতে পারত না, আর কোনো ইউরোপীয় জাপানে প্রবেশ করতে পারত না।

দুই শতাব্দী ধরে জাপান ছিল ইতিহাসের প্রধান স্রোতের বাইরে। জাপান বাস করেছে অদ্ভুত এক সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে; যেখানে ৫ শতাংশ সামুরাই যোদ্ধাব্যক্তি, অভিজাত ও তাদের পরিবার অবশিষ্ট ৯৫ শতাংশ জনসংখ্যাকে বাধাহীনভাবে শোষণপীড়ন করেছে। আর তখন বাইরের পৃথিবী বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে কোনো বিদেশী জাহাজ পথ হারিয়ে জাপানে গিয়ে পড়লে তাদের অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হতো। এমন এক ডাচজাহাজ দেশিমা দ্বীপে বসতি গড়ে তোলে আর তারাই বার্তা পাঠায় জাপান পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৮৩৭ সালে তারকাখচিত ডোরাকাটা পতাকা উড়িয়ে অদ্ভুত একটা জাহাজ এসে প্রবেশ করল ইয়েদো উপসাগরে আর কিছু জাপানি নাবিককে তুলে রওনা দিলো প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল কামানের গোলা ছুড়ে। শিগগিরই এই পতাকা অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org

জাহাজেও ওড়া শুরু করল। ১৮৪৯ সালে এ ধরনের একটা জাহাজ এসে দাবি করল, জাহাজডুবী আঠারজন আমেরিকান নাবিকদের ফিরিয়ে দিতে। এরপর ১৮৫৩ সালে কমোডোর পেরির নেতৃত্বে চারটি আমেরিকান জাহাজ এগিয়ে আসে, আর তারা ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। নিষিদ্ধ জলসীমায় তারা নোঙর ফেলে অবস্থান নেয়। এবং যে দুজন প্রশাসক সে সময় জাপানের প্রশাসনে ছিলেন তাদের নিকট বার্তা পাঠায়। ১৮৫৪ সালে তিনি দশটি জাহাজ নিয়ে ফিরে আসেন, বাষ্পচালিত অদ্ভুত ধরনের জাহাজ আর সজ্জিত ছিল বড় বড় কামান আর তিনি জাপানিদের প্রস্তাব দেন বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার। যেটা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা ছিল না জাপানিদের। তিনি সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য ৫০০ জন রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে অবতরণ করেন। এই বিদেশীদের দেখার জন্য অবিশ্বাস্য বিশাল এক জনতার ভিড় লেগে যায়।

আমেরিকার পিছনে পিছনে এগিয়ে আসে রাশিয়া, হল্যান্ড ও ব্রিটেন। একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন অভিজাত যার নিয়ন্ত্রণে ছিল শিমনোসেকি প্রণালী, তিনি ভাবলেন এবার বিদেশী জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করা সম্ভব, আর প্রত্যুত্তরে একযোগে ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ ও আমেরিকান জাহাজের গোলাবর্ষণে তার নৌবহর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবশেষে ১৮৬৫ সালে কিয়োটো চুক্তির মাধ্যমে জাপানকে পশ্চিমের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

এসব ঘটনায় জাপানের অবমাননাবোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র। আশ্চর্যজনক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তারা তাদের সংস্কৃতি ও সংগঠনকে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ করে তোলে। বিশ্বের ইতিহাসে কখনো কোনো জাতি এত দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি। ১৮৬৬ পর্যন্ত জাপান ছিল হাস্যকর ভাববিলাসী মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী। আর ১৮৯৯ সালেই তারা হয়ে উঠল সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ অগ্রসর এক জাতি। এত দিন যে অপবাদ ছিল এশিয়া কোনো দিনই ইউরোপের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না, জাপান তা ঘুচিয়ে দেয়। সে প্রমাণ করে ছাড়ে তার তুলনায় যে কোনো ইউরোপীয় অগ্রগতিই শ্লথ।

১৮৯৪-৯৫ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে সবিস্তার বলার অবকাশ নেই এখানে। এতে জাপানের পাশ্চাত্যকরণের কিছুটা পরিমাপ করা যায়। তার ছিল পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়ে তোলা সুদক্ষ এক সেনাবাহিনী আর ক্ষুদ্র হলেও দক্ষ এক নৌবহর। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যদিও জাপানের পুনরুত্থানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছিল আর তাকে ইতিমধ্যেই ইউরোপের সমকক্ষ ভাবতে শুরু করেছিল, ইউরোপের অন্যান্য দেশ সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে কোরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছিল। ফ্রান্স দক্ষিণে টংকিন ও আন্নাম পর্যন্ত কব্জা করেছিল আর জার্মানি হামলে বেড়াচ্ছিল কোথায় একটু পা রাখার জায়গা পাওয়া যায়। তিন শক্তি একত্রিত হয়ে চেষ্টা করেছিল যেন জাপান চীন-জাপান যুদ্ধের সুফল ঘরে তুলতে না পারে। জাপান ইতিমধ্যেই যুদ্ধে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

জাপান কিছুদিনের জন্য মাথা নত করে, নিজের ঘর গোছাতে থাকে। পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে জাপান ভাবতে শুরু করে সে এখন রাশিয়ার সাথে টক্কর নিতে সমর্থ, যা এশিয়ার ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আর ইউরোপীয় বাড়াবাড়ির পরিসমাপ্তি। রাশিয়ার রাজনীতি-বোদ্ধারা জটিলতা থেকে দূরে থাকা শ্রেয় মনে করেছিল। তবে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু গ্রান্ড ডিউক ও তার আত্মীয়স্বজন জারকে ভুল বুঝিয়েছিল। তারা মাঞ্চুরিয়া ও চীনে লুটপাটের লাভের দিকটাই বড় করে দেখেছিল যারা পিছু হটতে রাজি ছিল না, আর তাই কোরিয়ার পোর্ট আর্থারে জাপানিরা বিশাল সেনাবাহিনী, আর সাইবেরীয় রেলপথে হাজার হাজার রাশিয়ান কৃষক পাঠানো হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে প্রাণ বলি দেওয়ার জন্য।

অযোগ্যভাবে পরিচালিত ও অসদুদ্দেশ্যে প্রেরিত রুশরা জল ও স্থলপথে শোচনীয়ভাবে তাড়িত হয়েছিল। রাশিয়ার বাল্টিক সাগরে প্রেরিত যুদ্ধজাহাজ আফ্রিকার তুশিমা প্রণালীতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। অকারণ যুদ্ধে অহেতুক প্রাণহানির কারণে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলন শুরু করে দেয়, যুদ্ধ বন্ধ করতে জারকে বাধ্য করে (১৯০৫)। শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণার্ধ যা ১৮৭৫ সালে রাশিয়া দখল করেছিল, তা ফিরিয়ে দিতে, মাঞ্চুরিয়া খালি করতে এবং জাপানের হাতে কোরিয়া তুলে দিতে বাধ্য হয়। এশিয়ায় ইউরোপীয় আগ্রাসন শেষ হয়ে আসছিল।

৬৪. ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

বাষ্পীয়পোত ও রেলপথ দ্বারা সংহত বহুমাত্রিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৯১৪ সালের চেহারা কেমন ছিল এখানে আমরা তা সংক্ষিপ্ত আকারে দেখে নিতে পারি। এটা ছিল এক অনন্য রাজনৈতিক সমাবেশ; ইতিপূর্বে যেমনটা আর কখনোই দেখা যায়নি।

প্রথমত, এর কেন্দ্রে ছিল সম্মিলিত ব্রিটেনের রাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল আয়ারল্যান্ড (অধিকাংশ আইরিশ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে)। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তিনটি পার্লামেন্টের সহযোগে গঠিত : ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড; তারাই নির্ধারণ করত রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিসভার বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা, যে নীতিমালা নির্ধারণ হতো মূলত ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে। এই মন্ত্রিসভাই ছিল সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক। যার ক্ষমতার মধ্যে ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যের যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল ব্রিটেনের আনুগত্য প্রদর্শনকারী প্রায় স্বাধীন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউফাউন্ডল্যান্ড (ব্রিটিশ অধিকারে

www.nagorikpathagar.org

আসা সর্বপ্রাচীন রাজ্য ১৫৮৩), নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা। এ রাজ্যগুলিতে ব্রিটেনের মনোনীত প্রতিনিধি ছিল।

পরবর্তী ধাপে রয়েছে ভারত সাম্রাজ্য, যা ছিল মূলত মোগল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, যার অন্তর্গত ছিল সংরক্ষিত স্বাধীন রাজ্য যা বিস্তৃত ছিল বেলুবিস্তান থেকে বার্মা ও এডেন পর্যন্ত যা ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে (পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে) মূলত শাসিত হচ্ছিল প্রাচীন টার্কোম্যান শাসকদের আদলে।

তারপর আসে দ্ব্যর্থবোধক অধিকার, মিশর যেখানকার নামমাত্র শাসক তুর্কি ধারার খেদিভ। প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছাচারী ব্রিটিশ অফিসারদের শাসনাধীনে।

তারপর আসে অধিকতর দ্ব্যর্থবোধক ইঙ্গমিশরীয় সুদান প্রদেশ যেখানে যৌথভাবে ব্রিটিশ ও মিশরীয় শাসন চালু ছিল। এরপর দেখা যাবে মাল্টা, জ্যামাইকা, বাহামা আর বার্মুডার মতো দেশ, যা ছিল স্বায়ত্তশাসিত আংশিক ব্রিটিশ ও আংশিক দেশীয় সমাজ।

তারপরের ধাপে রাজতান্ত্রিক উপনিবেশ, যেমন সিংহল, ত্রিনিদাদ, ফিজি, জিব্রালটার আর সেন্ট হেলেনা, যেখানে ছিল ব্রিটেনের নিযুক্ত গভর্নর বা মনোনীত কাউন্সিল।

তারপর রয়েছে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিশাল এলাকা যেখান থেকে সংগ্রহ হতো শিল্পের কাঁচামাল, যেখানে ছিল আদিবাসী প্রধানের সাথে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের শাসন, যেমন বাসতুল্যান্ড, রোডেশিয়া। কোথাও ছিল বৈদেশিক অফিস, কোথাও ঔপনিবেশিক অফিস আবার কোথাও ইন্ডিয়া অফিস।

এতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় কোনো একক অফিস বা কোনো একক ধারায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরিচালিত হচ্ছিল না। ইতিপূর্বে সাম্রাজ্য বলতে যা বোঝাত এটা মোটেই তেমন ছিল না। এর মূল দায়িত্ব ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আর সে জন্যই অধীনস্থ জনগণ এটা মেনে নিয়েছিল, যদিও তার মধ্যে উৎপীড়ন আর অপর্যাপ্ততা কম ছিল না। আর ছিল দেশীয়দের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা। এথেনীয় সাম্রাজ্যের মতোই এটা ছিল সমুদ্রপাড়ের সাম্রাজ্য। সমুদ্রপথই ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম যা নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশ নৌবহর। অন্য যে কোনো সাম্রাজ্যের মতোই এক্ষেত্রেও সংহতির মূল নিয়ন্তা ছিল যোগাযোগব্যবস্থা।

৬৫. ইউরোপে অস্ত্রসজ্জা এবং ১৯১৪-১৮ এর মহাসমর

ভৌত বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বাষ্পীয়পোত ও রেলপথের দ্রুত প্রসার এবং আমেরিকা ও ব্রিটেনের জাহাজ সাম্রাজ্য ইউরোপের ঘনসন্নিবিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা নিজেদেরকে আবদ্ধ দেখতে পায় ঘোড়া ও স্থলপথের আমলের

www.nagorikpathagar.org

সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের মধ্যে। এদের সমুদ্র পথ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ব্রিটেন ভালোভাবেই আঁচ করতে পেরেছিল। পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার স্বাধীনতা একমাত্র রাশিয়াই ভোগ করত। সে সাইবেরিয়ার ওপর রেল সম্প্রসারণ করে চলেছিল যত দিন না জাপানের সাথে তার বিরোধ বাধে, যার ফলে সে দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণ পূর্বে ইরান ও ভারতের দিকে অগ্রসর হয়; যা ব্রিটেনের বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছিল অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ঠাসাঠাসি আরো বাড়ছিল। মানব জীবনের নতুন অনুষঙ্গগুলি কাজে লাগিয়ে তাদের জীবনযাত্রাকে আরো প্রশস্ততর ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হবে। এটা করতে হবে স্বেচ্ছামূলক সহযোগের মাধ্যমে নতুবা কোনো শক্তিধরের চাপের মুখে। আধুনিক চিন্তাধারায় প্রথম বিকল্পটার দিকেই মানুষের প্রবণতা বেশি ছিল। তবে ইউরোপের রাজনৈতিক ঐতিহ্য শেষেরটার দিকেই ঝুঁকেছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতন, জার্মান সাম্রাজ্যের উত্থান মানুষের আশা ও আশংকা জার্মান আধিপত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল। চল্লিশ বছরের অস্বস্তিকর শান্তির ইউরোপের রাজনীতি সেদিকেই মোড় নিচ্ছিল। শার্লামেনের সাম্রাজ্যের বিভক্তির পর থেকে ফ্রান্স ছিল ইউরোপীয় আধিপত্য অর্জনে জার্মানির প্রতিপক্ষ। সে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য রাশিয়ার সাথে মিত্রতার সন্ধান করেছিল। আর জার্মানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সাথে (প্রথম নেপোলিয়নের সময় অস্ট্রিয়া রোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসে অবশ্য ইতালির সাথে জার্মানির সম্পর্ক তেমন সাফল্য লাভ করেনি। প্রথম দিকে গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থান ছিল ইউরোপীয় বিষয়ের কিছুটা ভিতরে আর কিছুটা বাইরে। তবে জার্মান নৌবহরের আগ্রাসী চেহারার কারণে ব্রিটেন ফ্রাংকো রাশিয়ান গ্রুপের দিকে ভিড়তে বাধ্য হয়। সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রিয়াকলাপ, জার্মানিকে যে শুধু অপরিপক্ব বৈদেশিক উদ্যোগের দিকে ঠেলে দিয়েছিল তাই নয়; ব্রিটেন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রকেও শত্রু বানিয়ে ফেলেছিল। সবগুলি রাষ্ট্রেই অস্ত্রসজ্জা চলতে থাকে, বছরের পর বছর জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশই নিয়োজিত হয় কামান তৈরি, উপকরণ, যুদ্ধস্থাপত্য নির্মাণ ইত্যাদি কাজে। বছরের পর বছর শক্তির ভারসাম্য যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে এসে গেল যুদ্ধ। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে বসল ফ্রান্স, রাশিয়া ও সাইবেরিয়া ; জার্মান সৈন্য এগিয়ে চলল বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে; অবিলম্বে বেলজিয়ামের পক্ষ নিয়ে ব্রিটেন যুদ্ধে নেমে পড়ল, জাপান আর তুরস্ক যোগ দিলো জার্মানির সাথে। ১৯১৫ সালে ইতালি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল, আর অক্টোবরে বুলগেরিয়া যোগ দিলো কেন্দ্রীয় শক্তির সাথে। ১৯১৬ সালে রুমানিয়া, ১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়। এই মহাবিপর্যয়ের দায় কার কতটা তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, এই মহাযুদ্ধ কেন শুরু হয়েছিল সেটা ততটা কৌতূহলোদ্দীপক নয়, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো কেন এই যুদ্ধের পূর্বানুমান করা যায়নি আর কেনই বা তা রোধ করা যায়নি। অবাক করা ব্যাপার লক্ষ কোটি মানুষ কি এতই দেশপ্রেমিক ছিল, নাকি নির্বোধ ছিল যে গুটিকয়েক অপরিণামদর্শী লোককে ঠেকানো যায়নি?

www.nagorikpathagar.org

২১. ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সমুদ্রপারের সাম্রাজ্য ১৯১৪

www.nagorikpathagar.org

এই বইয়ের স্বল্প পরিসরে যুদ্ধের খুঁটিনাটি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যুদ্ধ শুরুর কয়েক মাসের মধ্যেই লক্ষ করা গিয়েছিল আধুনিকবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। পদার্থবিজ্ঞান ক্ষমতা দিয়েছে ইস্পাতের ওপর, দূরত্বের ওপর, ব্যাধির ওপর। সেই শক্তি ব্যবহার করা হবে ভালো কাজে না মন্দ কাজে সেটা নির্ভর করছে মানুষের বুদ্ধি, বোধ, চিন্তা-চেতনার ওপর। ইউরোপের সরকারসমূহ পুরনো ধাঁচের ঘৃণা, সন্দেহ ও বিদ্বেষের দ্বারা তাড়িত হয়ে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে অভূতপূর্ব ধ্বংস ও প্রতিরোধের মাঝে। এই যুদ্ধ পরিণত হয় পৃথিবীব্যাপী সর্বগ্রাসী এক দাবানলের মতো, যা বিজয়ী ও বিজিত উভয়েরই অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে জার্মানদের দেখা যায় প্রবল গতিতে প্যারিসের দিকে ছুটতে আর রুশদের পূর্ব প্রাশিয়া আক্রমণ করতে। উভয় আক্রমণই রুখে দেওয়া হয়। এরপর আত্মরক্ষার কৌশল উন্নত হতে থাকে। এরপর দেখা যায় ট্রেন্স খননের কৌশল, যা প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে বিশেষ কার্যকর ভূমিকা রাখে, যার ফলে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার না করে অগ্রসর হওয়া বেশ কঠিন। প্রতিটি সেনাবাহিনী ছিল লক্ষাধিক, আর পেছনে সরবরাহকারী ছিল অনুরূপ সংখ্যার। সামরিক উপকরণ ছাড়া সকল প্রকার উৎপাদন কার্য ব্যাহত হয়। ইউরোপে প্রায় প্রতিটি সক্ষম পুরুষকে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়, অথবা সামরিক কারখানায় কাজ করতে হয়। কলকারখানায় পুরুষের জায়গা নিয়ে নেয় নারীরা। এই ভয়াবহ যুদ্ধে অংশ নেয়া ইউরোপের প্রতিটি দেশ নারীদের টেনে এনেছিল। তাদের সামাজিকভাবে টেনে তুলে পুনঃরোপণ করা হয়। আর সংবাদ মাধ্যমে চলে শুধু মিথ্যা অপপ্রচার।

বিমান আক্রমণে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ধ্বংস হয়ে যায়। সমরাস্ত্রেরও উৎকর্ষ সাধন হতে থাকে, কামানের আকার ও আক্রমণ দূরত্ব বাড়তে থাকে, ট্যাংক নামে এক চলন্ত দুর্গ নেমে পড়ে যুদ্ধের ময়দানে, যাতে শত্রুপক্ষের রক্ষণভাগ বিধ্বস্ত করা যায়। নতুন পদ্ধতির মধ্যে বিমান আক্রমণই ছিল সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক। এটা যুদ্ধকে দ্বিমাত্রিক থেকে ত্রিমাত্রিকে পরি[illegible]। মানব ইতিহাসে এ যাবৎ যুদ্ধ বলতে বোঝাত দুটি সৈন্যদলের মুখোমুখি অবস্থান, এবার এটা সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ল। প্রথমে জেপেলিন, তারপর বোমারু বিমান ক্রমবর্ধমানরূপে বেসামরিক জনপদ ধ্বংস করতে লাগল। আগের দিনের সামরিক বেসামরিক অঞ্চলের ধারণা লোপ পেয়ে গেল। যারা খাদ্য ফলায়, যারা সেলাই করে, যারা কাঠ কাটে বা ঘর মেরামত করে, প্রতিটি রেলস্টেশন, গুদামঘর সব কিছুই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। যুদ্ধের অগ্রগতির সাথে সাথে বিমান আক্রমণের ভীতি বেড়েই চলল। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ নৈশ আক্রমণে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল। লন্ডন ও প্যারিসের মতো উন্মুক্ত শহর বিমান আক্রমণের ভয়ে বিনিদ্র রজনী পার করতে লাগল। তার সাথে রয়ে যায় বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন আর অ্যাম্বুলেন্সের ভেঁপু। বৃদ্ধ ও শিশুদের ওপর এর শারীরিক ও মানসিক কুপ্রভাব ছিল সাংঘাতিক।

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধের পরে অনিবার্য যে মহামারী তা আসতে অপেক্ষা করতে হয় ১৯১৮ সালে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত। চিকিৎসাবিজ্ঞান পরবর্তী চার বছর সাধারণ মহামারী ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল। তারপর মহামারীরূপে এলো ইনফ্লুয়েঞ্জা, যাতে মারা গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ। দুর্ভিক্ষকেও ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল কয়েক বছর। ১৯১৮ সালের পরে ইউরোপব্যাপী চলছিল এক নীরব নিয়ন্ত্রিত দুর্ভিক্ষ। কৃষকদের যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাওয়ায় খাদ্য উৎপাদন দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছিল। আর পরিবহনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়। অনেক সরকার খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। কম-বেশি রেশনিং ব্যবস্থার ফলে বিপর্যয় কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধ সমাপ্তির চতুর্থ বছর পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সব কিছুরই চরম সংকট চলছিল। মানুষ এক প্রকার অস্বস্তিকর জীবনযাপন করেছিল।

প্রকৃত যুদ্ধ শেষ হয়েছিল ১৯১৮ এর নভেম্বরে। জার্মানদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে আর প্যারিস শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়।

৬৬. রুশবিপ্লব

তবে কেন্দ্রীয় শক্তির পতনের বছরখানেক আগেই প্রাচ্যের অর্ধাংশব্যাপী বিস্তৃত রুশ রাজতন্ত্র যাকে বলা হয় বায়জেন্টীয় সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা, তা ধসে পড়ে। যুদ্ধ শুরুর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই জারতন্ত্রের মধ্যে পচনক্রিয়া লক্ষ করা গেছে, বিচারব্যবস্থা চলে যায় রাস্পুটিনের মতো অদ্ভুতুড়ে কিছু ধর্মধ্বজী ভণ্ডদের হাতে; আর জনপ্রশাসনে ছড়িয়ে পড়ে দুর্নীতি ও অদক্ষতা। যুদ্ধের শুরুতে লক্ষ করা যায় দেশপ্রেমের উন্মাদনা। বিশাল এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হয়, যেখানে না ছিল পর্যাপ্ত রসদ, না ছিল দক্ষ অফিসার, আর এই বিশৃঙ্খল ও অসজ্জিত সেনাবাহিনীকে অপরিকল্পিতভাবে ঠেলে দেয়া হয় জার্মান ও অস্ট্রীয় সীমান্তে।

সন্দেহ নেই যে ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরে রুশ সৈন্যদের প্যারিসে সফল অগ্রগতি জার্মানদের বেশ হকচকিয়ে দেয়। অদক্ষভাবে পরিচালিত হাজার হাজার রুশ কৃষকদের মৃত্যু ফ্রান্সের সম্পূর্ণ পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয় এবং সমগ্র ইউরোপ বেঁচে যায়। তবে অসংগঠিত বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধের ধকল সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণ রুশ সৈন্যদের কামানের সাহায্য ব্যতিরেকেই যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হয়। এমনকি তাদের পর্যাপ্ত রাইফেলও ছিল না, এক অপরিপক্ব সামরিক উন্মাদনায় সৈন্যরা অযথা প্রাণ হারায়। প্রথম দিকে তারা পশুর মতোই নির্বিরোধে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবে অতি অজ্ঞদের বেলাতেও সহনশীলতার একটা

www.nagorikpathagar.org

মাত্রা আছে। এসব প্রতারিত বিধ্বস্ত, সৈন্যদের মধ্যে জারতন্ত্রের প্রতি একটা চাপা ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ধূমায়িত হতে থাকে। ১৯১৫ সালের শেষ দিক থেকে রাশিয়া তার পশ্চিমা মিত্রদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১৬ সালের পুরোটাই রাশিয়া আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে থেকে যায়, আর শোনা যায় জার্মানির সাথে আলাদাভাবে একটা শান্তিচুক্তি করতে যাচ্ছে।

১৯১৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর পেট্রোগ্রাদের একটা ডিনার পার্টিতে সাধু রাস্পুটিনকে হত্যা করা হয় আর জারতন্ত্রকে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনার একটা বিলম্বিত প্রচেষ্টা চালানো হয়। মার্চ নাগাদ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। পেট্রোগ্রাদের একটা খাদ্য কেন্দ্রিক দাঙ্গা বিপ্লবাত্মক বিদ্রোহের রূপ নিতে থাকে। প্রতিনিধিসভা ডুমাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলে, উদারপন্থী নেতাদের আটক করারও চেষ্টা চলে, রাজপুত্র লভফের অধীনে একটা অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করে জার সিংহাসন ত্যাগ করেন (১৫ মার্চ)। কিছু সময়ের জন্য মনে হয় মধ্যপন্থী ও নিয়ন্ত্রিত বিপ্লব হয়তো সফল হবে, হয়তো অন্য কোনো জারের অধীনে। তারপর এটা স্পষ্ট হয়ে এলো যে, রাশিয়ার জনগণের আস্থাহীনতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রাশিয়ার জনগণ ইউরোপের পুরনো ধাঁচে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিল আর তারা এর থেকে মুক্তি চেয়েছিল। মিত্রদেশগুলির রাশিয়ার বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না; তাদের কূটনীতিকরা রাশিয়া সম্বন্ধে ছিল অজ্ঞ; কেতাদুরস্ত লোকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রাশিয়ার রাজদরবারের দিকে, দেশের দিকে নয়, উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাদের ছিল ভ্রান্ত ধারণা। প্রজাতান্ত্রিকতার প্রতি কূটনীতিকদের কোনো সহানুভূতি ছিল না, তাদের প্রবণতা ছিল নতুন সরকারকে বিব্রত করা। রাশিয়ার রিপাবলিকান সরকারের পুরোভাগে ছিলেন একজন অত্যন্ত সুবক্তা বর্ণিল নেতা কেরেনস্কি, যিনি বিপ্লবী আন্দোলনের ধাক্কায় উৎখাত হয়ে যান। মিত্রদেশগুলির সরকারও তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তারা না পেরেছেন রাশিয়ান কৃষকদের জমির অধিকার ফিরিয়ে দিতে, না করেছেন সীমান্তে শান্তি স্থাপনে সহযোগিতা। ফরাসি ও ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমগুলি তাদের ক্ষয়িষ্ণু মিত্রের বিরুদ্ধে বরং বিষোদগারে মেতেছে। আর জার্মান বাহিনী যখন রিগায় প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে, তখন ব্রিটিশ নৌশক্তি বাল্টিক সাগরে নৌশক্তি ব্যবহারের সুযোগ খুঁজে পেয়েছে। নতুন রুশ প্রজাতন্ত্রকে একাই লড়তে হয়েছে। মহান ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল লর্ড ফিশারের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রশক্তি জার্মানদের বিনা বাধায় বাল্টিক সাগরে আধিপত্য করতে দিয়েছে।

রাশিয়ার সাধারণ জনগণ চেয়েছে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি, যে কোনো মূল্যেই হোক। পেত্রোগ্রাদে শ্রমিক ও সাধারণ সৈনিকদের সমন্বয়ে "সোভিয়েত" নামে এক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে, তারা দাবি করেছিল স্টকহোমে আন্তর্জাতিক এক সমাজতান্ত্রিক সমাবেশের। এই সময় বার্লিনে খাদ্য দাঙ্গা চলছিল, অস্ট্রিয়া ও জার্মানিও প্রবল যুদ্ধ ক্লান্তিতে ভুগছিল আর পরবর্তী ঘটনাক্রমে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে এ ধরনের একটা সম্মেলন হলে গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তি

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো। কেরেনস্কি তার পশ্চিমা বন্ধুদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন এরকম এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে। তবে পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভীতি থেকে তারা এর অনুমতি দেয়নি, যদিও ব্রিটেনের সংখ্যালঘিষ্ঠ লেবার পার্টি এর পক্ষে ছিল। মিত্র দেশগুলির বৈষয়িক ও নৈতিক সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েও অসুখী মধ্যপন্থী রুশ রিপাবলিক যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল আর জুলাইতে চালিয়েছিল বেপরোয়া আক্রমণাত্মক অভিযান। প্রাথমিক কিছু সাফল্যের পরেই এটা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আর এক রুশ হতাযজ্ঞ নেমে আসে।

রাশিয়া তার ধৈর্যের শেষসীমায় পৌঁছে যায়। রুশ সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে উত্তর রণাঙ্গনে, আর ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিক নেতা লেনিনের নেতৃত্বে কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটানো হয়, এবং সকল ইউরোপীয় শক্তির সাথে শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ১৯১৮ এর ২ মার্চ রাশিয়া ব্রেস্ট-লিটভস্কে জার্মানির সাথে এক শান্তিচুক্তি করে।

ধীরে ধীরে এটা স্পষ্ট হয়ে আসে যে এই বলশেভিকরা কেরেনস্কির নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা হলো গোঁড়া মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট। তারা বিশ্বাস করত যে রাশিয়ায় তাদের ক্ষমতায় আরোহণের ফলে সমগ্র বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বার খুলে যাবে আর সেই লক্ষ্যে তারা রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে প্রয়াস পায়। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকান গভর্নমেন্ট এই অসাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা উপলব্ধি করতে বা তাতে অবদান রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আর সংবাদমাধ্যম ও শাসকশ্রেণীর সর্বত্র প্রয়াস ছিল যেন তাদের ওপর এর কোনো প্রভাব না পড়ে। বিশ্ব সংবাদমাধ্যমগুলি এক ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর অপপ্রচারের অপকৌশল গ্রহণ করে। তারা বলশেভিক নেতাদের চিহ্নিত করে বিলাসপ্রিয় রক্তপিপাসু দানবরূপে যার তুলনায় রাস্পুটিনের আমল ছিল পবিত্র ধোয়া তুলসিপাতা। নিঃশেষিত দেশটির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়, বিদ্রোহী ও আক্রমণকারীদের উস্কে দেয়া হয়, বলশেভিক শাসনে সশস্ত্র শত্রুদের কাছে আক্রমণের কোনো কৌশলকেই হীনমন্য ভাবা হয়নি। পাঁচ বছরব্যাপী যুদ্ধে নিঃশেষিত ও বিশৃঙ্খল দেশের শাসনভার কাঁধে নিয়ে ১৯১৯ সালে রুশ বলশেভিকরা তখনও আর্কেঞ্জেলে ব্রিটিশ, পূর্ব সাইবেরিয়ায় জাপানি, দক্ষিণে রুমানিয়া, ফরাসি ও গ্রিক অভিযানের মোকাবেলা করছিল। রুশ অ্যাডমিরাল কোলচাক সাইবেরিয়ায় এবং জেনারেল দেনিকিন ক্রিমিয়ায় রুশ বাহিনী পরিচালনা করছিলেন। ১৯২০ সালে ফরাসিদের দ্বারা উসকানি পেয়ে পোলরা রাশিয়া আক্রমণ করে বসে আর নতুন এক প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেল র‍্যাংগেল, জেনারেল দেনিকেনের হাত থেকে দায়িত্বভার নিয়ে নিজের দেশকেই ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠেন। ১৯২১ সালের মার্চে ক্রোন্সস্টাডে নাবিকরা বিদ্রোহ করে। প্রেসিডেন্ট লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়া সকল বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে। এ সরকার চরম দৃঢ়তা প্রদর্শন করে আর রুশ জনগণ চরম কঠোরতা সহ্য করে নেতৃত্বের প্রতি অবিচল

www.nagorikpathagar.org

থাকে। ১৯২১ সালের শেষ দিকে ব্রিটেন ও ইতালি কম্যুনিস্ট সরকারকে এক প্রকার মান্যতা দেয়।

তবে যদিও বলশেভিক সরকার বিদেশী আক্রমণ ও দেশীয় বিদ্রোহের সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাশিয়ায় একটা নতুন সমাজব্যবস্থা চালু করতে ততটা সফলতা লাভ করতে পারেনি। রাশিয়ার কৃষকরা ছিল ক্ষুদ্র মালিকানার ভূমি বুভুক্ষু শ্রেণী; তারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে ছিল যোজন দূরত্বে; বিপ্লব বৃহৎ জোতদারের হাত থেকে তাকে জমির মালিকানা আদায় করে দিয়েছিল, তবে খাদ্য উৎপাদন থেকে তারা অর্থ উপার্জন করতে পারেনি, প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক কিছুর মতো বিপ্লব অর্থের মূল্য নিঃশেষ করে দেয়। রেলপথ বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে ইতিমধ্যেই কৃষি উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষকের উৎপাদন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে নিজেদের খাদ্য জোগানোর উপায় হিসেবে। শহরে চলছিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। তাড়াহুড়া করে শিল্পক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে গিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়। ১৯২০ এর দিকে গোটা দুনিয়া দেখতে পায় রাশিয়ায় কেমন করে আধুনিক সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ধসে পড়ছে। রেলপথে মরিচা ধরে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে, সর্বত্রই মৃত্যুর পদধ্বনি। তবুও দেশটিকে সীমান্তে শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করতে হচ্ছে। ১৯২১ সালে ভয়াবহ খরার ফলে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে দিনযাপন করছে।

এই প্রচণ্ড দুর্দশার জন্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শিথিল করার নীতি গ্রহণ করা হয়। নতুন এক অর্থনৈতিক পলিসি নির্ধারণ করা হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তি উদ্যোগের অধিকার অনেকটাই ফিরিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই উৎপাদনমুখী কার্যকলাপ অনেকটাই বৃদ্ধি পায়। মনে হচ্ছিল যেন রাশিয়া গঠনমূলক সমাজতন্ত্র থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে, এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রম ফিরে আসছে। কুলাখ নামে এক সমৃদ্ধ কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হলো, যারা ছিল ক্ষুদ্র আমেরিকান কৃষকদের সমতুল্য। ছোটখাটো ব্যবসায়ীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তবে কম্যুনিস্ট পার্টি তার অবস্থান থেকে সরে আসতে প্রস্তুত ছিল না। ১৯২৮ সালে রাশিয়া এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় দেশকে এগিয়ে নেওয়ার। একটি পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় শিল্পের প্রসার বিশেষ করে ভারী ও স্থায়ী সামগ্রী উৎপাদন, আর অন্যদিকে বৃহদাকার সমবায় খামারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। প্রবল প্রতিবন্ধকতার মুখেও এসব প্রকল্প কার্যকর করা হয়, অসুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধারণ জনগণের অশিক্ষা ও পশ্চাৎপদতা আর প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কারিগরের অভাব, সর্বোপরি পশ্চিমা বিশ্বের অসহযোগিতা আর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা। তৎসত্ত্বেও শিল্পক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সাফল্যের দাবি করা হয়। সেখানে ছিল অপচয় ও পরিমিতি বোধের অভাব, তবে অর্জনের মাত্রাও নেহায়েত কম ছিল না। কৃষিক্ষেত্রে এসব

www.nagorikpathagar.org

সাহসী ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলশ্রুতি তেমন সন্তোষজনক ছিল না, আর ১৯৩৩-৩৪ এ রাশিয়া আরো একবার প্রচণ্ড খাদ্য সংকটে পতিত হলো।

অবশিষ্ট পৃথিবী, তখনও যারা পুঁজিবাদী ধারায় ব্যক্তিমালিকানায় উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে, তারা বেশ কৌতূহল নিয়েই রুশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে চলে; তার মধ্যে যেমন ছিল অবিশ্বাস তেমনি ছিল শ্রদ্ধাবোধ। পুরনো ধারাও তেমন সুষ্ঠুভাবে কাজ করছিল না যার চেষ্টা ছিল ক্রয়ক্ষমতা ক্ষীয়মান সংখ্যাল্পের মধ্যে সীমিত রাখা; আর ধীরে ধীরে যার অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তারা আর আত্মতুষ্ট থাকতে পারছিল না। 'পরিকল্পনা" কথাটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছিল। অর্থনৈতিক টানাপড়েন, যার কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব, যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছিল। ১৯৩৩ সাল নাগাদ কোনো আত্মসম্মানীয় রাজনীতিকের পক্ষেই পরিকল্পনার বাইরে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই সারা বিশ্বই রাশিয়াকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়েছিল।

৬৭. যুদ্ধোত্তর উল্লাস

রাশিয়ার এসব ঘটনাক্রম বিশ্ব ইতিহাসকে আজ বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। জার্মান শক্তির পতন ও ১৯১৮ সালের নভেম্বরের যুদ্ধ বিরতিতে এসে আমরা থেমে ছিলাম। বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ বিধ্বংসী যুদ্ধের সমাপ্তিতে বিশ্বব্যাপী এক আনন্দের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল; সান্ত্বনা আর আশাবাদ জাগিয়েছিল; একটা যুদ্ধোত্তর স্বপ্নবিলাস লক্ষ করা গিয়েছিল, যা ছিল ভ্রান্ত বেদনাদায়ক; তবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল না। ১৯১৮ পরবর্তী বিশের দশকটিকে নীতিবাগীশ ও অর্থনীতিবিশারদরা তীব্র সমালোচনা করেন, কারণ এ সময়টাই ত্রিশের দশকের সংকটের দিকে বিশ্বকে ঠেলে দেয়, তবে এই সময়টাতে পৃথিবী কিছু অগ্রগতিও লক্ষ করে, অনেকেই এটাকে স্বর্ণযুগ হিসেবে দেখতে চায়।

যুদ্ধে যুব সম্প্রদায়ের যে গণহারে মৃত্যু ঘটছিল, তা থেকে মুক্তি পাওয়াটাও ছিল এক বিশাল সান্ত্বনা আর এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছিল যে এমন ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। এই বিশ্বাসের একটা শক্ত ভীতও ছিল, আর তা হলো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফা এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের তা মেনে নেয়া। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উন্মুক্ত কূটনীতি এবং গোপন চুক্তি না হওয়া, সমুদ্রপথে সম্পূর্ণ স্বাধীন চলাচল, যতটা সম্ভব সার্বজনীন উন্মুক্ত বাণিজ্য, মোটা দাগে সমরাস্ত্র হ্রাস, শাসিতদের মতামতসাপেক্ষে ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধান, মুক্ত রাষ্ট্র সমাজে রাশিয়াকে স্থানদান আর একটা চুক্তির মাধ্যমে জাতিসমূহে এক সংগঠন সৃষ্টি। এই শর্তগুলি যদি বাস্তবে প্রতিপালিত হতো, তবে হয়তো পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা

www.nagorikpathagar.org

সম্ভব হতো। মানুষের মনে যত দিন এগুলি সতেজ ছিল, তত দিন ভয়ানক যুদ্ধ এড়ানো গেছে, তবে এর কম বিতর্কিত একটা সুবিধা রয়ে যায় রাজা, অভিজাতদের জাল ছিন্নকরণ, এযাবৎ যেগুলি শুধু সমস্যার জন্মদাতাই ছিল। পাশ্চাত্যের পাঠকবৃন্দ, যাদের ওপর এই জ্বালাতনের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না, তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, তবে মহারাজার আমলের যে কোনো ভারতীয়ই মুক্তির স্বাদটা প্রকাশ করে বলতে পারবে।

ইতিহাস মূলত পুরুষ জাতির লেখা বলেই হয়তো ১৯১৮ সালের দ্রুত অগ্রগতি পর্যাপ্তরূপে প্রতিফলিত করতে পারেনি। মানবজাতির অর্ধাংশ মুক্তি পেতে শুরু করে। যুদ্ধের মাঝখানেই ব্রিটেনে মেয়েদের ভোটাধিকার অর্পণ করা হয়, যদিও আংশিকভাবে। আর এটা করা হয়েছিল যুদ্ধোপকরণ নির্মাণে তাদের ভূমিকার কারণে। সদ্য স্বাধীন সব দেশেই, আর ভবিষ্যতে যাদের স্বাধীনতা দেয়ার কথা, মেয়েদের অধিকার দেয়া হয়েছিল, যা ধীরে ধীরে প্রায় পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠছিল। তার অর্থ এই নয়, ভোটাধিকার আন্দোলনকারীরা আশা করেন যে রাজনীতিতে দয়ামায়া, শান্তি স্বাভাবিকতাবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে; বরং এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন অতি সামান্য, তবে মেয়েদের জীবনাচরণে ঘটিয়েছে এক বিরাট বিপ্লব। মুক্তি এসেছে এমনকি রোমান ক্যাথলিক দেশসমূহেও, আর তারপর ধীরে ধীরে এশিয়া ও আফ্রিকায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেও এই ধারা অব্যাহত থেকেছে, এমনকি ইসলামও কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেছে। (১৯৬৩ তে পারস্যে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় যদিও তা গণনা করা হয় না)।

বিশের দশক অর্থনৈতিক অগ্রগতির যুগ হিসেবেও গণ্য করা যায়। ১৯২১ এ সামান্য সংকট সৃষ্টি হলেও শিল্পে যথেষ্ট সমৃদ্ধি এসেছে; বৃহদাকার উৎপাদন বেড়ে চলেছে, আর যুদ্ধকালীন সময়ে সেসবের উপযোগ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যায় পরিবহন ক্ষেত্রে। রেডিওর ব্যবহার ব্যাপকতর হয়, প্রথমে বার্তা ও সংবাদের ক্ষেত্রে তারপর সম্প্রচার। জলপথে পরিবহন দ্রুততর হয়। মোটরগাড়িতে রাস্তাঘাট ছেঁয়ে যায়। ঘোড়া হয়ে গেল অদৃশ্য ; এমনকি বিমান ভ্রমণও আর বিরল দৃশ্য রইল না, ব্রিটিশ বৈমানিক এলকক ও ব্রাউন ১৯১৯ সালে বিমানে আটলান্টিক পাড়ি দিলো। আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি পেল, যাকে ভাবা হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হিসেবে।

তবে এই সমৃদ্ধির ছিল একটা ভঙ্গুর ভিত, ত্রুটির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে পুরনো ধাঁচের সমাজব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠছিল, তার জায়গা দখল করে নিলো আরো বেশি পুরনো ধাঁচের পুঁজিবাদ। জ্বালানি, খাদ্যসরবরাহ, বস্ত্র, গৃহায়ন ও পরিবহনের ওপর যৌথ মালিকানা বা ব্যবস্থাপনা এসবের ওপর ক্ষুদ্র কৃষকের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। ভালো কৃষিভূমির ওপর জমিদারদের মৃগচারণ ক্ষেত্র নির্মাণেও বাধা ছিল না। শিল্প

www.nagorikpathagar.org

মালিকদের অর্থ অর্জনের কোনো বাধা রইল না। যেহেতু পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, একটা ব্যাপক অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। গভীরভাবে অসন্তুষ্ট লোকেরা যে কোনো প্রকারের পরিবর্তনের প্রত্যাশা করে।

ব্যক্তিগত লোভ কখনো সুস্থ অর্থনীতির চালিকা হতে পারে না। তবে বিশের দশকের কিছু কিছু রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতার কারণেই বিপর্যয় ঘটেছিল। জোটের রাজনীতিকরা যারা ১৯১৮ সালে যুদ্ধ অবসানের সন্ধির শর্তসমূহ নির্ধারণ করেছিল, তাদের হাতে তখন যে ক্ষমতা ছিল, কোনো মানুষের হাতে কোনোকালে তেমন ক্ষমতা ছিল না। সারা পৃথিবীতে তারা ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাদের শত্রুরা পরাস্ত আর রাশিয়ার ডামাডোলের মধ্যে ইতিহাসবিদরা স্বভাবতই প্রভাবশালী চার ব্যক্তির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন, যিনি স্বদেশে নিন্দিত ছিলেন উন্মাসিক, একগুঁয়ে, অযোগ্য বলে; যিনি ধূর্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েডের সাথে তাল মিলাতে পারেননি। আর ছিল ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেঁসো, যার মূল লক্ষ্য ছিল যে কোনো মূল্যে ফ্রান্সের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা আর চতুর্থ ব্যক্তি ইতালির অর্ল্যান্ডো, লোভী, ব্যক্তিত্বহীন, দুর্বলচিত্ত। শেষ পর্যন্ত বিশ্বের কাছে অনেক প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়িত করতে পারেনি নেতাদের মতবিরোধের কারণে। ভার্সাই সন্ধি এবং লীগ অব নেশনসের চুক্তিপত্রে যেসব ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। রাশিয়াকে রাষ্ট্রপুঞ্জে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উপনিবেশসমূহকে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বিজিত অঞ্চলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান সাম্রাজ্যসমূহই আরো সম্প্রসারিত করে সেসব এলাকাকে অভিহিত করা হয় "মান্ডেট" নামে। জার্মান ও তুরস্ককেও মান্ডেটভুক্ত হতে বাধ্য করা হয় নিজেদের স্বার্থচরিতার্থের জন্য। জার্মান সীমান্তে অস্ট্রিয়া, রাশিয়ার পশ্চিমাংশ হাঙ্গেরি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়, যাদের ফেডারেশন করা ছাড়া কোনো অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ছিল না, এবং তাদের সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাতে তাদের মধ্যে তিক্ততা বজায় থাকে। উন্মুক্ত বাণিজ্য বা নৌপথে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পুনর্বাসনের নাম করে চলছিল অবাধ লুণ্ঠন, যার অর্থ ছিল পুনর্বাসনের ব্যয়নির্বাহের জন্য জার্মানিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এক বিশেষ কর দিতে হবে।

সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ যে বিষয়টি ছিল, লিগ অব নেশন্‌স্‌কেই হীনবীর্য করে রাখা। এর না ছিল সশস্ত্রীকরণ রোধের ক্ষমতা, না ছিল নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী। জার্মানি, রাশিয়া, তুরস্ক ও অস্ট্রিয়া এর অন্তর্গত ছিল না। কাউন্সিল (যার সদস্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং চারটি নির্বাচিত সদস্য) মাত্র একজনের ভোটেই যে কোনো সিদ্ধান্ত নস্যাৎ করে দেয়া যেত, যার নাম ছিল 'লিবেরাম ভেটো,' কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যান্ডের পার্লামেন্টেই এমন অদ্ভুত প্রথার প্রচলন ছিল। তবে এর প্রতি সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছিল খোদ আমেরিকার সিনেটের কাছ থেকে, যা লিগ অব নেশন্‌সে যোগদানেরই বিরোধিতা করেছিল। এ

www.nagorikpathagar.org

কারণে নয় যে তাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি, বরং এর রিপাবলিকান সদস্যরা সুযোগ পেয়েছিল উইলসন ও তার দলকে একটা শক্ত আঘাত হানার। পরবর্তী বিশ বছর আমেরিকা যদি লিগের অংশীদার হয়ে থাকতে পারত, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হতো।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এ সময় সারা পৃথিবীর সাথে যোগসূত্র হয়ে পড়ল, যা সমস্ত পৃথিবীকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তা নয়, আমেরিকার নিজেরও ক্ষতি হয়েছিল। পরবর্তী যুগ কিছুটা নিষ্ঠুরতার সাথেই যুক্ত করেছিল প্রেসিডেন্ট হার্ডিং, কুলিজ আর হুভারের নাম যেখানে দেখা দিয়েছিল আইনশৃঙ্খলাহীনতা আর দস্যুবৃত্তি (যেগুলি উসকে দিয়েছিল মাদক আইন যার ফলে লোকে আইনভঙ্গের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল)। বেপরোয়া গুজব, জনগণের নৈতিকতার অবক্ষয়, বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা আর বিশ্ব সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা, যার ফলশ্রুতি নেমে আসতে বিলম্ব হয়নি। সর্বশেষ আশংকাটিকে উসকে দিয়েছিল বৈদেশিক ঋণের বোঝা। সেই ঋণের পরিমাণ ছিল মহাজাগতিক, যা করতে হয়েছিল যুদ্ধে অর্থ জোগানোর জন্য, যে ঋণ পরিশোধের দায় চেপেছিল বিজিত রাষ্ট্রসমূহের ওপর, যার ফলে বিপর্যয়কে দ্বিগুণিত করেছিল, রিপাবলিকানরা শুল্ক বৃদ্ধি করে চলেছিল প্রচণ্ড হারে।

ক্ষতিপূরণ ও পরিশোধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল অর্থের অবমূল্যায়ন। যুদ্ধের পরে যা ঘটেছিল অবিশ্বাস্য হারে। শত শত বছর ধরে আমাদের পূর্বজরা মুদ্রার অবমূল্যায়নকে দেখে এসেছেন সবচেয়ে ভয়ংকর এক শাস্তিরূপে। তবে কাগজের মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার এটাকে সহজতর করে দিয়েছিল। হেরিয়েট সরকারের আমলে পাউন্ডের সাথে ফ্রাংকের মূল্যমান ২৫ থেকে ২৪০ এ নেমে গিয়েছিল।। ১৯২৩ এ যখন ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য জার্মানির রুহর প্রদেশে আক্রমণ করে বসে, তখন ডলারের সাথে মার্কের মূল্যমান পাঁচ এর স্থলে নেমে যায় চল্লিশ কোটিতে। রাশিয়ার রুবলের অবস্থাও প্রায়ই একই।

মুদ্রাস্ফীতি বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে এক বিকারগ্রস্ততার জন্ম দেয়। অস্থাবর সম্পত্তি হয়ে পড়ল মূল্যহীন– বন্ধক আদান-প্রদান নিরর্থক, ঋণ পরিশোধ হতে থাকে অর্থহীন মুদ্রায়, পেনশনভোগী ব্যক্তি ও স্বল্পবিনিয়োগকারীরা অনাহারে দিন কাটাতে থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেগুলি বরাদ্দ নির্ভর, সেগুলি বন্ধ হতে থাকে; তবে সঞ্চয় যখন অর্থহীন হয়ে পড়ল তখন নতুন উদ্যোগে অর্থবিনিয়োগ লাভজনক হয়ে পড়ে, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর; বৃহৎ কৃষিফার্মের জন্ম হয়। সমাজতন্ত্রী ও প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল প্রথম ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় উড়ে যাবে, তাদের কথা অগ্রাহ্য হয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা ছিল নির্বীর্য; কারণ রুশবিপ্লবের একটা বড় পরিণাম ছিল রুশ শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত করা। যুদ্ধ সমাপ্তির অনতিবিলম্বে রুশরা প্রতিষ্ঠা করেছিল কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, যার উদ্দেশ্য ছিল লেবার অথবা সমাজতন্ত্রী পার্টির ওপর আধিপত্য স্থাপন এবং দেশের

www.nagorikpathagar.org

ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করা আর তাদের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। কোনো ক্ষেত্রেই তারা ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়নি, তবে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত সর্বত্রই শ্রমিক আন্দোলনকে দুই ভাগে ভাগ করতে পেরেছিল, আর তাদের চিরস্থায়ীভাবে অকার্যকর করতে পেরেছিল।

পৃথিবীর চার একনায়ক যখনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তার সাথেই তারা হয়ে পড়লেন হীনবল, আর তারা যে রূপরেখা বানিয়েছিলেন তাও ভেঙে পড়ল। উইলসন দেখলেন তার সনদ আমেরিকাবাসী প্রত্যাখ্যান করেছে আর তার পার্টিও হয়েছে ক্ষমতাচ্যুত। তার অফিসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই স্ট্রোক হয়ে তিনি মারা গেলেন প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে। শক্তি প্রয়োগে তুরস্ক সন্ধি নস্যাৎ করা হয়। তুর্কি সাম্রাজ্যের আরবীয় অংশের ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থেকে যায়, আরবের মূল ভূখণ্ড বিভিন্ন রাজন্যদের হাতে রয়ে যায়। ফ্রান্স কর্তৃত্ব পায় সিরিয়ার ওপর, ব্রিটেন ইরাক ও প্যালেস্টাইনের ওপর। তবে এশিয়া মাইনরের বড় একটা অংশ তুলে দেওয়া হয় গ্রিসের হাতে। তুর্কিরা গ্রিসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় আতাতুর্ক নামে এক নেতার অধীনে, যিনি তুরস্ককে পুনর্গঠন করেন এবং আধুনিকায়ন করেন, তারা গ্রিকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীকে বলেছিলেন তাদের থামিয়ে দিতে, কানাডীয়রা তা প্রত্যাখ্যান করে। তুরস্কসন্ধি পরিত্যক্ত হয়। রক্ষণশীল দল মনে করে লয়েড জর্জ দেশের জন্য এক দায়, সম্পদ নয়। তারা কোয়ালিশন ত্যাগ করে এবং তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়।

জোর করে চাপিয়ে দেয়া নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলদায়ক হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের সিনফিন বিপ্লব গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯২২ সালে দক্ষিণের ক্যাথলিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের এক-তৃতীয়াংশের স্বায়ত্তশাসন আদায় করে ছেড়েছিল। আইরিশ ফ্রি স্টেট নামের এই অংশ দেশের অপরাংশ প্রটেস্ট্যান্ট অধ্যুষিত উলস্টার প্রদেশের ওপরও কর্তৃত্ব দাবি করেছিল, বেলফাস্টে যার নিজস্ব পার্লামেন্ট ছিল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। তবে সৌভাগ্যবশত সেই দাবি তারা শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পায়নি। চীনা বিপ্লবের প্রাণপুরুষ সান-ইয়াৎ সেন তার তিন নীতির ভিত্তিতে (জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার) ক্যান্টনে এক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন তার দল কুওমিনটাং-এর নেতৃত্বে। ১৯২৬ সালে তার মৃত্যুর পর তার প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাইশেক উত্তরে অভিযান পরিচালনা করেন আর কয়েক মাসের মধ্যেই সেসব যুদ্ধবাদী নেতাদের পরাস্ত করেন যারা এক দশক ধরে চীনকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। শুধু মাঞ্চুরিয়াই কিছুদিন টিকতে পেরেছিল। চীনের ঐক্য শুধুমাত্র স্বল্পকালের জন্যই টিকে ছিল। যে চীনা কম্যুনিস্টরা চ্যাং কাইশেককে সাহায্য করেছিল, শেষ পর্যন্ত তারাই তার বিরুদ্ধে ওঠে দাঁড়াল, যার পেছনে ছিল রুশ নেতা স্টালিনের ইন্ধন। তারা দ্রুতই পরাস্ত হতে থাকে। অভ্যন্তরভাগে নগণ্য অবশেষ থেকে যায়। পরবর্তী বছরগুলিতে চীনে লক্ষণীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে, চীনারা কিছুটা জাতীয়তা ধরে

www.nagorikpathagar.org

রাখতে পারলেও (কারণ বিদেশীরা দেশটাকে সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে) গণতন্ত্রের লেশমাত্র ছিল না, আর সামাজিক ন্যায়বিচারের বিন্দুমাত্রও ছিল না। ব্যাংকার শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীরা ভালো করলেও কৃষক ও শ্রমিকরা তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল।

একটা অদ্ভুত পরিবর্তন পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, আর সেটা ছিল ইতালিতে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান, যা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক ধারা। এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে বিভক্তি, যা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি আর ইতালির নিয়োগদাতা ও ভূস্বামীরা দারুণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল; যার ফলে ইতালিতে সম্মিলিত সমাজতন্ত্রীরা পরস্পরকে অপছন্দ করত; আর তারা যেটুকু করতে পারত তা হলো নিরর্থক ধর্মঘট, অন্তর্ঘাত আর বিশৃঙ্খলা, ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের তাদের না ছিল সামর্থ্য, না ছিল ইচ্ছা। ১৯২২ সালের শেষ দিকে এই সিদ্ধান্তহীনতার স্বাভাবিক কুফল প্রকাশ পেল। ইতালির রাজা মুসোলিনি নামে এক ব্যক্তিকে ডেকে আনল, যার ক্ষমতা ও ইচ্ছা দুটোই ছিল। তিনি ফ্যাসিস্ট নামে নতুন এক পেটোয়া বাহিনী গঠন করলেন; কালো পোশাক পরিহিত যে বাহিনী মার্চ করা শুরু করে দিয়েছিল আর সমাজতান্ত্রিক সভা সমিতি দেখলেই মার শুরু করে দিত। সমাজতান্ত্রিক টাউন কাউন্সিলর, কর্মকর্তারা, ইউনিয়নিস্ট কেউই তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না। মুসোলিনি এক বিভ্রান্ত কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে বিপ্লবী কথাবার্তা থাকলেও বাস্তবে তার কিছুই ছিল না। ইতালির সমস্ত ক্ষমতা এখন তার বাহিনীর হাতে। সরকার হয়ে পড়েছিল স্থবির আর প্রপাগান্ডা চলছিল যে ট্রেন সময়মতোই চলছে, তবে সংবাদ মাধ্যম আর ব্যক্তিস্বাধীনতার লেশমাত্র ছিল না; ইতালি হয়ে পড়েছিল এক জেলখানায়; গণতন্ত্র বলতে অবশিষ্ট ছিল স্বৈরশাসকদের ছড়ি ঘুরিয়ে বিশাল সমাবেশের আয়োজনের মধ্যে। নেতার কথাই ছিল আইন আর তা কঠোরভাবে প্রতিপালনের দায়িত্ব ছিল কালো পোশাকধারীদের। রাজা পুঁজির মালিক আর জমিদাররা যেমন চেয়েছিল তেমন পুতুল না পেয়ে তারা পেল এক মালিককে। তবুও যেহেতু তিনি শক্তিকে ব্যবহার করছিলেন শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে, তাই তারা সন্তুষ্ট ছিল, আর বিদেশী অনেকেই তার শৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করছিল আর নিজেদের দেশে তা আমদানি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্য তারা উৎসাহ বোধ করেনি। মুসোলিনি ঘোষণা করেছিলেন ফ্যাসিবাদ কোনো রফতানিযোগ্য সামগ্রী নয়। যদিও তার অহমিকা ছিল যুদ্ধদেহী, যা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক ব্যাপার সত্যিকারভাবে বাইরের কারো সাথে তিনি ফ্যাসাদ বাঁধান নি; প্রকৃতপক্ষে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে ফ্যাসিস্ট ইতালী লিগ অফ নেশন্সের সাথে অধিকতর সহযোগিতা করেছিল। অন্য যে দেশটি গণ্ডগোল বাধাতে পারত, সেই রাশিয়াও ছিল পুরোপুরি নিশ্চল। স্টালিনের চীনে হস্তক্ষেপ ছিল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তিনি বেশি ব্যস্ত ছিলেন অভ্যন্তরীণ

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলা করতে, যার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল ট্রটস্কি। দৃশ্যত তিনি সমর্থন করছিলেন একদেশীক সমাজতন্ত্র, যা ছিল ট্রটস্কির সামগ্রিক সমাজতন্ত্রের বিপরীত। দুজন বলশেভিক জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের সহায়তায় ট্রটস্কিকে প্রথমত, তার পদ থেকে এবং শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে বিতাড়িত করে; যার জন্য পরবর্তীতে তারা আফসোসও করেছিল। সাধারণের দৃষ্টিতে ১৯২৯ সালে মনে হয়েছিল এবার পৃথিবীতে বুঝি শান্তি আর সমৃদ্ধির যুগ শুরু হলো।

৬৮. মোহমুক্তি

শুরু হলো মহাবিপর্যয়, যারা আশায় বুক বেঁধেছিল, তারা কখনোই ভুলতে পারবে না, যা ঘটেছিল নিউ ইয়র্কের অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ওয়ালস্ট্রিটে ১৯২৯ সালে। শুরুতে তেমন চমক সৃষ্টি করতে না পারলেও, প্রথম দিকে তাড়াহুড়া করে বিপুলসংখ্যক লোকের সিকিউরিটিজ বিক্রি করার মধ্যে অনেকেই কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি আঁচ করতে পেরেছিল। তবে বিক্রি থেমে থাকেনি, যতই দিন যেতে থাকে স্টক মার্কেটে বেশি বেশি বন্ড আমদানি হতে থাকে, আর তার সাথে দরপতন শুরু হয়ে যায়। শিগগিরই দেখা গেল যে এমনকি সবচেয়ে নামী কোম্পানির শেয়ারের মূল্যও আগের মূল্যের এক-চতুর্থাংশে নেমে এসেছে, আর বাজারে কোনো ক্রেতার দেখা মিলছিল না। আমেরিকার ধর্মীয় ব্যক্তিরা ব্যাংকার, শিল্পপতি, যাদের ধারণা ছিল না কী ঘটতে যাচ্ছে, তারা বাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্য বেশি বেশি শেয়ার কেনার চেষ্টা করে; এটা যেন বেড়া দিয়ে বন্যা আটকানোর চেষ্টা; সাময়িকভাবে বন্যা আটকানো গেলেও প্রবল ধস ঠেকানো যায়নি।

ইতিপূর্বেও বাণিজ্যিক বিপর্যয় ঘটেছিল, তবে এবারকার তীব্রতা কেউ কখনো ভাবেনি। এর ফলশ্রুতিও ছিল ভয়াবহ, যা বৈদেশিক ঋণ ও শুল্ক নীতিতেই শুধু প্রভাব ফেলেনি অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগেও বিপর্যয় নেমেছিল। শেয়ার মার্কেটের জুয়াখেলা এতটাই বিস্তৃত হয়েছিল, সর্বত্রই বালতির দোকান খোলা হয়েছিল এবং শ্রমিক ও স্টেনোগ্রাফাররা আগের মূল্যের ষাট ভাগের এক ভাগ মূল্যে শেয়ার কেনার সুযোগ পেয়েছিল এবং কিস্তিতে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার অর্ধেকটাই ঋণে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ক্ষতির পরিমাণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল। প্রফেসর গলব্রেথ তার বই *দ্য গ্রেট ক্র্যাশ* এ দেখিয়েছেন যে আমেরিকার ভারসাম্যহীন অর্থনীতি সামাল দেয়া প্রায় অসম্ভব। ধনীদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল আর কম সৌভাগ্যবানদের দিক থেকে দৃষ্টি সরানো হয়েছিল। দরিদ্র শ্রেণীর রুটি, গোশত, সাধারণ কাপড়ের চাহিদা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করাও সম্ভব ছিল না। দামি মোটরগাড়ি, বিলাসবহুল বাড়ি, আর

www.nagorikpathagar.org

অন্যান্য বিলাস সামগ্রীর চাহিদা কমে যাওয়ায়, আর ধনীরা এসব উৎপাদনে উৎসাহ হারানোয়, বড় বড় কলকারখানা, শিপইয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অবিক্রীত মূল্যবান গাড়ি স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকে আর তাদের মালিক রাস্তার ধারে বসে অ্যাপেল বিক্রি করে, কৃষকেরা দেউলে হয়ে পড়ে আর তাদের ক্ষেতে আগাছা জন্মাতে থাকে। ১৯৩৩ এর শুরুতে হিসেব করে দেখা যায় প্রায় দুই কোটি লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।

আধুনিক বিশ্বে এই বিপর্যয় এক দেশে সীমাবদ্ধ রাখা যায়নি; এটা প্লেগ রোগের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯২৯ এ জার্মানিতে আমেরিকান বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়; আর পরের বছর আমেরিকান ঋণ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। মন্দ, অসৎ অবাস্তব ‘ক্ষতিপূরণ’ নীতির স্বাভাবিক কুপ্রভাব স্পষ্ট হতে থাকে। যে “ক্রেডিট-অ্যানাস্টল্ট ব্যাংক” অস্ট্রিয়ায় পুঁজি সরবরাহ করত তা নিজেই দেউলিয়া হয়ে পড়ে। জার্মান ও ইংল্যান্ডের ব্যাংক এর উদ্ধারে এগিয়ে আসে, তবে তারাও সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বিশাল “ডার্মস্ট্যাডার ব্যাংক” ভেঙে পড়ে। এবার বিপদের মধ্যে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, আর এর দায় মেটাবার মতো যথেষ্ট সোনাও মজুদ ছিল না। সোনার দেখা মিলত কেবলমাত্র প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের ব্যাংকে। প্যারিস ঋণ দিতে রাজি ছিল না আর নিউ ইয়র্ক চাপ দিচ্ছিল ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তনের (বিশেষ করে বেকারভাতা ছাঁটাই) যা শেষ পর্যন্ত চাহিদার ওপরও চাপ কমাবে। দুর্বল শ্রমিক দলের সরকার এটা করার সাহস পায়নি আর শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে পরবর্তী রক্ষণশীল সরকার এসে মেনে নেয়। তবে এটা ভালো ফল বয়ে আনেনি। পাউন্ড ভেঙে পড়ে, আর এর মূল্যমান এক-পঞ্চমাংশে এসে দাঁড়ায়, স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা হয়। লন্ডন ছিল বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্র, আর এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা। একমাত্র যে রাষ্ট্রটি অক্ষত থেকে যায়, তা হলো কম্যুনিস্ট রাশিয়া তবে এর নিজেরও সমস্যা ছিল।

এর ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়। কোনো দেশের জনগণ যদি নিজেদের পছন্দকে দাঁড় করাতে পারে, তাহলে সরকার যতই ক্ষমতাশালী হোক না কেন, তার পতন অনিবার্য। যদি এটা হয় প্রগতিশীল তাহলে প্রতিক্রিয়াশীলরা নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নেয়, যদি হয় রক্ষণশীল তাহলে ক্ষমতা চলে যায় চরমপন্থীদের হাতে। যুক্তরাষ্ট্রে এত দিন রিপাবলিকানরা বাজারের তেজিভাবকে নিজেদের অনুকূলে নিতে পেরেছিল। তবে ১৯৩২ সালে ফ্রাংকলিন ডেলানো রুজভেল্টের নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতা নিয়ে নেয়; স্পেনের রাজা একজন রিপাবলিকের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে নীরবে সরে পড়ে। তবে স্বভাবতই ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেয়। ব্রিটিশ রক্ষণশীলরা তাদের পূর্বসূরি লেবার পার্টির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে সক্ষম হয় তাদের মিত্র লিবারেলদের সহায়তায়, পরবর্তী যুদ্ধের আগ পর্যন্ত। জাপানি যুদ্ধবাজরা তাদের শান্তিবাদী পূর্বসূরিদের উৎখাত করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, পরবর্তী বছরগুলিতে তাদের এক এক করে

www.nagorikpathagar.org

হত্যা করতে থাকে। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে ও দক্ষিণ আমেরিকার স্বৈরশাসকরা একের পর এক পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে নিজেরা এক হাতে ক্ষমতা দখল করতে থাকে। সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটে জার্মানিতে, যেখানে পার্লামেন্ট ধসে পড়ে এবং অ্যাডলফ্ হিটলারের অধীনে নাৎসিরা ক্ষমতা দখল করে। এভাবে একের পর এক বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা ধ্বংস হওয়ায় আন্তর্জাতিক বিপর্যয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই কেবলমাত্র প্রগতিশীল ধারার সরকার সমতায় টিকে থাকে এবং তারাও ভ্রমাচ্ছন্ন হয়ে ভাবতে শুরু করেছিল নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় বৈদেশিক সমস্যা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা। যদিও খুব কম লোকই জানত যে লীগ অব নেশন্সের ইতিমধ্যেই মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে, কারণ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির একে বাঁচিয়ে রাখার না ছিল ক্ষমতা না ছিল ইচ্ছা, কারণ একনায়করা বুঝে গিয়েছিল বলপ্রয়োগ থামাবার শক্তি কারোরই নেই।

এ মুহূর্তে দুটি শক্তিধর রাষ্ট্র ছিল যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া, যাদের ইতিহাস মূল ধারা থেকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। প্রথমটি, প্রাথমিক বিপর্যয় সামাল দিয়ে একজন প্রতিভাবান উদ্ভাবক রুজভেল্টের নেতৃত্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে কিছু আলো দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমে ১৯৩২ সালে নির্বাচিত হয়ে তিনি পরপর আরো তিনবার ১৯৩৬, ৪০ ও ৪৪ সালে পুনর্নির্বাচিত হন; মৃত্যুই শুধু তার ক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পেরেছিল। তার প্রত্যুৎপন্নশক্তি দেশের মানসিকতাকেই বদলে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি এক উন্মত্ত পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় এসেছিলেন যখন জাহাজ, রেলপথ, মিল, কারখানা, খামার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল, কারণ তাদের উৎপাদন আর সেবা অবিক্রীত পড়ে থাকত। এই পক্ষাঘাতগ্রস্ততা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটায়নি আর যে সব মহাপুরুষ এই বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, তাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না একে স্বস্থানে পুনর্বাসিত করার। তাই রুজভেল্ট ক্ষমতায় এসে একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। জনগণ তার নতুন ব্যবস্থার কদর করতে শুরু করল, আর তার ব্যর্থতাকেও ক্ষমার চোখে দেখল। অনেক অক্ষর– A.A.A. N.I.R.A. C.C.C. P.W.A. W.P.A ইত্যাদি এখন লোকে এর তাৎপর্য ভুলে গেছে বটে, তবে সে সময় এগুলি দরিদ্র, দুর্দশা, আর অনাহারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করতে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল টেনেসি রিভার ভ্যালি অথরিটি, একটা স্বাধীন রাষ্ট্রে গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে এটাই ছিল সর্ববৃহৎ, যা একটি হতাশাগ্রস্ত এলাকাকে সম্পদ ও শক্তির উৎসে পরিণত করেছিল। সমান কার্যকরী ছিল ভাগনার অ্যাক্ট যা, পৃথিবীর সবচেয়ে স্বেচ্ছাচারী আমেরিকান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে, তার শ্রমিক সংগঠনকে মান্যতা দিতে এবং তাদের সাথে ব্যবসা করতে বাধ্য করে। আজ যদি আমরা ত্রিশের সেই দুঃসময় থেকে আমেরিকাকে আলাদাভাবে চিনতে পারি, তাহলে সেটি রুজভেলেটের দীর্ঘস্থায়ী শাসনামলের কৃতিত্ব।

তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, যেমনটা স্বদেশেও, রুজভেল্ট তার দেশবাসীর ইচ্ছার বাইরে যেতে পারেননি। দেশে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতেও তিনি দু-একটি পদক্ষেপ

www.nagorikpathagar.org

নিয়েছিলেন (উল্লেখ করা যেতে পারে তার "কোয়ারান্টাইন" বক্তৃতা); তবে তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের রাজনীতিবিদ; তিনি গণঅসন্তোষের আঁচ করতে পেরে চুপ করে যান। যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন আর বিচ্ছিন্নতাবাদীই রয়ে যায়।

রাশিয়া বিচ্ছিন্ন থাকলেও সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে স্বতন্ত্র কিছু চলছিল। ইতিমধ্যে ঘোষিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঠিকমতোই এগিয়ে চলছিল; আর রাশিয়া ও তার বাইরে প্রচার চলছিল যে চার বছরের মধ্যেই তা শেষ করা সম্ভব হবে। তারপর শুরু হলো আর একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এসব সাফল্যের দিকে বাইরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলছিল, আর সেসব পুরোপুরি কাল্পনিকও ছিল না। ডন উপত্যকা, উরালের ম্যাগনিটোগোরস্ক, সাইবেরিয়ার কুজনেটস্ক, আর ককেশিয়ার বিভিন্ন এলাকা, কারাগান্দা আর তুর্কমেনিস্তানে সত্যিকারের শিল্পে অগ্রগতি লক্ষ করা গিয়েছিল। আর বিশ্ববাসী এতে অভিভূত হয়ে গেল যখন তারা নিজ দেশে দেখল বেকার লোকের দীর্ঘ লাইন। সোভিয়েত ইউনিয়নে কাউকে বেকার থাকতে হচ্ছিল না। ব্যক্তিজীবনে কে কতটা স্বাধীনতা ভোগ করছে তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামাচ্ছিল না, আর কেউ তেমটা করলেও চরমপন্থীদের চিৎকারে তা চাপা পড়ে যেত, যারা তাদের মোহজালের বাইরে আসতে পারত না। রাশিয়ার বিপ্লবে হৃদয় বিদারক কিছু ঘটছিল, অনেক বিপ্লবেই ঠিক তাই ঘটে থাকে। রোমান বিদ্রূপ বাক্যে যেমন বলা হয় করাপ্টিয়ো অপটিমি পেসিমা অর্থাৎ সর্বোত্তম দুর্নীতিগ্রস্তরা নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যায়।

রুশবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল যে কোনো বিপ্লবের চেয়ে সংখ্যাল্পদের দ্বারা, রাশিয়ার কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লব বোধের লেশমাত্র ছিল না। বলশেভিক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বা আরো নানারকম গণতন্ত্রীদের অধিকাংশই বিপ্লব চলাকালে বা পরবর্তী যুদ্ধে মারা পড়ে। এটা প্রায় নিশ্চিত যে তাদের মার্জিত মানসিকতা বা অভ্যাস অর্ধ-বর্বর সাধারণ জনগণের ওপর কোনো ছাপ ফেলবে না। পৃথিবীর কাছে স্বল্প পরিচিত কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি যুগাশভিলি নামে এক ব্যক্তি যার দলীয় নাম ছিল স্তালিন, এই পরিস্থিতিকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগান। তার ছিল এক ভারী মোছ, কৃত্রিম প্রোলেতারীয় মুখোশ আর আমেরিকীয় রাজনৈতিক মুরুব্বিদের মতো বিবেকহীন দক্ষতা। রাশিয়ায় গণতন্ত্র বলতে কিছু ছিল না; মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশ চলছিল তার নাম "ডিক্টেটরশীপ অব দ্য প্রলেতারিয়া", আর যেহেতু কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল বিপ্লবের নেতৃত্বে, তাই এটা পরিবর্তন হয়ে পরিণত হলো ডিক্টেটর অব দ্য কম্যুনিস্ট পার্টিতে, আর সোভিয়েত তার সকল কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলল এবং পার্টির মধ্যেও দেখা দিল একনায়কতন্ত্র। ট্রটস্কি এর অবসান চাইলেন : যে কারণে স্তালিন তার অনুগত দলবল নিয়ে তাকে প্রথমে পার্টি থেকে এবং তারপর দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন অবশেষে মেক্সিকোতে তাকে হত্যা করা হয়। শিগগিরই অনেকেই তাকে অনুসরণ করল। কামেনেভ, বুখারিন, জিনোভিয়েভ ও লেনিনের সব কমরেডরা সবাইকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের দালাল আখ্যা দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

হত্যা করা হলো বিচারের প্রহসনের মধ্য দিয়ে। হাজার হাজার লাখ লাখ সাধারণ লোককে গণ বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়; আর তার চেয়েও দশ গুণকে গোপন বিচারে। স্তালিন হত্যার নেশায় মেতেছিলেন ঠিক আইভ্যান দ্য টেরিবলের মতোই, যে-ই তার বিরোধিতা করেছে তার ভাগ্যেই মৃত্যু। বিপ্লবীদের নামের জায়গায় উঠে আসে অনুগতদের নাম যেমন ইয়াগোদা, বেরিয়া বা ক্রুশ্চেভ, তারাই একনায়কের অনুকম্পায় সিক্ত হয়ে যায়; আর তার হুকুম তামিল করে কোনোরূপ প্রশ্ন ছাড়াই। ছিল এক আতংক, তবে সে আতংক বিপ্লবের আতংক নয়।

যেসব মহান ব্যক্তি ইতিপূর্বে সফল বিপ্লবী ছিলেন যেমন দ্বিতীয় চার্লস বা অষ্টাদশ লুই বা আরো অনেকে, তার চেয়ে এক দিক দিয়ে স্তালিন সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন, আর তা হলো তিনি যে বিপ্লবকে ধ্বংস করেছিলেন সেই বিপ্লবের কথামালা আর মর্যাদাকে ব্যবহার করতেন। যখন রাশিয়ার সর্বত্র জেলখানার ক্যাম্প চোখে পড়ছে, আর সাধারণ জনগণ গোপন পুলিশ বাহিনীর পায়ের চাপে পিষ্ট, বিদেশে কর্মরত কম্যুনিস্ট পার্টির লোকেরা যাদের সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, তারা তখনও শ্রমিক বান্ধবরূপে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বে তারা সরকার ও নিয়োগদাতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। আর নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে জার্মানির নাৎসি বাহিনীই শত্রুরূপে, রাশিয়ার প্রতি যাদের ঘৃণা গোপন থাকেনি। বিপ্লবী কম্যুনিজমের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠছিল ঠিক সে সময়ে যখন তা আর সত্যি ছিল না। হেগেলের যে কথাটার মার্কস প্রায়ই উদ্ধৃতি দিতেন তা হলো "মিনার্ভার পেঁচাটা সন্ধ্যাবেলাতেই পাখা মেলে।"

ভ্রান্তিটা সহজবোধ্য কারণ বিভ্রান্ত পৃথিবীর সামনে এমন এক ভীতি উঁকি মারছিল, যে কোনো মিত্রই সুস্বাগত ছিল : আর সেটা ছিল নাৎসিবাদ, ঐতিহাসিকভাবে যা ছিল ফ্যাসিবাদেরই সম্প্রসারণ, যার নেতৃত্বে ছিল এক গতিশীল কিন্তু বিপজ্জনক নেতা। তবে পরিমাণগত পরিবর্তন, গুণগত পরিবর্তনও আনতে পারে (একটা জনপ্রিয় মার্কসীয় বক্তব্য)। নাৎসিবাদ ছিল একটা কার্যকরী নতুন মতবাদ, আর শিগগিরই এর প্রভাব দৃশ্যমান হতে থাকে।

এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন অস্ট্রিয়ার ক্ষুদ্র এক অফিসারের পুত্র একজন চিত্রকর, প্রায় একজন ভবঘুরে যার নাম এডলফ্ হিটলার। তার চেহারা ছিল অনুজ্জ্বল, ছোট কালো গোফ, গোল গোল সম্মোহনকারী চোখ আর প্রভাবস্তিারী ব্যক্তিত্ব। তার মুখ থেকে বাক্য ঝরত বৃষ্টির মতো, যদিও তিনি ছিলেন আংশিকভাবে উন্মাদ তবে সেই উন্মাদনায় জার্মানির অনেকেই অংশ নিয়েছিল। তার কর্মসূচি মুসোলিনির চেয়ে কম সামঞ্জস্যহীন ছিল না, তবে এসব কার্যকর করার ব্যাপারে তিনি বেশি সফল ছিলেন। যত দিন জার্মান অলৌকিক ঘটনা ১৯১৮ এর বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা অব্যাহত ছিল, তত দিন তার আশ্রিত রাজ্যে তার প্রভাব ছিল ক্ষীণ; তবে ধসের পরই তার দল হঠাৎ ওপরে উঠে এলো। ১৯৩০ এর নির্বাচনের আগে রাইখস্ট্যাগে নাৎসি ডেপুটি সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন; সেই নির্বাচনের পরে তার সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ১০৭। মুসোলিনির প্রপাগান্ডার

www.nagorikpathagar.org

সাথে তিনি নতুন যে দুটি বিষয় যোগ করেন তা হলো প্রথমত, ১৯১৮ সালে জার্মান বাহিনীর যে পরাজয় ঘটেছিল তা ছিল অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ফলে আর ভার্সাই শান্তিচুক্তি ছিল চাপিয়ে দেয়া যার কোনো বৈধতা নেই; দ্বিতীয়ত, জার্মানদের দুর্দশার মূলে ছিল ইহুদি পুঁজিবাদ। নাৎসি শব্দটি জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ : হিটলার তার ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন সমাজতান্ত্রিক কথামালা দিয়ে, তবে প্রথম থেকেই ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি তার উষ্মা প্রকাশ পায়। বিতাড়িত রাজতন্ত্রী আর অভিজাততন্ত্রের জায়গা দখল করে বণিকশ্রেণী, যার পুরোভাগে ছিল হুগেনবার্গ থাইসেন, স্টিনেস্ আর ক্রুপের মতো ব্যক্তিরা যাদের না ছিল গণমুখী মানসিকতা, না ছিল সামাজিক নীতিবোধ। তারা এমন একজন লোককে অর্থ জুগিয়েছিল যার দলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল লালবাহিনী ও ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করে জার্মানিকে তার আগের শক্তি ও গৌরব ফিরিয়ে দেওয়া। হিটলারকে তার অভিযান পরিচালনার অর্থ সরবরাহ করে তারা এক প্রভুকে নিয়ে এলো, ভৃত্যকে নয়, তবে এটা তারা বুঝতে পারেনি।

১৯৩০ সালে তার পেছনে ছিল সুশিক্ষিত বাদামি শার্টের এক বাহিনী, রাইখস্ট্যাগে তার ১০৭ ডেপুটি, আর বিরোধীপক্ষে ছিল একতাবিহীন, সন্ত্রস্ত, তার ক্ষমতার শিখরে ওঠার একমাত্র প্রতিবন্ধক ৮৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ, যিনি ১৯৩২ এর নির্বাচনে সামান্য ব্যবধানে তাকে হারিয়েছিল। বুড়োটা প্রতিজ্ঞা করেছিল এই উটকো নেতাকে কখনোই চ্যান্সেলর হতে দেবেন না, তবে তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ আর জার্মানরা ছিল বেকার, ভুখা আর হতাশাগ্রস্ত। ১৯৩৩ সালের শুরুতে তিনি হিটলারকে চ্যান্সেলর করতে বাধ্য হলেন আর এর সাথেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল। কোনো ফ্যাসিস্ট বা কম্যুনিস্ট নেতা কখনো জনমতের দ্বারা অপসৃত হন না।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে হিটলার তার অভ্যন্তরীণ বিরোধীদের অসহায় করে তুললেন, যা করতে মুসোলিনির লেগে ছিল অনেক বছর। বাইরের দিক থেকে তিনি মুসোলিনির সাথে একটা জোট গঠন করলেন, যার নাম ছিল অক্ষশক্তি। তারা কল্পনায় ইউরোপের এক মানচিত্র এঁকেছিল; তবে শিগগিরই এর সাথে যুক্ত হলো আর এক শক্তিধর দেশ জাপান, যারা মোটেই আর্য ছিল না; তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করার মতো মনের জোরও ছিল না। জাপানি সামরিক জান্তার পেছনে যে তাগিদ কাজ করেছিল সেটা মুসোলিনি বা হিটলারের মতো ছিল না। বেকারত্ব আর অনটনের চাপে জার্মানি ও ইতালি মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নতুন সরকার তাদের কাজ দিয়েছিল। খাদ্য দিয়েছিল, তাই কাল আর বাদামি বাহিনীর সামনে কেউ মুখ খুলতে সাহস পেত না। জাপানিদের বহুবর্ণ শার্ট বা নতুন দর্শন কোনোটারই দরকার ছিল না; তাদের দরকার ছিল যুদ্ধ করা আর বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা করা। তারাই সবচেয়ে আগে বুঝতে পেরেছিল সেই মুহূর্তে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাই কার্যকর নেই যারা তাদের নিকটতর ও দুর্বলতর প্রতিবেশীদের সহজ শিকারে পরিণত করতে বাধা দেবে। ১৯৩৩ অব্দে তারা ঢুকে পড়ে চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে; আর ১৯৩৬ এ তারা

www.nagorikpathagar.org

গোটা চীনের ওপরই সর্বাত্মক হামলা চালায়। চিয়াং কাইশেক সরকার প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সে কম্যুনিস্টদের সাথে একটা অস্বস্তিকর চুক্তি করে, তবে এটা তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি; বরং তাদের যৌথ প্রতিরোধ ছিল অসংগঠিত, সন্দেহপ্রবণ আর দুর্বলভাবে সজ্জিত। সম্মুখযুদ্ধে জাপানিরাই জয়ী হয়, তবে তারা চীনের বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারেনি, তারা কি সত্যি একটা দেশ জয় করেছে, না শুধু জলাভূমিতে পদ সঞ্চার করেছে।

পশ্চিমে এ ধরনের সন্দেহের অবকাশ ছিল না। হিটলার আর মুসোলিনির অগ্রযাত্রা ছিল পুরোপুরি সুসমন্বিত, আর তখন পর্যন্ত পরিষ্কার হয়নি হিটলারই আসল সঙ্গীত পরিচালক কি না? বৃদ্ধ হিন্ডেনবার্গের দেহাবসানের পর হিটলার নিজেই তার জায়গাটা নিয়ে নেন, আর ১৯৩৫ সালে ঘোষণা করেন ভার্সাই চুক্তির অবসান হয়েছে। তিনি পুরোদমে সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ আর প্রকাশ্যে অস্ত্রসজ্জা শুরু করে দেন। এবার স্পষ্ট হতে থাকে যে তার বিরোধীরা কাষ্ঠপৌত্তলিকা ছাড়া কিছু নয়। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে প্রতিবাদ তারপর সুড়সুড় করে জার্মান বাহিনীর নৌবহরের আকার নির্ধারণ করে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে, এর পরের বছর মুসোলিনি আর এক ধাপ এগিয়ে যায়; সে সরাসরি লিগ অব নেশন্সের এক সদস্যরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। এক তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে ইতালীয় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে বসে; আসল কারণ ছিল ১৮৯৬ সালে আবিসিনিয়া আদোয়ায় এক ইতালীয় বাহিনীকে পরাজিত করে। মুসোলিনি এর প্রতিশোধ নিয়ে এক ইতালীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ফ্যাসিস্টদের রোধ এবং আর একটা বিশ্বযুদ্ধ থামানোর একটা সুযোগ এসেছিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে লিগ অব নেশন্সের ৪২টি সদস্যরাষ্ট্রের সম্মেলনে ইতালির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুয়েজ চ্যানেলের মধ্য দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস ও অস্ত্রশস্ত্র আগ্রাসীদের হাতে পৌঁছতে থাকে আর ১৯৩৬ এর মে মাসে ইতালীয় বাহিনী আবিসিনিয়ার রাজধানীতে পৌঁছে যায়। লিগ অব নেশন্স পরিণত হয় এক অকার্যকর সংস্থায়। আর এর গলা কাটার দায়িত্ব পালন করেন যে দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি তারা হলেন ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি স্যর স্যামুয়েল হোর আর ফরাসি প্রধানমন্ত্রী পিয়ের লেভাল। তবে তাদের ভাগিদার এই দুই দেশের সরকারকেও বহন করতে হয়, যারা তাদের দুষ্কর্ম আর নিষ্কর্মকে সমর্থন জুগিয়েছিল।

সেই একই বছর ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিস্ট বাহিনী আরো একটা দুঃসাহসিক আক্রমণ চালিয়েছিল, তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে পশ্চিমা সরকারগুলি এর পরিণাম এবং তাদের নিজেদের পরিণতি মোটেই আঁচ করতে পারেনি। স্পেন প্রজাতন্ত্রে রাজা আলফন্সোর উত্তরাধিকার পুরোপুরি সফল হয়নি। সন্দেহ নেই এটা স্পেনের জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিল, তবে তাদের ক্ষুধা থেকে মুক্তি দিতে

www.nagorikpathagar.org

পারেনি। অযোগ্যতা ও অন্তর্ঘাতের কারণে এর পার্লামেন্ট বাতিল করে দেওয়া হয়, আর স্পেনের অভিজাতদের এস্টেট অধিগ্রহণ করে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এমনকি গির্জার অঢেল সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ফ্রাংকো নামে একজন জেনারেল নিজেই নিজেকে স্বপদে বহাল করেন। পশ্চিমা শক্তিসমূহ বৈধ সরকার কর্তৃক সরবরাহ আটকে দেওয়ার জন্য বর্তমান চুক্তিসমূহ ভঙ্গ করে। তৎসত্ত্বেও বেসরকারি সাহায্য ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবীগণ ইতালীয় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে গুয়াদালাজারার যুদ্ধে ঠেকিয়ে দেয়। তবে স্পেনীয়দের জন্য একমাত্র সাহায্য আসে রাশিয়ার কাছ থেকে। এজন্য তাদের মূল্য দিতে হয়েছে, এটা ছিল খুবই মূল্যবান কারণ পশ্চিমা চরমপন্থীদের মধ্যে যাদের স্তালিনবাদের প্রতি সন্দেহ ছিল, তাদের কিছুটা আস্থা ফিরে আসে। এতে স্প্যানিশ কম্যুনিস্ট পার্টির শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়, যদিও তখন পর্যন্ত এটা ছিল নগণ্য এক সংগঠন। অবিলম্বে রিপাবলিকান ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা বড় ধরনের বিভেদ সৃষ্টি হয়। রাজতন্ত্রবাদীদের উৎসাহের ফলে ফ্র্যাংকো বাহিনী তার রাজ্যসীমা বাড়িয়ে চলেছিল। আর জার্মান বিমানবাহিনী বাস্ক শহর গুয়েরনিকা ধ্বংস করে এতে একটা বড় অবদান রেখেছিল। নির্বিচার পাশবিক গণহত্যা পশ্চিমা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল আর এ নিয়ে রয়েছে পিকাসোর সেই মর্মস্পর্শী চিত্রকর্ম। তবে সেই মর্মাহত হওয়া পর্যন্তই, কেউই বুঝতে পারেনি যে গুয়েরনিকা ছিল জার্মান বড় যুদ্ধের এক মহড়া, যে যুদ্ধ তখন পর্যন্ত রোধ করা সম্ভব ছিল। কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্স যে অনাক্রমণ সমিতি গঠন করেছিল, আর যাতে হাস্যকরভাবে ইতালিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নৌ ও সাবমেরিন আক্রমণের নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করা, আর ব্রিটিশ নৌশক্তি এটা কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ, আর এই আজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকরও করা হয়। তবে অন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, আর স্প্যানিশ রিপাবলিকের ভাগ্য এভাবেই নির্ধারিত হয়ে যায়। এ মুহূর্তে যে জিনিসটির বড় অভাব ছিল তা হলো নাৎসি আর ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে প্রতিরোধের কোনোরূপ চেষ্টা হয়নি, শক্তির কোনো অভাব ছিল না। আর জার্মানদের অবিরাম অস্ত্র মজুদ করার মাধ্যমে সেই শক্তিকে খর্ব করার প্রচেষ্টা। ইতালির অস্ত্রসজ্জা তেমন বড় কিছু ছিল না। শুধুমাত্র নেভি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসোলিনির রাজকীয় বাহিনী ছিল নেহাৎ আটপৌরে আর নাবিকদের অনীহার কারণে তাতেও ঘাটতি ছিল। সাধারণ ইতালীয়রা নাৎসিদের মতো উন্মাদ ছিল না। হিটলার গড়ে তুলছিলেন এক বিরাট বাহিনী। অতুলনীয় বিমানবাহিনী আর মাঝারি নেভি আর অদম্য জনশক্তি জোগানোর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল।

একটু একটু করে তিনি জার্মানির সীমা বৃদ্ধি করে চলেছিলেন, যাতে তার বেস শক্ত করে গড়ে তোলা যায়। ১৯৩৮ সালে তিনি অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে জয় করে নেন, যাতে তার রাজ্যের সীমা ইতালির কাছাকাছি চলে যায়। মুসোলিনির সাথে এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি, আর তিনি এটা পছন্দ করেননি। তবে

www.nagorikpathagar.org

এ মুহূর্তে জার্মান ডিক্টেটর যা করছে তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একই বছরের শেষ দিকে হিটলার ঘোষণা করলেন চেকোশ্লোভাকরা সেদেশে জার্মানদের ওপর যে অত্যাচার চালাচ্ছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। আর তিনি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এর প্রতিকার করতে চান। চেকোশ্লোভাকিয়া সে সময় ফ্রান্সের সাথে জোটবদ্ধ ছিল, আর ফ্রান্সের সাথে ছিল ব্রিটেন। দেশটি তাদের সাহায্য চেয়ে বসল, তবে তারা যেটা পেল তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মিউনিখে ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি আর জার্মানি এই চতুঃশক্তির এক সম্মেলন, যাতে তাদের বাধ্য করা হলো জার্মান সীমান্তবর্তী জেলাগুলি জার্মানিকে ছেড়ে দিতে, আর তাদের কোনোরূপ আত্মরক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হলো না। মাননীয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন লন্ডন বিমানবন্দরে নামলেন হাতে এক টুকরো কাগজ ওড়াতে ওড়াতে, যেটা ছিল হিটলারের সাথে চুক্তিনামা, আর তিনি ঘোষণা করলেন "আমার বিশ্বাস, এটাই হলো একালের শান্তির দলিল।"

২২. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ

www.nagorikpathagar.org

১৯৩৯ সালের শুরুতেই হিটলার চেকোশ্লোভোকিয়া আক্রমণ করে সমগ্র দেশটি অধিকার করে নেয়; এর অনতিবিলম্বে মুসোলিনিও আলবেনিয়া আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। অক্ষশক্তি এবার পুরোপুরি প্রস্তুত।

এবার ব্রিটিশ সরকারের বোধোদয় হয়, আসলে কী ঘটতে চলেছে। (ফ্রান্স ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত; অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ মোটামুটি অসহায়, আর যুক্তরাষ্ট্র তখন পর্যন্ত বাস করছিল বোকার স্বর্গে)। মিত্রদের মধ্যে একমাত্র তৎপর ছিল রাশিয়া; যে ছিল হিটলারের বিশেষ ঘৃণার পাত্র, যার বিরুদ্ধে তিনি তার ভয়াবহ বক্তৃতার ঝড় বইয়ে চলেছিলেন। অনিচ্ছাভরে ব্রিটেন মস্কোয় এক মিশন পাঠায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন এক নিম্নপদস্থ অফিসার যার উদ্দেশ্য ছিল, শেষ মুহূর্তে সন্ধিচুক্তি করা যায় কি না? তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ এর অনেক আগেই স্তালিন তার ঘাড় থেকে রুশ বিপ্লবের নীতিমালা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন, আর তাই নাৎসিদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে আর কোনো বাধা নেই। কারণ ইতিমধ্যে স্তালিন নাৎসি এবং পশ্চিমাদের তার দুই সমমানের অনুগ্রহপ্রার্থী বলে মনে করতে শুরু করেছেন। তার সব রকম পাগলামি সত্ত্বেও হিটলার ছিলেন অতি ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। যেদিকে তার জন্য ভালো শর্ত, তিনি সেদিকে। ফ্রান্স আর রাশিয়ার মাঝখানে জার্মানি আর তার পাশে সমুদ্রে ব্রিটেনের আধিপত্য। জার্মানিকে মনে হয়েছিল যাতির মাঝখানে সুপারি। একবার রাশিয়া সরে গেলে জার্মানির জন্য যুদ্ধ জয় সহজতর হবে। রাশিয়ার সাথে পরে চুকানো যাবে। তবে স্তালিনের যেমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল, তেমনি ভৌগোলিক জ্ঞানও ভালোই ছিল; পৃথিবীর অনেকেরই সমর্থনে, এমনকি রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনে রাশিয়া জার্মানির সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়। চুক্তির বিস্তারিত শর্ত জানা যায়নি, আর কোনো কোনো শর্ত চিরকাল অজ্ঞাতই থেকে যায়। তবে পোল্যান্ড ভাগাভাগির মাধ্যমে একটা শর্ত অন্তত প্রকাশ পায়। ১৯৩৯ এর ১ সেপ্টেম্বর হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে নতুন এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

৬৯. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সালে নাৎসিরা যে যুদ্ধের সূচনা করে, পরবর্তীকালে উইনস্টন চার্চিল তাকে অভিহিত করেন অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধরূপে। একাধিকবার এই যুদ্ধ বন্ধের সুযোগ এসেছিল। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই সে সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কারণ ছিল, তবে সবার জন্য সাধারণ যে কারণটি ছিল, তা হলো সত্যের মুখোমুখি হতে অনীহা– তাদের বিশ্বাস, অপ্রীতিকর বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যেই শান্তি নিহিত। হিটলার কখনো তার আসল উদ্দেশ্য ঢাকার চেষ্টা করেননি। যে কেউ যদি তার "মেইন কাম্ফ" বইটি পড়ে বা জার্মানিতে গিয়ে তার বক্তৃতা শুনে

www.nagorikpathagar.org

থাকে, তার কাছে এটা পরিষ্কার হবে। তবে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের রক্ষণশীলরা ভেবেছিল, তাদের মতো হিটলারেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিজমকে দমিয়ে রাখা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির ক্ষমতা-খর্ব করা; আর-রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা ভেবেছিল তারা তাকে মিত্ররূপে পাবে। আর যুক্তরাষ্ট্র তার শক্তিকে পাত্তাই দেয়নি। কাজেই জার্মানরা তার চারপাশে চারটি নির্জীব প্রতিপক্ষকে দেখতে পেয়েছিল। স্তালিনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাশিয়ার সমস্ত বিরোধীদের নির্মূল করা আর নিজেকে জারের চেয়ে বেশি স্বৈরাচারী হিসেবে গড়ে তোলা; তিনি চেয়েছিলেন এটা করার জন্য দরকার হলে তিনি একাই বেঁচে থাকবেন। ব্রিটেন ছিল নেভিল চেম্বারেলনের শাসনাধীন, যাকে নিয়ে লয়েড জর্জের মন্তব্য ছিল– তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে বড় জোর মন্দার বছরে বার্মিংহাসের লর্ড মেয়র করা যায়। আর ফ্রান্সের দায়িত্বে ছিল ষাঁড়ের মতো স্ফিতকায় এক ব্যক্তি দালাদিয়ের, যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। তার চেয়ে আমেরিকার রুজভেল্ট ছিলেন অনেক বেশি বুদ্ধিমান আর সাহসী। তবে তার হাত-পা বাঁধা ছিল তার দেশের জনমতের দ্বারা।

যখন তার সব শত্রুরা বাস করছে স্বপ্নরাজ্যে, সন্দেহ নেই সে সময় হিটলার বেশ কয়েকটা চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করলেন, যদিও সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সেগুলি পোল্যান্ডের কাছে দায়বদ্ধ ছিল, তবুও ফরাসি ও ব্রিটিশ সরকার তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার আগে বেশ কয়েকবার ভাবার প্রয়োজন বোধ করে। এমনকি তখন পর্যন্ত ফ্রান্স ম্যাজিনো লাইন নামে তার এক দুর্গবলয়ের ওপারে নিরাপদ দূরত্বে থাকাকেই শ্রেয় ভাবতে থাকে (যে বলয় তাকে সমুদ্রে প্রবেশপথ করে দিতেও সক্ষম ছিল না) আর ব্রিটেন তার নৌবহরকে সমুদ্রে টহলদারি করাকেই যথেষ্ট মনে করে। এক পক্ষকালের মধ্যে পোলিশ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। জার্মান আর রুশরা ব্রেস্ট লিটভস্কে মিলিত হয়ে পোল্যান্ডকে ভাগাভাগি করে নেয়। মিত্রশক্তি এই ঝটিকা যুদ্ধের কোনোরূপ পূর্বাভাস অর্জন করতে পারেনি, তারা নিষ্ক্রিয়ই রয়ে যায়, তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়, যাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলা যায়– এমনকি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাকেও। অক্টোবরের শুরুতে যখন সর্বশেষ পোলিশ সৈন্যটি আত্মসমর্পণ করে, স্তালিন বাল্টিক অঞ্চলে তার লুটের ভাগ নিতে এগিয়ে যায়। পোল্যান্ডের সাথে সে এস্তোনিয়া লাতভিয়া আর লিথুনিয়াও যোগ করে নেয়। আর একপেশে সন্ধির মাধ্যমে ফিনল্যান্ডও দখলে নিতে চেষ্টা করে। তবে এই দেশটা ছোট হলেও ছিল বেশ শক্ত, এ কোনোরকম চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। নভেম্বরে বিশাল এক রুশ বাহিনী দেশটিতে আক্রমণ চালায়, ফিনিশদের প্রতিরোধ ছিল অসাধারণ আর তার মুখে রুশ বাহিনীকে আটপৌরে মনে হয়। ফরাসি আর ব্রিটিশরা যারা তখনও নিজেদের প্রভুশক্তি মনে করে, তারা ফিনিশদের সাথে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করে। তবে নরওয়ে আর সুইডেন তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তথাপি ফিনিশরা মার্চ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়, যার ফলে তারা একটা শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, যাতে কিছুটা এলাকা হারাতে হলেও অন্তত

www.nagorikpathagar.org

নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। স্তালিনের শত্রুদের মাঝে একমাত্র ফিনল্যান্ডই এটা করতে পারে।

মৈত্রী সরকারগুলি সন্ধির শর্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেই • গ্য তাদের আঘাত করে। ১৯৪০-এর এপ্রিল চেম্বারলেন আত্মতুষ্টিভরে মন্তব্য করেন– "হিটলার তার গাড়ি ফেল করেছে।" এক মাস চার দিনের মধ্যেই আরো দুটি দেশ ডেনমার্ক ও নরওয়ে হিটলারের দখলে যায়। নরওয়ে আর ডেনমার্ক বিশ্বাস করত পরিপূর্ণ শান্ত থেকে এবং কোনোরূপ অস্ত্রসজ্জা থেকে বিরত থাকাই হলো নিরাপদে থাকার একমাত্র পথ। আর ইতিমধ্যে বুঝতে পারে তারা পৃথিবী সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কোনোরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই জার্মান সৈন্যরা ডেনমার্ক দখল করে নেয়। নরওয়েজীয়রা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু যুদ্ধের চেষ্টা চালায়। মিত্রবাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসায় নামসোস ও আন্দার্সনেস দখল কয়েক দিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়; তবে মে মাসের শুরুতে উত্তরে কয়েকটা অস্থায়ী ঘাঁটি রেখে সরে আসতে বাধ্য হয়। দেখা গেল একজন নরওয়েজীয় জার্মানদের হয়ে নরওয়ে শাসন করছে। তার নাম ছিল কুইসলিং, আর বিশ্ব কথামালায় তিনি এক নতুন নাম সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এর আট দিন পর ১০ মে জার্মানরা একই কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, তবে এবার হল্যান্ড আর বেলজিয়াম আক্রমণের মধ্য দিয়ে; এবং এর মাধ্যমে ফ্রান্স ও ব্রিটেন গুলির রেঞ্জের মধ্যে এসে যায়। এবার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চেম্বারলেনকে পদত্যাগে বাধ্য করে; আর উইনস্টন চার্চিল এক সর্বদলীয় সরকারের নেতৃত্ব দেন। এবার জাতীয়তাবোধের এক নতুন উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। কারণ নতুন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব; তার অনেক দোষ থাকলেও জাতিকে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিজয়ের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার এবং পৃথিবীকে রক্ষা করার গুণ ছিল, যদিও ফ্রান্সে কোনো চার্চিল ছিল না।

চার দিনের মধ্যে ডাচরা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, আর বেলজীয়রা চৌদ্দ দিনের মাথায়। এবার জার্মানি মুখোমুখি হয় ফরাসি বাহিনী ও ব্রিটেনের প্রেরিত অভিযানকারীদের। তারা শুধু মেজিনো লাইনের চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে। সেই স্টিল আর কংক্রিটের দেয়ালকে কখনো ব্যবহার করতে হয়নি; এবার বোঝা গেল নাৎসিদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য এটা যথেষ্ট নয়; বরং ব্রিটিশ ও ফরাসির যৌথ বাহিনীও জার্মানদের তুলনায় নিম্নমানের। তাদের সমরসজ্জা নিম্নমানের। শুধু তা-ই নয়; জার্মানি এক নতুন যুদ্ধকৌশল ব্যবহার করছে। তারা বোমারু বিমান ব্যবহার করছে আর বেসামরিক লোকের এক বিরাট দঙ্গল সামনে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে আর এতে করে প্রতিপক্ষের বাহিনীও ছত্রছন্ন হয়ে পড়ছে। এই দ্বিমুখী আক্রমণ যেন বিপক্ষ বাহিনীর প্রতিরোধকে বর্শাবিদ্ধ করে ছত্রখান করে দিচ্ছে, যারা শুধু বারবার চেষ্টা করে যাচ্ছে সামনে একটা লাইন দাঁড় করানোর যেমনটা তারা করেছিল পূর্ববর্তী যুদ্ধের সময়। জুনের শুরুতে তাদের লাইন পুরোপুরি ধসে পড়ে। ব্রিটিশ ও

www.nagorikpathagar.org

ফরাসি সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ চ্যালেন বন্দর ডানকার্কে হটে আসে, আর অবশিষ্ট বাহিনী দক্ষিণে সরে যায়। ব্রিটিশ নৌ বহর তাদের সেনাদলকে সাফল্যের সাথে চ্যানেল পার করে নিয়ে যায় (অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র খুইয়ে) তবে দক্ষিণের বিশাল এক বাহিনী ক্রমাগত কোণঠাসা হতে থাকে। জার্মান বাহিনী ১০ জুন সীন নদী পার হয়ে যায় (সুযোগ বুঝে মুসোলিনি মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে) আর ১৫ তারিখে প্যারিস দখল করে নেয়। ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে পরাজিত। সরকার পদত্যাগ করে; এক বৃদ্ধ জেনারেল পেতাঁ এক নতুন সরকার গঠন করে হিটলারের কাছে শান্তি প্রস্তাব পাঠায়, যার শর্ত অনুসারে ফ্রান্সের অধিকাংশ এলাকা জার্মানির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অনেকের মতে, যুদ্ধ প্রায় শেষ, হিটলার ব্রিটেনের কাছে আকস্মিক শান্তি প্রস্তাব পাঠায়। ওদিকে স্তালিন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুনিয়া অন্তর্ভুক্ত করে নেয় রুমানিয়ার কাছ থেকে বেসারাবিয়া দখল করে নেয়।

পরবর্তী মাসগুলিকে ইতিহাসে ম্যারাথন আর সালামিসের মধ্যবর্তী সময়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ম্যারাথন আর সালামিসে মানুষের চিন্তা ও স্বাধীনতার অস্ত মিতি সূচনা করেছিল। জুন ১৯৪০ আর জুন ১৯৪১ এর মাঝখানে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, যদি তার বিপরীত কিছু ঘটত তাহলে মানবজাতির ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত। কারণ যদিও সে সময় যারা জীবিত ছিল আর যুদ্ধ করছিল, তারা এটা বুঝতে পারে নি যে অতি আড়ম্বরপূর্ণ হলেও অক্ষশক্তির পরিকল্পনা বেশ স্বচ্ছ ছিল। আর তারা এসেও গিয়েছিল স্বাচ্ছন্দ্যের কাছাকাছি। ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল জার্মানির অর্ধেক। আর এর সমরোপকরণও ছিল নিম্নমানের আর এর সাথে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদের কথা ভাবা যায় (যার অধিকাংশই ছিল বেশ দূরস্থিত আর ভারতের মতো অনিচ্ছুক) সে দিক থেকে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে জার্মানি বেশ এগিয়ে ছিল। আমেরিকার নীতি ছিল 'টাকা' নাও, এগিয়ে যাও', তারা অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজি ছিল। তবে ব্রিটেনে অর্থভাণ্ডার দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল। আর জার্মানি রাশিয়ার কাছ থেকে তেল ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে পারত। এর পরিণাম ছিল সহজবোধ্য আর ব্রিটেনের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছিল। হিটলার রাশিয়ার ওপর চড়াও হতে পারে। পেছনে কোনো বিপদ বা বাধা না থাকায়, যুক্তিসঙ্গতভাবেই সে বিজয় লাভের আশা করতে পারে। আর রুশরা যখন ধ্বংসর দ্বারপ্রান্তে, তখন তার তিন মিত্র জার্মানি, ইতালি আর জাপান– যারা ইতিমধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় ঘাঁটি গাঁড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারা সহজেই যুক্তরাষ্ট্রকে ঘেরাও করে তার টুঁটি চেপে ধরতে পারত।

যাহোক, দক্ষতা, কিছুটা ভাগ্য, সাহস আর নাছোড়বান্দা একগুঁয়েমিতে ব্রিটেন এই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নস্যাৎ করে দিতে পেরেছিল। তার শান্তি প্রস্তাবের কোনো সাড়া না পেয়ে ১৯৪০-এর ৮ আগস্ট হিটলার ব্রিটেনের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। তার পরিকল্পনা ছিল বেশ পরিষ্কার। জার্মান লুফৎওয়াফ ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ারফোর্সের চেয়ে উন্নত হওয়ায়, তার সব বিমানঘাঁটি চুরমার করে দিতে পেরেছিল। আকাশপথে প্রভুত্ব অর্জনের পর তারা রয়্যাল নেভির ওপর

www.nagorikpathagar.org

বোমাবর্ষণ শুরু করে। এতে জার্মানির প্রশস্ত-তলা নৌযানের চ্যানেল অতিক্রম করার কোনো বাধা রইল না। ২১ সেপ্টেম্বর এই জার্মান নৌবহর ফরাসি চ্যানেল পোর্টে অবতরণ করে। আর যেহেতু ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ নাগরিকরা পালাতে ব্যস্ত তাই প্রতিরোধ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর এর ফলে রাজকীয় বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটা নস্যাৎ করে দেয় নৌ ও বিমান বাহিনী, বিশেষ করে শেষেরটি, স্পিটফায়ার ও হারিকেন ফাইটার সংখ্যায় অল্প হলেও মেসারস্মিট ও জাংকার বোমারুদের চেয়ে উন্নততর ছিল, আর এসবের পাইলটরাও ছিল অধিকতর দক্ষ। শক্তির ভারসাম্য এতই অস্পষ্ট ছিল যে কারো পক্ষেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না, তবে শেষ পর্যন্ত লুফৎওয়াফ পরাস্ত হয়। চার্চিলের এক বিখ্যাত উক্তি "মানবজাতির বিরোধের ইতিহাসে এত অল্পের কাছে এত অধিক কখনো এত ঋণী হয়নি।" সেপ্টেম্বরে জার্মান বিমানবাহিনী বিজিত এলাকা রক্ষার বদলে রাতে বোমাবর্ষণের কৌশল গ্রহণ করে। এতে বিপুল ধ্বংসসাধন হয় আর বেসামরিক লোকজন প্রাণ হারায়। তবে এতে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধটি যে দীর্ঘস্থায়ী আর ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে, তা বোধগম্য হতে থাকে। বিশাল বিজিত এলাকা সুরক্ষা করার পরিবর্তে জার্মানরা দিনের বদলে রাতে করে রাজকীয় বিমানবাহিনী ধ্বংস করার চেষ্টা করে, আর রাতে ব্রিটিশ শহরগুলিতে বোমাবর্ষণ শুরু করে। এতে বিপুল ধ্বংসলীলা সাধিত হয় আর বহু বেসামরিক লোক হতাহত হতে থাকে, তবে এতে ব্রিটিশ সামরিক শক্তিকে পুরোপুরি অকার্যকর করতে পারেনি। এত দিনে বেশ বোঝা যায় যে, যুদ্ধটি বিধ্বংসী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জার্মান নেতাটি অস্থির অবিমৃষ্যকারী তা অনেকেই বুঝতে পারে।

তার আরো একটা বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল তার মিত্ররা প্রতারণাপূর্ণ এবং তার চেয়ে বেশি শক্তিধর। মুসোলিনি স্থির করলেন এবার তার নিজস্ব গৌরব অর্জনের সময় এসে গেছে। তিনি বিনা বাধায় ছোট এক ব্রিটিশ কলোনি সোমালিয়া দখল করে নিলেন, আর লিবিয়া ও মিশরের দিকেও দৃষ্টি দেন (যেখানে ছিল ব্রিটিশ ঘাঁটি)। এবার তার আলবেনিয়ার কলোনি থেকে গ্রিস বিজয়ের মতলব আঁটেন, তিনি জানতেন তাকে রুখে দেওয়ার ক্ষমতা গ্রিসের নেই। তবে ইতালীয় বাহিনী নাৎসিদের মতো উন্মাদ ছিল না, আর ইতালীয় জেনারেলদের দক্ষতাও নাৎসিদের সমতুল্য ছিল না। গ্রিকরা প্রথমে ইতালীয় বাহিনীকে রুখে দেয়, তারপর তাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া মিশরের ব্রিটিশ বাহিনী (নিজের দেশের দুর্বল অবস্থান সত্ত্বেও চার্চিল সেখানে ট্যাংকবহর পাঠিয়েছিল) লিবিয়া থেকে জার্মান বাহিনীকে হটিয়ে দেয়। শীতকালের মধ্যে তারা গোটা সাইরেনাইকা থেকে পালিয়ে যায় এবং আর এক ব্রিটিশ বাহিনী আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করে সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করে। ইতালীয় সাম্রাজ্য ধসে যেতে থাকে, আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিটলারকে এগিয়ে আসতে হয় তার

www.nagorikpathagar.org

মিত্রের সুরক্ষায়। এর অর্থ একটা জার্মান বাহিনীকে লিবিয়া পাঠাতে হলো ব্রিটিশদের হটিয়ে দিতে, আর গ্রিস আক্রমণের পথ করার জন্য যুগোশ্লাভিয়া দখল করতে হলো। ১৯৪১ এর সে মাসে ব্রিটিশদের হটিয়ে দিয়ে গ্রিস পুনর্দখল করা হলো। আর এর ফলে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বোমাবর্ষণ শিথিল হয়ে এলো।

জুন নাগাদ বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হয়ে এলো। হিটলারের বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা ব্রিটেনের আত্মসমর্পণ অবধি অপেক্ষা করতে পারে না। ২২ জুনের মধ্যে তার ক্ষমতাদর্পীতার মোহমুক্তি ঘটল। স্তালিন চার্চিলের সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করেছিল, আর জার্মান আক্রমণের ব্যাপারে, সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত ছিল। ফরাসি প্রতিরক্ষার মতো রুশ প্রতিরক্ষাও ভেঙে পড়ল, আর রুশদের আরো ভেতরে সরে যেতে হলো। অবশেষে ১৯৪২ সালে জার্মান অগ্রগতি রোধ হওয়ার পূর্বে তারা ফ্রান্সের প্রায় চার গুণ এক এলাকা দখল করে ফেলে। এর আগে ১৯৪১ এর নভেম্বরে তারা প্রায় মস্কোর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এবার হিটলার ঘোষণা করলেন, এবং তিনি এটা বিশ্বাসও করতেন, যে রুশ প্রতিরোধ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

অক্ষশক্তির আর এক সদস্যও একই রকম অস্থির হয়ে উঠেছিল। যেহেতু চরম বিজয় দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তাই জাপানিদেরই বা কীসের অপেক্ষা। ডিসেম্বরের ৭ তারিখে জাপানি বিমান বহর প্রশান্ত মহাসাগরের আমেরিকান ঘাঁটি পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ শুরু করে দেয়। আমেরিকান নৌবহর সেখানে অপ্রস্তুত অবস্থায় অলস সময় কাটাচ্ছিল; তারা কোনো কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। উনিশটি জাহাজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়, আর সেখানকার বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। এবার শুধু দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশ বাদে গোটা বিশ্বযুদ্ধে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

অবশেষে নতুন আগ্রাসীরাও হিটলারের মতোই সফলতার মুখ দেখতে থাকে। আমেরিকার অধিভুক্ত ফিলিপাইন বিজিত হয়ে যায়, ইন্দোনেশিয়ার ডাচ অধিকৃত দ্বীপসমূহেরও একই অবস্থা ঘটে। ব্রিটিশ কলোনি এবার সিঙ্গাপুরে কেন্দ্রিভূত হয়। বার্মা আক্রান্ত হয়, আর কয়েক মাসের মধ্যেই তার পতন ঘটে। ভারতে কংগ্রেস দল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গণযুদ্ধের ঘোষণা দেয়। রোমেল লিবিয়া থেকে মিশরের দিকে অগ্রসর হয়; রাশিয়ায় জার্মানরা ভল্গার তীরে স্তালিনগ্রাদের দ্বারাপ্রান্তে উপনীত হয়। ১৯৪২ এর গ্রীষ্মকাল নাগাদ পৃথিবীর মানচিত্র এক আতংকজনক রূপ ধারণ করে।

তৎসত্ত্বেও স্বাধীন বিশ্ব ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে; আর ফ্যাসিবাদের অবক্ষয় শুরু হয়ে যায়। অক্ষবাহিনীর অধিভুক্ত দেশের জনগণের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হতে থাকে। স্পেনিশ রিপাবলিক ধ্বংস করে ফ্রাংকো ঘোষণা করেছিলেন তার পেছনে এক পঞ্চম বাহিনী শক্তি জোগাচ্ছে। এবার পঞ্চম বাহিনী অক্ষশক্তির হয়ে কাজ করতে থাকে, বিশেষ করে যেসব সরকারি লোক বিতাড়িত হয়ে লন্ডনে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেনারেল দ্য গলের ফ্রি ফ্রেন্স আর মার্শাল টিটোর যুগোশ্লাভ দল। যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সম্পদ এবার মিত্র বাহিনীর অস্ত্রসজ্জার কাজে ব্যবহার শুরু হয়। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বন্ধকী ধারা পলিসির ফলে

www.nagorikpathagar.org

মিত্র বাহিনীর অর্থসংকট অনেকটাই হ্রাস পায়। সম্পদ সহায়তা ছাড়াও এবার সৈন্য সাহায্য দেওয়াও শুরু হয়। রুশ সেনাবাহিনী ছিল বিপুলায়তন, আর বিরাট আমেরিকান বাহিনী ব্রিটিশদের সাথে যোগ দেয়, আর চীনাদের যাই অভাব থাকুক না কেন জনশক্তির অভাব মোটেই ছিল না।

১৯৪২-এর নভেম্বরের মধ্যে পাঁচটি পয়েন্টে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। আপাতদৃষ্টিতে অদম্য জাপানি বাহিনীকে রুখে দেয়া হয় নিউগিনিতে, যেখানে তাদেরকে সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। লিবিয়ার জার্মান বাহিনী আক্রান্ত হয় এল আলামিনে ব্রিটেনের অষ্টম বাহিনী তাদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়। একটা যৌথ ব্রিটিশ আমেরিকান বাহিনী আলজিয়ার্সে অবতরণ করে, আর পেছন থেকে জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ করে। ভল্গা তীরবর্তী স্তালিনগ্রাদ দখলের প্রচেষ্টারত জার্মান বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ব্রিটিশ সৈন্য বার্মায় ঢুকে পড়ে আর ভারতে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

বেশ কয়েক মাস এই জোয়ার অব্যাহত থাকে। স্তালিনগ্রাদে একটা পুরো জার্মান বাহিনীকে রাশিয়ানরা বন্দি করে ফেলে আর তারা রোস্টভ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় জার্মান বাহিনীকে আটক করে ফেলে আর ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলের সবটাই দখল করে নেয়। ব্রিটিশ আর আমেরিকানরা দিনরাত জার্মানিতে বোমাবর্ষণ করে চলে, আর এতে যে ক্ষতি হয়, ইতিপূর্বে জার্মান বিমান বহরও ততটা ক্ষতি করতে পারেনি। জাপানি নৌবহর প্রথম পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে। তারপর একটু বিরতি, এরপর জার্মানরা রাশিয়ার ওরেল ও কুর্স্কে পুনরায় আক্রমণ আর জাপানিরা চিয়াং কাইশেকের রাজধানী চুংকিং পৌঁছানোর অভিযান শুরু করে। তবে এই উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়, আর যখন মিত্রবাহিনী জুলাইতে সিসিলি দখল করে নেয়, তখন ইতালির ভেঙে পড়ার অবস্থা। রাজা মুসোলিনিকে বরখাস্ত করে, আর তার উত্তরাধিকারী মিত্রবাহিনীর সাথে শামিল হওয়ার চেষ্টা করেন। মিত্রবাহিনীর তেমন আগ্রহ ছিল না। জার্মানি ইতালি দখল করে নেয় আর উপদ্বীপে পৌঁছানোর জন্য মিত্রবাহিনীকে ঘোরতর যুদ্ধ করতে হয়। শুধুমাত্র পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪৪ এর জুনেই সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে রুশরা জার্মানদের বিজিত অঞ্চলের প্রায় অর্ধেকটাই পুনর্দখল করে নেয়। তারা স্বাধীন পোলিশ সরকারের সাথেও একটা বিবাদ বাধানোর সুযোগ গ্রহণ করে, কারণ তারা দাবি করে কাতিনে খুঁজে পাওয়া এক বিশাল গণকবরের, নিরপেক্ষ তদন্ত যাতে, হাজার হাজার পোলদের মৃতদেহ সমাধিস্থ ছিল। এটা ছিল এক ভয়াবহ দৃশ্য, যা রাশিয়া বা তার সহযোগীরা দেখতেও অস্বীকার করে।

রোম দখলে আসে ১৯৪৪ এর ৪ঠা জুন, আর এর দুই দিন পর এক বিশাল ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী ফ্রান্সে অবতরণ করে। হিটলার একদিন যে ভয়টি করতেন বাস্তবে এখন তাই ঘটল। জার্মানি এখন যাঁতির মধ্যে সুপারির মতো। রুশরা পূব

www.nagorikpathagar.org

দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে, আর পশ্চিম থেকে এগিয়ে আসছে ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনী। আগস্টে প্যারিস দখল হয়ে যায়, আর ফ্রান্স পুরোপুরি মুক্ত হয় আংশিকভাবে ফরাসি প্রতিরোধের কারণেও। রুশরা ওয়ার্সর দ্বারপ্রান্তে এসে যায় আর পোলিশরা জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। মার্শাল রকোসভস্কি এবার তার অগ্রগতি থামিয়ে দেন, যত দিন না ৬৩ দিন প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পর জার্মানরা পোলিশ হোম আর্মিকে' সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়। মিত্রশক্তির তিন প্রধান, রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্তালিন বহুবার একত্রে বসে তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উইলসন প্রকল্প থেকে খুব বেশি পৃথক ছিল না। তারা প্রকাশ করতে পারেনি অথবা এমন হতে পারে জানতই না যে অন্তত একজনের সম্মতি ছিল মিথ্যা।

যুদ্ধ এগিয়ে চলে শেষ পরিণতির দিকে; মিত্রশক্তি দক্ষিণ-পশ্চিম আর রাশিয়া পূর্ব দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে; বার্লিনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হিটলার নিজেও আত্মহত্যা করেন। তার উত্তরসূরি অ্যাডমিরাল দোয়েনিৎস ১৯৪৫ এর মে মাসে আত্মসমর্পণ করেন।

জাপানকে পরাস্ত করা তখনও বাকি। তার সৈন্যবাহিনী দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তবে তার ক্ষীয়মান শক্তিতে অদ্ভুত আতংকজনক পরিসমাপ্তি নেমে আসে আগস্টে। যুদ্ধ চলাকালে বহুবিধ বিধ্বংসী সমরোপকরণ নির্মাণ হতে থাকে (যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিষাক্ত গ্যাসের মতো মারাত্মক ছিল না কোনোটা)। সেখানে ছিল আগুনে বোমা, উড়ন্ত বোমা আর ছিল ভি-২ নামে বোমা যা আকাশের অনেক ওপর থেকে ফেলা হতো। মিত্রশক্তির কাছে তথ্য এসেছিল যে জার্মান বিজ্ঞানীরা পরমাণু বিভক্ত করে এক প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করছে এবং তা দিয়ে এমন এক বোমা তৈরির চেষ্টা করছে, যা এ যাবৎ ব্যবহৃত সব বোমাকে ছাড়িয়ে যাবে। আমেরিকান, ব্রিটিশ আর কানাডীয় সরকার প্রবল চেষ্টা চালায় যেন আগেই এটা তাদের করায়ত্ত হয়। তারা এতে সাফল্যও পেয়ে যায়। আর আগস্টের ৬ তারিখে এমনি এক পারমাণবিক বোমা ফেলা হয় জাপানের হিরোশিমা শহরে আর তার পরপরই আরো একটা ফেলা হয় নাগাসাকি শহরে। ইতিপূর্বে মানুষের তৈরি ধ্বংসলীলা এমনকি বিধ্বংসী কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় এত বেশি প্রাণহানি ঘটাতে পারেনি। শহর দুটি আর তার বাসিন্দারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যারা মারা যায়নি তারাও মারাত্মক আহত হয়েছিল, পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল নির্গত মারাত্মক রশ্মি কী ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

এর দানবীয় প্রতিক্রিয়া পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করতে বহু বছর লেগেছিল। সত্যি বলতে কি এখনও এর গুরুত্ব পুরোটা বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে প্রত্যক্ষ পরিণতি যেটা ঘটেছিল, তা হলো ইতিমধ্যে খুঁড়িয়ে চলা জাপানের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অল্প কয়েক দিনের যুদ্ধেই রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া আর কোরিয়া দখল করে নেয়। আমেরিকা জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়া দখল করে নিলো। চিয়াং কাইশেককে চীন

www.nagorikpathagar.org

পুনর্দখলের দায়িত্ব দেয়া হলো। যদিও কম্যুনিস্টরা আগেই উত্তরের অনেকটা দখল করে বসেছিল। ১৯৪৫-এর ১৪ আগস্ট যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তবে ১৯১৮ সালের মতো ততটা উচ্ছ্বাস কেউই উপভোগ করতে পারেনি।

৭০. আবার সেই যুদ্ধোত্তর আনন্দোচ্ছ্বাস

১৯৪৫-এর যুদ্ধোত্তর ভ্রান্তিবিলাস ১৯১৮-এর চেয়ে কম দীর্ঘস্থায়ী হতে পেরেছিল। কারণ যুদ্ধজয়ের তিন মহান নেতার একজন অন্য দুজনকে বাঁকা চোখে দেখা শুরু করে, আর তাদের স্বাধীনতার নীতিমালাকে সমর্থন করতে পারেনি, যদিও সেই দলিলে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন। যাহোক কিছুদিনের জন্য কিছুটা হলেও ঐক্যতান পরিলক্ষিত হয় অংশত স্তালিনের যথেচ্ছ আচরণকে উপক্ষো করা হয়েছিল বলে। সময় গড়িয়ে চলে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮; ১৯৪৭ সালে স্তালিনের বিদেশ মন্ত্রী মলোটভের ঘোষণার মধ্য দিয়ে অবস্থা বদলে যায়; তিনি ঘোষণা করেন রাশিয়ার অধিকারে রয়েছে আণবিক বোমা আর ১৯৪৯ সালে সত্যি সত্যি একটা আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। কাজেই এবার আর আন্তরিকতার ভণিতা করার প্রয়োজন নেই। রাশিয়া এবার খোলাখুলি শত্রুতায় নেমে যায়।

মানুষের সর্বোচ্চ প্রত্যাশা এবার কেন্দ্রিভূত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ওপর, লিগ অব নেশন্স্-এর পরিবর্তে, যা প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে; আর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে লন্ডনে। হোতাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিগের অনেকগুলি ত্রুটি-এর মধ্যেও রয়ে যায়। পরাজিত শক্তিগুলিকে সংগঠন থেকে বাদ দেওয়া হয়, আর এর নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। যদিও একটা জেনারেল অ্যাসেম্বলি ছিল যার গঠন অনেকটা বিশ্ব পার্লামেন্টের আদলে, এর নির্বাহী ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত ছিল নিরাপত্তা পরিষদের ওপর যেখানে পাঁচটি মহাশক্তিধর দেশের (রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন) ছিল স্থায়ী সদস্যপদ আর অন্য ছয় সদস্য দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে আসত। আর এই পাঁচ সদস্য ভেটো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারত। অনতিবিলম্বে সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৮০-তে, আর শিগগিরই পরিষ্কার হয়ে যায় কে নিরাপত্তা পরিষদকে অকার্যকর করতে চায়। তৎসত্ত্বেও জাতিসংঘের বেশ কিছু সহযোগী সংগঠন অনেক প্রশংসনীয় কাজ করে, বিশেষ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন, আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস, ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, এসব প্রতিষ্ঠান তাদের নামের যথার্থতা বজায় রাখতে পেরেছে।

তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রতিবন্ধকতা অবশ্যম্ভাবী ছিল না। সত্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পোলিশ প্রতিনিধিকে বন্দি করার বিষয়টি উপেক্ষা করতে

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিল, তবে পারসিকরা যখন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আজারবাইজান প্রদেশ আক্রমণের অভিযোগ নিয়ে এলো, তখন সেখান থেকে সোভিয়েত সৈন্য সরে গিয়েছিল। তাছাড়া উভয়পক্ষই নুরেমবার্গে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে সহযোগিতা করেছিল, এবং তাদের ফাঁসি প্রদান সমর্থন করেছিল। তবে চরম হতাশা আর আশংকার সৃষ্টি হয়, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একমত হতে অস্বীকার করে। ইউরোপের সাময়িক পুনর্বণ্টন সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়, আর সেই সাময়িক ব্যবস্থাই স্থায়ী ব্যবস্থায় রূপ নেয়। বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সরকারসমূহ লন্ডন নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে আসে; ফরাসি সরকারের নেতৃত্ব লাভ করেন একরোখা তবে জনপ্রিয় জেনারেল দ্য গল; ইতালি গণভোটের মাধ্যমে রিপাবলিকে পরিণত হয়। ব্রিটেনের সহায়তায় এক কম্যুনিস্ট বিদ্রোহের দমন হওয়ায় গ্রিসের রাজা স্বদেশে ফিরে যান। জার্মানি চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত হয়– আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফরাসি আর রুশ, আর রুশ অধিকৃত বার্লিন শহর খণ্ডিত হয়। অস্ট্রিয়াও বিভক্ত হয় চার খণ্ডে। যেসব দেশ যুদ্ধের সময় রুশ দখলে চলে গিয়েছিল যেমন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া, যেগুলিতে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে কম্যুনিস্টরা নিয়ন্ত্রণ করে পোলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও বিচারালয়; তারা একে একে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে একনায়কত্বের দিকে এগিয়ে যায়। যুগোশ্লাভিয়ার টিটো স্বাধীনভাবে অনুরূপ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যায়।

জার্মানির সাথে কোনো সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়নি, তবে জাপানের ওপর আমেরিকা একটা চুক্তি চাপিয়ে দেয়, যা পরে শোচনীয় আশাবাদ সৃষ্টি করেছিল, কারণ এর ফলে সকল প্রকার সশস্ত্র বাহিনী গঠনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যেন মনে হয় সাধারণ নাগরিকরা যেমন ব্যক্তিগত অস্ত্র বহনে নিজের নিরাপত্তা বিধান করে, রাষ্ট্রও তেমনটা করতে সক্ষম হবে। ইউরোপের বাইরে আরো কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, নৈরাশ্যবাদীরা যাকে উন্নততর বিশ্বব্যবস্থার পরিপন্থী মনে করত। কারণ এতে চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে নতুন এক সাম্রাজ্যবাদের পূর্বাভাস মিলে। কারণ এতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের গোপন ইচ্ছার প্রতিফলন দেখা যায়। কয়েক বছরের মধ্যেই এশিয়া আর আফ্রিকার আবহমানকালের মানচিত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

দ্রুততম, ইচ্ছাকৃত ও সবচেয়ে কম প্রত্যাশিত পদক্ষেপটি আসে ব্রিটেনের দিক থেকে। বিজয়ের স্থপতি চার্চিল ভাবলেন তিনি ১৯০৯ সালে লয়েড জর্জের কর্মটির পুনরাবৃত্তি করবেন, আর জার্মানির পতনের পর জোর করে একটা নির্বাচন চাপিয়ে দিলেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় তিনি যে রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বে ছিলেন, সে দলের পরাজয় ঘটল, আর তার প্রতিপক্ষ সি. আর এটলি, যিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আর নমনীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লেবার পার্টির নেতা, জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আরোহণ করলেন। এরপর কয়েক বছর গোটা জাতি এক চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে পার করল, তবে নতুন সরকার তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মকাণ্ডে অটল রইল। এমনকি

www.nagorikpathagar.org

আলাপ-আলোচনা শুরুর আগেই তারা ভারত, বার্মা ও মিশর থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। আর এর সাথে সাথেই সাম্রাজ্যবাদের ভিত ধসে পড়ল। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে বিশাল এক উথালপাতাল সংঘটিত হয়। হিন্দু আর মুসলমানের পরস্পর বিরোধিতা এতই তীব্র আকার ধারণ করে যে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের ভারত ছেড়ে চলে আসার আগে ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই দুটি সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ প্রায় যুদ্ধাবস্থায় পর্যবসিত হয় আর এমনকি দেশ ভাগের পরও সে মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি, তবে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে স্বাধীনতা লাভের পরও দুটি রাষ্ট্রই কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে যেতে সম্মত হয়, আর তার সাথে সিংহলও যোগ দেয়; যদিও বার্মা পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে মত দেয়, তবে পূর্ববর্তী শাসকের সাথে এর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণই রয়ে যায়। মিশরের সাথে কিন্তু তেমনটা ঘটেনি। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া অধিকার হিসেবে মেনে নেওয়া আর সুদানে মিশরীয় অধিকার অস্বীকার করাটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্রিটিশরা প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদি সংঘাত সমাধান করতে পারেনি।

ইন্দোনেশিয়ার ডাচ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে আরো শোচনীয়ভাবে। জাপানিদের ছেড়ে যাওয়ার পর এক স্থানীয় প্রশাসক সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল আর ডাচরা অপর্যাপ্ত শক্তি নিয়ে তাকে অপসারণ করতে চায়। কিছুদিন অমীমাংসিত যুদ্ধের পরে জাতিসংঘ সেখানে হস্তক্ষেপ করে। কিছুটা চাপ প্রয়োগ আর কিছুটা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ডাচদের সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। আর তারা পেছনে রেখে যায় অসদিচ্ছা। ফরাসিরা সংবিধান সংশোধন করে তাদের সাম্রাজ্যে অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদানের ব্যবস্থা করে। তবে দ্য গলের পদত্যাগের পর দ্রুত পরিবর্তনশীলতার কারণে এটা কখনোই পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পর্তুগিজ উপনিবেশগুলি ধরে রাখতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে আফ্রিকায় অবস্থিত আর সেখানে বড় ধরনের কোনো গোলমাল দেখা দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে বড় ধরনের পরিবর্তন কিছু ঘটলে তা ছিল প্রতিক্রিয়াধর্মী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ প্রভাব হ্রাস পাচ্ছিল বুয়ারদের দ্বারা; আর অধিকতর আলোকিত বুয়াররা ঘায়েল হচ্ছিল দাস অধিকারী বুয়ারদের দ্বারা। ইউনিয়নের নগণ্য কিছু লোকই বিশ্বাস করত যে বর্ণবৈষম্য একদিন হয়তো বর্বর শ্রেণিসংগ্রামে পরিণত হবে।

তবে যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি নজরে আসে তা হলো ধ্বংসস্তূপের ওপর পুনর্নির্মাণের দ্রুতগতি। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের প্রায় পুরোটাই আসছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে, যে দেশটিকে যুদ্ধকালীন ন্যূনতম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি, অপরপক্ষে এর উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ছিল। অপর যে অঞ্চলটি যুদ্ধের প্রভাবমুক্ত ছিল, তা হলো দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকা, যাদের সম্পদের পরিমাণ অতি নগণ্য; আর অন্য সব দেশই সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে

www.nagorikpathagar.org

বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যা কিছু প্রয়োজন তার সবটাই উদারভাবে দেয়া হয়েছিল। তবে মাঝে মধ্যে তা হয়েছিল অবিজ্ঞজনোচিত অথবা খামখেয়ালিভাবে। রুজভেল্টের হঠাৎ মৃত্যুর পর ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ক্ষমতায় আসেন, জ্ঞানী ও সাহসী ব্যক্তি, তবে বিদেশ নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল সামান্যই। তাছাড়া বেশ কিছু আমেরিকান ছিল যারা বৈদেশিক ব্যাপারে আমেরিকার জড়িয়ে পড়াটাকে ভালো চোখে দেখেনি। যুদ্ধের পরে সবচেয়ে অবিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত ছিল বন্ধকী-ঋণ প্রথা বিলোপ। কারণ এতে রুশ প্রভাব খর্ব করার শেষ হাতিয়াটিও হাতছাড়া হয়ে যায়। (কারণ আমেরিকার সৈন্য যেখানে প্রত্যাহার করা হয়, সেখানে রুশ সৈন্য মোতায়েনের কাজ চলতে থাকে)। এতে আমেরিকার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মিত্র ব্রিটেনের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি। সামরিক সরঞ্জাম বাদেই ব্রিটেনের ক্রমবর্ধমান বার্ষিক ব্যয় গিয়ে দাঁড়ায় ২,০০০ মিলিয়ন পাউন্ড, যার মধ্যে রপ্তানির মাধ্যমে আয় মাত্র ৩৫০ মিলিয়ন। ব্যাপারটা যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পেরে বার্ষিক শতকরা ২ হার সুদে ৩,৭৫০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ-প্রস্তাব দেয়। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবল মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। আর ১৯৪৭ সালে পাউন্ডকে বিনিময় যোগ্য ঘোষণা করা হয়। অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে পাউন্ডের ভয়াবহ দরপতন ঘটে, যাতে করে লন্ডন আর বিশ্ব অর্থনীতির কেন্দ্র রইল না। ফলে লন্ডনের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে থাকে, আর যুদ্ধকালীন সময়ের চেয়ে জনগণ বেশি দারিদ্র্যক্লিষ্ট আর অভুক্ত থাকতে শুরু করে। রুটি ও মাংসের রেশনিং শুরু হয় আর তা চলে ১৯৫১ পর্যন্ত। একই সময়ে ব্রিটিশ সরকার গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে যদিও এটা আমেরিকাতে ছিল অজনপ্রিয়, তবুও অনেকের কাছে এটা কম্যুনিজমের জুলুমবাজি ও পুঁজিবাদের নৈরাজ্যের মাঝামাঝি সহনীয় এক অবস্থান। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র নামে নতুন এক ধারণার প্রবর্তন করা হলো, যেখানে রাষ্ট্র দায়িত্ব নিলো বেকার, অসুস্থ, দারিদ্র্য ইত্যাদি নিরসনের। তাছাড়া উৎপাদন, যোগাযোগ ও অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র দায়িত্ব বহন করে। এতে আয়ের বিশাল বৈষম্য কিছুটা হলেও হ্রাস পেল (তবে সম্পত্তির অধিকার হরণ করা হয়নি)। আর ১৯৫১ সালে রক্ষণশীলরা ক্ষমতায় এলে এ পদ্ধতি কিছুটা শ্লথ হলেও পুরোপুরি বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি।

তবে নিছক আদর্শগত কারণে আমেরিকান সহায়তা নিরুৎসাহিত করা হয়নি। বিধ্বস্ত দেশসমূহ পুনর্নির্মাণে অন্যান্য শর্তের সাথে একটা প্রধান শর্ত ছিল যেন প্রাপ্ত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়। মার্শাল এইড (যে জেনারেল ও রাজনীতিবিদ এটা প্রবর্তন করেছিলেন তার নামানুসারে) ১৯৪৯ নাগাদ পৌঁছে যায় ৪,৮০০ মিলিয়ন ডলারে। এটা সকল দেশকেই দেয়া হয়, আর চেকরাও এটা গ্রহণ করে, তবে রাশিয়া সরাসরি তাদের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে।

এটাই শেষ উদাহরণ যখন রুশ আশ্রিত কোনো রাজ্য এমন ভুল করে বসল যখন সে ভেবে নিলো তার স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

চেকরা সত্যি বোকার মতো কাণ্ড করে বসেছিল। বাইরে থেকে অনেকেই কম্যুনিজমকে লৌহপর্দারূপে চিহ্নিত করলেও, অনেকেই ভাবত কম্যুনিজম বোধহয় লেনিনের যুগের মতোই রয়ে গেছে। এর অভ্যন্তরের খুব কম লোকই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। যে পদ্ধতি ত্রিশের দশকে শুরু হয়েছিল এবার তা যৌক্তিক সমাপ্তিতে পৌঁছে গেল, আর তা হলো জুলুমবাজি।

স্তালিন কি বাতিকগ্রস্ত ছিল, আইভ্যান দ্য টেরিবলের মতো? পরবর্তী ইতিহাসবিদরা হয়তো এটা বলতে পারবে। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি চেঙ্গিস খানের কর্মকাণ্ডের মতো তার কাজেরও কোনো আদর্শিক ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়োজন নেই। একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল তার লক্ষ্য আর এটা অর্জনের জন্য হত্যা, নির্যাতন, আর কারাবন্দি তার জন্য ছিল অতি সহজ ব্যাপার। লিথুয়ানিয়া, লাতভীয়া আর এস্থোনিয়ার সীমান্ত আগেই মুছে ফেলা হয়েছিল, এবার তাদের উপনিবেশ বানানো হলো। সীমান্তরাষ্ট্রসমূহ রুমানিয়া আলবানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, মিত্রপক্ষ থেকে যাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছিল, তাদের শাসনভারও স্থানীয় কম্যুনিস্টরা নিয়ে নিলো, আর এটা যখন সফল হলো, তাদের নেতৃবৃন্দকে (যেমন চেকোশ্লোভাকিয়ায় শ্লানস্কি, হাঙ্গেরিতে রাইক) মেরে ফেলা হলো, আর তার স্থানে বসানো হলো পুরোপুরি পুতুল সরকার। যুগোশ্লাভিয়ায় রাশিয়া কোনো সৈন্য মোতায়েন করেনি আর মার্শাল টিটো ক্ষমতায় রয়ে যান। রাশিয়ার অভ্যন্তরে চেচেন বা ভল্গা জার্মানের মতো গোটা জাতিকে নির্মূল করা হয় বা সাইবেরিয়ার নির্বাসনে পাঠানো হয়। রুশরা নিজেরাও নিজেদের দেশে তেমন ভালো অবস্থায় ছিল না। এটা বলা সঠিক হবে না যে কেউ স্তালিনের বিরুদ্ধে কথা বললেই তাকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হতো, কারণ যারা স্বপ্নেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তাদের দিয়েই ইতিমধ্যে ক্যাম্পগুলি ভরে গিয়েছিল। পদ্ধতিটি শুরু হয়ে গিয়েছিল যখন পার্টি বা সরকারি পরিচ্ছন্নতা অভিযান চলছিল যারা তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র হেরফের করত। ইতিমধ্যে বন্দির সংখ্যা দশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে যাদের বিরুদ্ধে জাতীয় কোনো অভিযোগ নেই। শ্রমশিবিরগুলি পরিচালিত হতো রাজনৈতিক পুলিশ বাহিনী দ্বারা, যেখানে চলত অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা। তারা হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিছু কিছু স্থাপনা যেমন মেরুবৃত্তের মধ্যে অবস্থিত ভর্কুটা কয়লাখনি, যেখানে কোনো স্বাধীন মানুষ কাজ করতে রাজি হতো না। ষাটের দশকের আগ পর্যন্ত এসব ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে যায়।

দায়িত্বশীল এই স্বৈরশাসক অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই তার আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন। তিনি যে শুধু অতিকথনে অভ্যস্ত ছিলেন, তা-ই নয়। বিপ্লবে তার পার্টির ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসও রচনা করেন, ভাষাতত্ত্বের নীতিমালা চর্চা করেন, সঙ্গীত রচয়িতাদের পরামর্শ দেন কীভাবে তাদের গান রচনা করতে হবে আর মেন্ডেলের বংশতত্ত্ব বাতিল করে অন্য এক বিজ্ঞানী লাইসেংকোর তত্ত্ব চালু করেন।

www.nagorikpathagar.org

তবে এসব উন্মার্গগামিতা বিদেশে তার শাসনামলের খুব কমই ক্ষতি করে, কারণ এসবই মার্কস্‌বাদের কথামালার অন্তর্ভুক্তি লাভ করে, এবং রাশিয়ার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির লোকজন গলাধঃকরণ করে, এমনকি কম্যুনিস্টদের বাইরের অনেকের কাছেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যুদ্ধের পরে এসব সফরসঙ্গীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। আর অনেক স্বাধীন দেশেও কম্যুনিস্ট ভাবধারার সংগঠন গজাতে থাকে। দশ বছর পরও যেসব সংগঠন কার্যকর রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বশান্তি সম্মেলন, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ডেমোক্র্যাটিক ল ইয়ার্স এবং পার্মানেন্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব মাদার্স। এর মধ্যে কোনোটির শিগগিরই মুখোশ উন্মোচন ঘটে, আর কোনো কোনোটা বেশ কিছু দেশে স্থায়ী উৎপাতরূপে প্রতীয়মান হয়। এমনকি স্তালিন যখন খোলাখুলিভাবে পশ্চিমা বিশ্বের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তখনও এসব সংগঠন তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে, আর নতুন নতুন সংগঠন গজাতে থাকে।

৭১. বিভক্ত পৃথিবী

গোটা পৃথিবী দুটি শত্রুভাবাপন্ন শিবিরে বিভক্ত হওয়ার সময়কাল হিসেবে যদি ১৯৪৮ সালকে বেছে নেওয়া হয়, তাহলে সেটা হবে সম্পূর্ণরূপে আবেগনির্ভর। স্তালিন ও তার সহযোগীরা এর বহু আগে থেকেই এই বিভক্তি আঁচ করতে পেরেছিল। অবশ্য পরেও আশার কিছু ক্ষণিক ঝলক দেখা দিয়েছিল যে হয়তো ঐক্যতান সম্ভব। তবে এ পর্যন্ত আমরা যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছি, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থাৎ স্তালিন ও তার সহযোগীরা প্রতিরোধের স্থলে আগ্রাসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। একটা কারণ ইতিপূর্বেই নির্দেশ করা হয়েছে; এবার তাদের হাতে পারমাণবিক বোমা এসে গেছে, ইতিপূর্বে যা ছিল আমেরিকার একচেটিয়া অধিকার। আর অন্য কারণটি হলো এ বছরই জেনারালিসমো চিয়াংকাইশেক চৈনিক কম্যুনিস্টদের হাতে একের পর এক নাটকীয় পরাজয় বরণ করতে থাকে। আর এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশটি কম্যুনিস্ট শিবিরে চলে গেল। কেউই আশা করেনি, স্তালিন তো নয়ই যে এর অন্যথা হওয়া সম্ভব। চিয়াং ও তার কুয়োমিনটাং পার্টির পরাজয় ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১৯৪৮ এর মাঝামাঝি তিনি ছিলেন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। আর ১৯৪৯ এর জানুয়ারিতে রাজধানী পিকিং তার হাতছাড়া হয়ে গেল। আর বছরের শেষে তিনি হলেন ফরমোজায় আশ্রয়প্রার্থী। আর তখনও তিনি চীনের শাসকের দাবি ছাড়েননি। আর সেখান থেকেই জাতিসংঘের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

www.nagorikpathagar.org

রাশিয়া ইতিমধ্যে তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহের ওপর তার মুষ্ঠি দৃঢ় করতে শুরু করেছে; ইতিমধ্যে পূর্ব ইউরোপের যেসব এজেন্ট অকম্যুনিস্ট পার্টি ধ্বংস করার কাজে লেগেছিল, তাদেরকেও হয় অপসৃত, নয়তো নিহত বা আজীবন কারাদণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আত্মবিশ্বাস মাত্র একটা রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় আর সেটি হলো যুগোশ্লাভিয়া। স্তালিন বলেছিলেন, আমার কড়ে আঙুলটি উঁচিয়ে ধরলে টিটো হাওয়া হয়ে যাবে, তবে তিনি তা হননি; যুগোশ্লাভ কম্যুনিস্টরা তাদের নিজের দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিল, আর বাইরের হস্তক্ষেপকে তারা ঘৃণা করত। সামরিক শক্তি প্রয়োগে স্তালিন দেশটি অধিকার করতে চাননি, একটা বিবাদ বর্তমান ছিল; যুগোশ্লাভিয়াকে কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (যাকে বলা হতো কমিনফর্ম) থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তবে তারা ধসে পড়েনি। তারা নিজের একটা নীতিতে অটল ছিল আর সেটা স্তালিনের আমলাতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের চেয়ে লেনিনের আদর্শের কাছাকাছি ছিল। তবে নীতিটি তারা নিজে অথবা তার পশ্চিমা বন্ধুরা যতটা উন্নত ভাবত ততটা উন্নত ছিল না। অকম্যুনিস্ট চিন্তাবিদ লেখকের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। ১৯৪৮ বছরটাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটা যুদ্ধংদেহী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়– যেমন ফিলিপাইন, গ্রিস ও ইন্দোনেশিয়ায় সশস্ত্র আক্রমণ বা বিদ্রোহ– তবে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা ছিল বার্লিন অবরোধ। ভিয়েনার মতো বার্লিনও ছিল চার মিত্রশক্তির অধীনে, যাকে বলা হতো 'কমান্ডাতুরা'। তিন পশ্চিমা শক্তি (ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র), যা ইতিমধ্যেই একটা ফেডারেল শাসনব্যবস্থা চালু করেছে, আর পরাজিত শক্তিকে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন অনুমোদন করেছে, আর তা রুশ সহযোগীর হস্তক্ষেপে প্রায়ই ব্যাহত হচ্ছিল, আর শিগগিরই তার অধীনস্থ পূর্ব বার্লিনে স্বতন্ত্র এক মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা করে, যা পরিচালিত হয় তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীনে। পশ্চিম বার্লিনে যাওয়ার প্রবেশপথ ছিল রুশ অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে, আর তা সুরক্ষিত ছিল আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে। ১৯৪৮-এ সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় নানা অজুহাতে, যেমন রাস্তা মেরামত ইত্যাদি, আর অবশেষে কোনো অজুহাত ছাড়াই। আর রাশিয়ার প্রাক্তন মিত্ররা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে রুশ সম্মতি স্বাক্ষরের কোনো মূল্যই নেই, আর কিছুদিনের মধ্যেই তারা টের পেল রাশিয়ার আসল উদ্দেশ্য পশ্চিমা মিত্রদের অধিকৃত বার্লিনের শ্বাসরোধ করা। নিশ্চয়ই পশ্চিমারা একটা উদ্বেগজনক সময় পার করছিল। আর শক্তি প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সরাবার একটা চিন্তাভাবনা চলছিল। তবে রুশদের ওপর অভাবিতপূর্ব এক প্রত্যাঘাত এসেছিল। আকাশপথে বার্লিনে রসদ সরবরাহ চলছিল। খাদ্য, রসদ ও প্রয়োজনীয় সবকিছুকে ইউ.এস.এ.এ.এফ এবং আর.এ.এফ দ্বারা পরিবহন করা হচ্ছিল। এতে কষ্ট আর ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশি, তবে প্রচেষ্টা ছিল সফল। ১৯৪৯-এর জুনে অবরোধটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এই আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল: যাকে বলা হয় নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (ন্যাটো)। এটা ছিল একটা

www.nagorikpathagar.org

বহুজাতিক সেনা সংগঠন, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেনারেল আইসেনহাওয়ার, যিনি ইতিপূর্বে জার্মান অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এটা স্তালিনের প্রতি একটা সাবধান বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিল, তিনি যদি পশ্চিম ইউরোপের কোনো জায়গা দখল করতে চান, তাহলে যুদ্ধরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করবে। এতে করে রুশ অগ্রগতি থেমে যায়, পশ্চিমের দেশগুলির নিজস্ব ক্ষমতায় তা সম্ভব হতো না। ন্যাটোর সুরক্ষায় ইউরোপের পুনরুদ্ধার দ্রুততর হয়। জার্মানদের জন্য আরো একটা অলৌকিকতা অপেক্ষা করছিল। সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিতে মিত্রশক্তির সহায়তায় দ্রুত পুনরুদ্ধার কাজ চলছিল। এ জন্য যিনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি চ্যান্সেলর অ্যাডেনুর যিনি ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট, যিনি ১৯৪৯ এর নির্বাচনে খুব কম ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কোলনের মেয়র পদ থেকে ব্রিটিশ দখলদার বাহিনীর জেনারেল কর্তৃক অপসৃত হয়েছিলেন চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবের অপরাধে।

পশ্চিম থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে স্তালিন এবার পূর্ব দিকে চোখ ফেরান। তবে অধিকাংশ একনায়কদের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়, সময়ের ব্যবধানে তার কুশলতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। কারণ জাতিসংঘের অন্য শক্তিধররা অবাস্তবতাকেই চ্যাংকাইশেকের পরিবর্তে চীনের কম্যুনিস্ট সরকারকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য করতে রাজি হয়নি, প্রতিবাদে রুশ প্রতিনিধি ক্ষিপ্ত হয়ে পরিষদ থেকে ওয়াকআউট করে। কম্যুনিস্ট আগ্রাসনের যে ক্ষেত্রটি এবার বেছে নেয়া হয় সেটি হলো কোরিয়া, যেটা ইতিপূর্বে জাপানের আশ্রিত রাজ্য ছিল। যেহেতু রাশিয়া এক বা দুই দিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাই তারা কোরিয়ার উত্তর অর্ধাংশের দখল নিয়ে ফেলল, আমেরিকার দখলে চলে যায় দক্ষিণ অর্ধাংশ। জাতিসংঘের এক পর্যবেক্ষক দলকে উত্তর কোরিয়ার নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো হলে তাদের জোর করে বের করে দেওয়া হয়, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা পায়। দক্ষিণ কোরিয়ায় কোরিয়ার বিপ্লবী ন্যাশনাল পার্টির সাবেক এক নেতা সিংম্যান রী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আমেরিকা বিপুল অর্থ ব্যয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় এক পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে আর সেখানকার সামরিক বাহিনীকে জাপানে সরিয়ে আনে।

স্তালিন একে একটা সুযোগরূপে দেখে যেখানে রুশ নাগরিকদের আমেরিকান ও রুশ নেতৃত্বের পার্থক্য বোঝানো যায়। ১৯৫০ সালে একটা তুচ্ছ বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে বসে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে সুসজ্জিত এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করছে, আর দক্ষিণ কোরিয়া, তার অবুঝ মিত্রদের দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া দ্রুত দক্ষিণে বিতাড়িত হতে থাকে আর তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় আসন্ন। নিরাপত্তা পরিষদ রাশিয়ার অনুপস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়, আর অস্ত্র দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করে। যে বাহিনী পাঠানো হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই

www.nagorikpathagar.org

তাতে আমেরিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল আর তার সেনাপতিও ছিলেন এক আমেরিকান, ম্যাকআর্থার, যিনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তবে পৃথিবীর প্রায় সবাই হাত গুটিয়ে নিলো, ব্রিটেন থেকে তুরস্ক পর্যন্ত। তবে উত্তর কোরীয় সেনাবাহিনী এতই প্রশিক্ষিত আর প্রস্তুত ছিল যে, তারা বিজয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল। আগস্ট মাস শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ম্যাকআর্থার তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়নি। সেপ্টেম্বরে তাদের পশ্চাদপসরণ শেষ হয় আর জেনারেল রী রাজধানীতে ফিরে আসেন। জাতিসংঘ বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিভক্তি লাইনের কাছে পৌঁছে গেল। রুশ প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে ফিরে গেল, তবে শুধুমাত্র বাধা দেওয়ার জন্য; কিন্তু আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারলেন না।

এখন এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো যে পলায়মান আক্রমণকারীদের কোরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করা উচিত। আর নির্বাচনের মাধ্যমে এক অখণ্ড কোরিয়া প্রতিষ্ঠা করা। তবে এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ম্যাকআর্থার যখন কোরিয়ার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন চীনা কম্যুনিস্ট সরকার অভ্যন্তরভাগ থেকে কোরিয়া আক্রমণ করে বসল; এতে করে আমেরিকা ও তার মিত্রদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে যায়। চীনাদের শিল্প সম্পদ কম থাকতে পারে, তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল অগণনীয়, যা দিয়ে তারা পশ্চিমা সৈন্যদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর অনতিবিলম্বে তাদের প্রায় আগের জায়গায় ঠেলে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

চীনা কম্যুনিস্টদের মধ্যে যারা শুধু সংস্কারমুক্ত চরমপন্থী কৃষকদের দেখতে পেয়েছিল, তাদের দেখার মধ্যে ভুল ছিল। স্তালিনের নতুন সহযোগীরা তার চেয়েও বেশি উগ্রপন্থী ছিল। ১৯১৭ সালের রুশ নেতাদের চেয়ে তারা বেশি বয়োবৃদ্ধ ছিল। তারা ছিল প্রবীণ যোদ্ধা, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের বিশ বছরেরও বেশি আর তারা ছিল স্থিতধী। তাদের দলপতি মাও সেতুং-এর বয়স ৫০ সালে ছিল ৫৬ বছর। ট্রটস্কি আর স্তালিনের বয়স ১৯১৭ সালে ছিল ৩৬ বছর করে, এমনকি লেনিনের বয়সও ছিল ৪৭। চীনা শাসকরা কম্যুনিস্ট একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছিল পরিপূর্ণ কঠোরতার সাথে। অন্যান্য পার্টির সাথে জোটবাঁধা ছিল ভণিতামাত্র। এককালের বিরুদ্ধবাদী, প্রাক্তন অফিসার, আর ভূস্বামীদের গণবিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এসব বিচরানুষ্ঠান ছিল কম্যুনিস্ট ক্যাডারদের গণমিটিং মাত্র। বিরুদ্ধবাদীদের চাবুক মেরে পক্ষে আনা হতো। আর এসব দৃশ্য মাঝে মধ্যে গণমাধ্যমে প্রচার করা হতো। কৃষক সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই ভূমি বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল, তাদের প্রথমে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে এবং তারপর জোর করে সমবায় সমিতিতে আর তারপর কমিউনে ঢোকানো হতো, যেখানে তাদের ব্যক্তিসত্তা লোপ পেয়ে যেত। শহরে কম্যুনিজিকরণ চলতে থাকে ধীর গতিতে। এমনকি কট্টর তত্ত্ববাগীশরাও নির্মাণশৈলী ও ব্যবস্থাপনা নৈপুণ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছিল, তবে এটা চলছিল একই রেখায়। বৌদ্ধিক দিক থেকে পশ্চিমা বন্দি ও চৈনিক বুদ্ধিজীবীদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ একই কায়দায় চলছিল। মূলত

www.nagorikpathagar.org

কৌশলটি ছিল মার্কস-লেনিনীয় তত্ত্বটি অবিরাম পুনরাবৃত্তি করে চলা, আর সেই সাথে তার নিজের ভুল স্বীকারে বাধ্য করা; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মন অসাড় হয়ে যায় আর শ্লোগান তার মাথায় গেঁথে যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তথা কম্যুনিজম ও স্বাধীন বিশ্বের বিরোধ ঘনীভূত হওয়ার দুটি পরিণতি প্রকাশ পায়। প্রথমটি হলো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক চরম ভীতির সঞ্চার, যা প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে চলে যায়, যার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংরক্ষিত কিছু অধিকারও সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। এই নিষেধাজ্ঞা বলবতের সবচেয়ে শক্তিশালী ও জঘন্য হোতা ছিলেন একজন রিপাবলিকান সিনেটর যোসেফ ম্যাকার্থি। ১৯৫২ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নির্বাচিত হওয়ার পর মনে হতে থাকে আমেরিকান সমাজে বিকৃতিগুলি বুঝি চিরস্থায়ী রূপলাভ করবে, তবে সময়ের সাথে সাথে সেই ভীতি কিছুটা হ্রাস পেতে থাকে। তবে দ্বিতীয় পরিণামটি ছিল তুলনামূলকভাবে কম ক্ষণস্থায়ী, আর তা হলো একটা নতুন জোট যাকে বলা হয়েছে জোট নিরপেক্ষ জোট, যার নেতৃত্বে ছিল নব্যস্বাধীন দুই দেশ ভারত আর মিশর, যাদের মনে করা হয় তারা বুঝি দুই বিশাল প্রতিপক্ষের মাঝখানে মধ্যস্থের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে পড়বে। যাহোক, তখন পর্যন্ত তারা ছিল সংখ্যাল্প আর কমজোর। অধিকন্তু তাদের স্বসৃষ্ট সমস্যায় তারা নিজেরাই যথেষ্ট বিব্রত ছিল, যাতে করে নিজেদের পরিচ্ছন্ন বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ভারত গায়ের জোরে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর রাজ্যটি দখল করে নিয়েছিল, যদিও জাতিসংঘের নির্দেশনা ছিল গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা তারা ভারত না পাকিস্তানের সাথে থাকতে চায়। ব্রিটেন চলে যাওয়ার পরপরই মিশর অন্যান্য আরব দেশের সাথে যোগ দিয়ে ইসরাইল আক্রমণ করে বসে, যাতে তাদের চরম পরাজয় ঘটে। উভয় শক্তিই তাদের প্রতিবেশীদের সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। তৎসত্ত্বেও এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশকেই ইউরোপীয় অধিকার মুক্ত করে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, এতে মনে হতে থাকে এই নিরপেক্ষ জোট শক্তি সঞ্চয় করবে।

যে সময়ে আন্তর্জাতিক ঝগড়া বিবাদ চলছিল, আর বিধ্বংসী এক যুদ্ধের আশংকা জোরদার হচ্ছিল, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নও ত্বরান্বিত হচ্ছিল। বিশ্বভ্রমণ এখন আর অবাস্তব বিষয় ছিল না। আমেরিকান বিমান ১৯৫৭ সালে বিরতিহীনভাবে বিশ্বপরিক্রমা করে। আর ঐ একই বছরে রাশিয়া স্পুটনিক নামে এক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠায়। পারমাণবিক শক্তি যেমন যুদ্ধোপকরণ রূপে রাখা হয়, তেমনি শান্তিপূর্ণ কাজেও ব্যবহার শুরু হয়। সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মহা উচ্চতায় উঠে যায়, যাতে করে তদবধি সুবিধাবঞ্চিতরাও স্বচ্ছল জীবনের স্বাদগ্রহণ করে। এমনকি লাতিন আমেরিকান, এশীয়, আফ্রিকার সেসব দেশ, যাদের সমৃদ্ধির ভাগ ছিল খুবই কম, সেখানে জাতিসংঘ এবং বেশ কিছু পশ্চিমা সংঘ শিশুমৃত্যুহার হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। স্বনামখ্যাত অর্থনীতিবিদদের অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন

www.nagorikpathagar.org

যে পৃথিবীতে যেভাবে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটছে, সেই ভীতি দূর করার কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

আর একটা বিপদের পূর্বাভাস ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে উত্তেজনা। রাশিয়ার একনায়ক স্তালিন দিন দিন আরো রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে থাকে। তিনি যে শুধু সেমিটিক বিরোধীদের প্রশ্রয় দিতে শুরু করেন, তা-ই নয়; ১৯৫৩ এর জানুয়ারিতে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে রাশিয়ার বড় বড় ডাক্তাররা তাকে এবং অন্য নেতাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তাদের মধ্যে নয়জনকে গ্রেফতার করে জবরদস্তি স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়, তারা নামজাদা অনেক নেতাকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে খ্যাতিমান সাহিত্যিক ঝদানভও রয়েছেন। আরো যাদের তালিকা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছেন মিসেস মলোটভ, মহান রুশ নেতা মলোটভের স্ত্রী যাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়। এরপর যখন অনেক কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হয় স্তালিনের দেহান্ত হয়েছে। এরপরও নিপীড়ন থামেনি, তবে পরের মাসগুলিতে কিছুটা হ্রাস পায়। এরপর এক অনানুষ্ঠানিক কমিটির মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, যার মধ্যে ছিলেন মালেনকভ, বেরিয়া, ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, ও মার্শাল জুকভ, এরা সবাই ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করেন। এদের মধ্যে একজন পুলিশপ্রধান বেরিয়া স্তালিনের জায়গা নিতে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা যান। (রাউতিন তখন পর্যন্ত বেশ শক্তিশালী) ঘোষণা করা হয় যে তিনি ১৯১৮ সাল থেকে একজন বিদেশী গোয়েন্দা ছিলেন বলে স্বীকারোক্তি করেছেন যেমনটা স্তালিনের সব শিকারের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তবে কোরীয় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল একটা ব্যাপক সাধারণ শান্তি ঘোষণার মধ্য দিয়ে আর ভয়াবহ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলো না, তবে সেনসরশিপ ততটা রইল না আর যথেচ্ছ গ্রেফতার বন্ধ করা হলো। এখন থেকে সমাজতান্ত্রিক আইনসিদ্ধতা কার্যকরী হবে। ১৯৫৬ সালে নিকোলাস ক্রুশ্চেভ, স্তালিন নিজেই যাকে অখ্যাত স্থান থেকে তুলে এনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেন, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রয়াত একনায়কের মৃত্যুরহস্য উদঘাটনের, এটা করা হলো কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের বিশতম অধিবেশনে। এর অভিঘাত রুশ মহলের বাইরেও কম্পন সৃষ্টি করল। এতে করে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির স্তালিনবাদী দলের উৎখাত ঘটল, আর সমাজতান্ত্রিক জগতে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করল, যার ধাক্কা রাশিয়াতেও এসে পৌছাল। তবে সে আলোড়ন ছিল স্বল্পস্থায়ী ও সীমিত। পোল্যান্ডে অস্তালিনবাদী গোমুল্কা ক্ষমতায় রয়ে গেলেন। পক্ষত্যাগী যুগোশ্লাভিয়ার সাথেও ভালো সম্পর্ক হলো। তবে দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে হাঙ্গেরিয়দের বিপর্যয় ঘটল। উনিশ দিনের রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের দমিয়ে রাখা হলো।

হাঙ্গেরির বিপ্লব যেভাবে ধ্বংস করা হলো তাতে রাশিয়ার বাইরের কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট সবাই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। সারা পৃথিবীর কম্যুনিস্ট পার্টিসমূহ সাময়িকভাবে কিছুদিন চুপ মেরে রইল। তবে এর উপর একটা কালো ছায়া রয়েই

www.nagorikpathagar.org

গেল। কিন্তু সবাই সেটা চেপে রাখার চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে এর জন্য পশ্চিমা বিশ্বের একটা অবমাননাকর বোকামিও দায়ী ছিল। একই সময়ে ইসরায়েলের ইহুদি ও মিশরের মধ্যেও যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বহুগুণে সংখ্যাধিক মিশরীয় সেনাবাহিনী দারুণ পরাজয় বরণ করল, আর ইসরায়েল বাহিনী সিনাই উপদ্বীপ দখল করে সুয়েজ খালের দিকে অগ্রসর হলো। অতীতের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার ঘোষণা করল তারা নিজেরাই এটা দখল করবে, কারণ তারা প্রেসিডেন্ট নাসেরের সুয়েজ জাতীয়করণের কারণে উত্ত্যক্ত হয়েছিল। আর তারা এটাই করার চেষ্টা করল, আর মিশরীয়দের দ্বারা প্রতিহত হলো। তাদের মনেই আসেনি যে তারা বিনা কারণে একটা দেশের সাথে যুক্ত এমন কিছু দখল করতে যাচ্ছে, যাতে তাদের মোটেই অধিকার নেই। আর জাতিসংঘের প্রায় সব সদস্যই এ ব্যাপারে তাদের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করল, যাতে তারা সুয়েজ খাল দখল না করেই সরে আসতে বাধ্য হলো। এতে তারা বৃহৎশক্তি হিসেবে নিজেদের সুনাম ক্ষুণ্ন করল।

* * *

১৯৫৭ সালের পর যা কিছু ঘটল তা প্রায় আমাদের সমসময়ের অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের এই পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করছি। এবার যা লিখতে হবে তা প্রায় ডায়েরির মতো করে লেখাই উত্তম; যাতে কোন্ ঘটনাটি তাৎক্ষণিক তাৎপর্যবহ আর কোন্টির তাৎপর্য স্থায়ী তার পার্থক্য নিরূপণ কঠিন। প্রথম যে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো পারমাণবিক শক্তি অর্জনে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা। মহাশূন্যে রাশিয়ার উপগ্রহ উৎক্ষেপণ আমেরিকানদের চমকে দিয়েছিল। ধ্বংসাত্মক অস্ত্রে এগিয়ে থাকলেও, মহাশূন্য অভিযানের নাটকীয়তায় তারা পিছিয়ে পড়েছিল। তাদের উপগ্রহগুলি ছিল ক্ষুদ্রতর আর তারা শুরুও করেছিল পরে। উভয় শক্তিই অবশিষ্ট পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, আর এটা অবাস্তব নয় যে পৃথিবীর বাতাবরণ বিষাক্ত করে তুলছিল বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে বারবার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। দৃশ্যত ব্রিটেন ইতিমধ্যে ক্ষমতার বিচারে নিম্নগামী হয়ে পড়ছিল, মাত্র ছোটখাটো দু-একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাল রাখার চেষ্টা করছিল। ফ্রান্সও নিজেদের চেষ্টায় একটা বানিয়ে ফেলল, শোনা যায় কম্যুনিস্ট চীনও চেষ্টায় আছে। দ্বিতীয়ত, স্তালিনের উত্তরসূরি স্থির হয়ে গেল। ১৯৫৮ সালে ক্রুশ্চেভ তার প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যালেনকভ মলোটভ ও অন্যদের হটিয়ে রাশিয়ার নিয়ন্তা হয়ে বসলেন। তবে তিনি স্তালিনের নিপীড়ন নীতি গ্রহণ করলেন না। আর তার শাসন কালও তেমন দীর্ঘ হয়নি। ১৯৬৪ সালে এর সমাপ্তি ঘটে' রাশিয়া কখনোই মুক্ত অধিকারের দেশ ছিল না, লেখক, বক্তা, মানবতাবাদী, বিজ্ঞানী সবাইকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা হয়, তবে আইনের শাসন কথার কথা ছিল না, আর পুলিশি শক্তিও ছিল কিছুটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। তৃতীয়ত, পৃথিবী যে কেবল দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিল তা নয়; এর মেরুকরণ

www.nagorikpathagar.org

দুটি ছিল : কম্যুনিস্ট দেশসমূহ ও স্বাধীন দেশসমূহ। তবে অনেক দেশই এই দুই শিবিরের কোনোটাতেই থাকতে ইচ্ছুক ছিল না, বাস্তবিকপক্ষে তারা একটাকে অন্যের বিরুদ্ধে উসকে দিত মাত্র আর তার মাধ্যমে উভয়ের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করত। আফ্রিকার ব্রিটিশ কলোনি একের পর স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। আর জেনারেল দ্য গলের ক্ষমতায় আসায় ফরাসি কলোনির ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। যদিও তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে পুরনো কেন্দ্রের সাথে কোনোভাবে যুক্ত থাকতে বলা হয়। নতুন রাষ্ট্রগুলি শিগগিরই স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত হতে থাকে। তারা জাতিসংঘের মাধ্যমে এশিয়া এমনকি লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের সাথেও মৈত্রী স্থাপন করে। তবে তাদের সমান ভোটাধিকার থাকলেও অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে তেমন সক্ষমতা বাড়েনি।

রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে হৃদ্যতা কিছুটা বাড়লেও ১৯৬০ সালে ক্রুশ্চেভ তার সুবিধা নিয়ে রুশ সীমান্তে একটা ইউটু আমেরিকান পর্যবেক্ষণ বিমান গুলি করে ভূপাতিত করায় আবার উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। কিউবার এক শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবক নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো, আমেরিকান বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসার সাহস প্রদর্শন করে; তবে তিনি সব সময়ই নিজেকে একজন গণতন্ত্রী বলে প্রচার করে এসেছেন। বেলজীয়রা কঙ্গো ছেড়ে চলে আসার কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে গোলমাল বেঁধে যায়, আর তারা জাতিসংঘের সাহায্য চেয়ে বসে। আর এই সাহায্য তাদের জোগানো হয় বিশেষ করে আমেরিকান ও নিরপেক্ষ সৈন্যবাহিনীর দ্বারা, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের মোটেই পছন্দ ছিল না।

১৯৬১ সালে কঙ্গোর বিকারগ্রস্ত অসুখী প্রধানমন্ত্রীকে কাতাঙ্গা প্রদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা গুলি করে হত্যা করে; আর এতে করে দেশটিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, আর তা নিরসনে জাতিসংঘের প্রচেষ্টাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রাণপণে রুখতে চেষ্টা করে। তারা এমনকি নিবেদিতপ্রাণ সেক্রেটারি জেনারেল হ্যামারশোল্ডের পদচ্যুতি, আর তিনটি আন্তর্জাতিক দল থেকে একজন করে নিয়ে ত্রয়ী প্রশাসনের প্রস্তাব তোলে, যাতে মনে হয় স্থায়ী মতবিভেদের পথ পাকা করাই তাদের উদ্দেশ্য। এর অল্প পরই হ্যামারশোল্ড এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন, বিষাদময় পরিস্থিতি নজরে আসে। তবে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ শাসনের অগ্রগতি থেমে যায়নি। আর কমনওয়েলথের নতুন রাষ্ট্রসমূহের চাপে দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্বে মিশরের অগ্রগতি তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়; আর তিনি সিরিয়া ও ইয়েমেনের সাথে যোগ দিয়ে নতুন জোট ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গঠন করেন। ঐ একই বছরে উভয় রাষ্ট্রই জোট থেকে বেরিয়ে যায়, আর এদিকে ইরাকের মাথাগরম নেতা কাশেম সরাসরি শত্রুতায় নেমে পড়েন। উত্তর আফ্রিকার আবর রাষ্ট্রগুলিও জোটভুক্ত হতে আগ্রহ দেখায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজশে কিউবার নির্বাসিত নেতাদের কিউবা আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এর ফলে ক্যাস্ট্রো তার গণতান্ত্রিক ভণিতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘোষণা দেন

www.nagorikpathagar.org

তিনি একজন মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতা এবং কিউবা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবে, যা তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

১৯৬২ সালে আলজেরিয়ার বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে ফরাসিদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাদ দিলে এখন মাত্র এঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে পর্তুগিজ শাসনের মাধ্যমে আফ্রিকায় শ্বেত শাসন টিকে থাকে। শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ বাহিনী কাতাঙ্গা প্রদেশ অধিকার করে কঙ্গো পুনরেকত্রীকরণ করে। চীনা কম্যুনিস্টরা রাশিয়া থেকে ভিন্ন নীতি মেনে চললেও নিরপেক্ষ পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে ভারতের উত্তর সীমান্তে হঠাৎ হামলা করে বসে। তারা উত্তর সীমারেখা থেকে ভারতীয় সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের দাবি করা রেখায় শক্ত হয়ে বসে।

তবে বছরের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটে কিউবায়। অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা দেন রাশিয়া আন্তঃমহাদেশীয় মিসাইল ও ইলিউশিন বিমানের সাহায্যে পারমাণবিক বোমা ফেলে গোটা যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসছে। তিনি ঘোষণা করলেন, যদি এগুলি সরিয়ে নেওয়া না হয়, তাহলে তারাও শক্তি প্রয়োগ করবে। কয়েক দিনের জন্য সারা পৃথিবী পারমাণবিক যুদ্ধের আতংকে নিমজ্জিত রইল। যাহোক, ক্রুশ্চেভ শেষ পর্যন্ত তার দুঃসাহসিক পাশা খেলা ত্যাগ করলেন। আর মিসাইল ও বোমারু সরিয়ে নিলেন। তাৎক্ষণিক সাফল্য কেনেডির বলেই মনে হলো (যদিও যুক্তরাষ্ট্র থেকে কয়েক মাইলের মধ্যেই একটা রুশ ঘাঁটি টিকে রইল) তবে সবচেয়ে বড় সাফল্য রয়ে গেল সারা পৃথিবীর। মনে হয়েছিল যেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর দুই রাষ্ট্রের মাথা পৃথিবীকে এক অতল গহ্বরের সামনে দাঁড় করিয়েছিল, আর সেই অন্ধকার গহ্বরের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

১৯৬৩ সালে অন্তত একধাপ পেছনে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সেই অনন্ত কালব্যাপী আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ আলোচনার অন্তত একটা ইতিবাচক ফল দৃষ্টিগোচর হলো। আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেন একটা পারমাণবিক চুক্তি সই করল, যাতে ভূপৃষ্ঠে পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ভূ-অভ্যন্তরে নয়); প্রায় চল্লিশটি দেশ এতে সম্মতি জানায়, তবে তারা ফ্রান্স (যারা ইতিমধ্যেই পারমাণবিক বোমা আয়ত্ত করেছিল) আর চীনকে রাজি করাতে পারেনি (চীন সে সময়ে পরমাণু বোমা তৈরিতে নিয়োজিত ছিল)। ইতিমধ্যে চীন রাশিয়ার প্রায় শত্রু হয়ে উঠেছিল আর ক্রুশ্চেভের স্বাক্ষর প্রদানকে বিপ্লবের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছিল। বিবাদটি দীর্ঘদিন বজায় ছিল তিক্ত বাক্যবিনিময়ের মধ্যে।

-০-

www.nagorikpathagar.org

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন। তবে এইচ. জি. ওয়েলসের মতো একজনের চোখ দিয়ে মানবজাতির ইতিহাসের অলিগলি ঘুরে বেড়ানো এক বিশেষ সুযোগ। ওয়েলস নিজে এই বইকে পাঠ করতে বলেছেন উপন্যাস হিসেবে। সত্যি, তার দক্ষ হাতে ইতিহাসের এক একটি পর্ব একটি অখণ্ড নাটকীয় আখ্যানের অংশ হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর আড়ালে উঁকি দেয় যোগসূত্র। মানুষের নিয়তি বিষয়ে ওয়েলসের নিজস্ব বক্তব্য আছে। ভবিষ্যতের পটভূমিতে তিনি অতীতকে দেখতে পান। এটিই ওয়েলসের ইতিহাসবীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ISBN 978 984 8088 71 5
9 789848 088715